আসকার রচনাবলী

৭

আসকার রচনাবলী

৭

www.pathagar.com

ISBN : 984-455-089-0
শিপ্র ঃ ২৪০ ঃ ১৯৯৬
আসকার রচনাবলী (৭ম খণ্ড) সম্পাদনাঃ আবিদ আজাদ; প্রথম প্রকাশ ঃ ঢাকা বই মেলা ১৯৯৬ জানুয়ারি ১৯৯৬, মাঘ ১৪০২; স্বত্ব ঃ লেখক। প্রকাশক ঃ শিল্পতরু প্রকাশনী ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা- ১২০৫, পোষ্ট বক্স নং ৫১১৮ ফোনঃ ৫০৮৩৫২, ৮৬৪২৬৪ মুদ্রণঃ শিল্পতরু প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড এ্যাডভার্টাইজার্স ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫, পোষ্ট বক্স নং ৫১১৮ ফোনঃ ৫০৮৩৫২, ৮৬৪২৬৪ কম্পোজঃ সাইফুল, আইয়ুব। প্রচ্ছদ ঃ মৃণাল নন্দী।
মূল্য ঃ ২০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-455-089-0
SP : 240 : 1996
Askar Rachanabali (7th Vol) : Edited by Abid Azad; Date of Publication : Dhaka Book Fair 1996, January 1996, Magh 1402: Published by Shilpatoroo Prakashani 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No : 5118 Phone : 508352, 864264 Printed by Shilpatoroo Printers & Advertisers 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No : 5118 Phone : 508352, 864264 Copyright : Author Compose: Saiful, Ayub. Cover Design : Mrinal Nandi
Price : $ 10 Only

www.pathagar.com

আসকার রচনাবলী

৭

সম্পাদনা

আবিদ আজাদ

শিল্পতরু প্রকাশনী

www.pathagar.com

'আসকার রচনাবলী'র ৭ম খন্ড বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আহসান হাবীবের নামে উৎসর্গ করেছেন তাঁরই অনুজপ্রতিম নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ। সেই চল্লিশের দশকে মুসলিম সমাজের সমস্যাদি নিয়ে 'বিরোধ' শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করেন তখনকার তরুণ শিক্ষার্থী আসকার সাহেব, যে-নাটকের ভূমিকা লিখেছিলেন শান্ত সমাহিতচিত্ত সুজন কবি আহসান হাবীব।

'বিরোধ'-এর ভূমিকা লেখার সময় মফস্বলবাসী এই অজানিত নাট্যকারকে কলকাতাবাসী এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি চিনতেন না জানতেন না। কবি আবদুল হাই মাশরেকীর যোগাযোগক্রমে নাকর্টটি পড়েই ভূমিকা লিখলেন কবি যাতে 'বাংলা নাট্য সাহিত্যে আমরা দীন' বলে তরুণতম নাট্যকারকে জানালেন তাঁর প্রীতি-অভিনন্দন।

সেদিনের সেই 'অপ্রত্যাশিত' প্রীতি-অভিনন্দনকে স্মৃতির মণিকোঠায় কি যে মহামূল্যে আজও সাজিয়ে রেখেছেন বর্তমানের বর্ষীয়ান নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ তার সন্ধান আমরা পেয়েছি নাট্যকারের সঙ্গে অনেক আলাপচারিতায়। সুজন কবি আহসান হাবীবের নামে উৎসর্গীত 'আসকার রচনাবলী'র এই ৭ম খন্ড সাজিয়ে প্রকাশ করতে পারায় আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করছি।

আবিদ আজাদ

www.pathagar.com

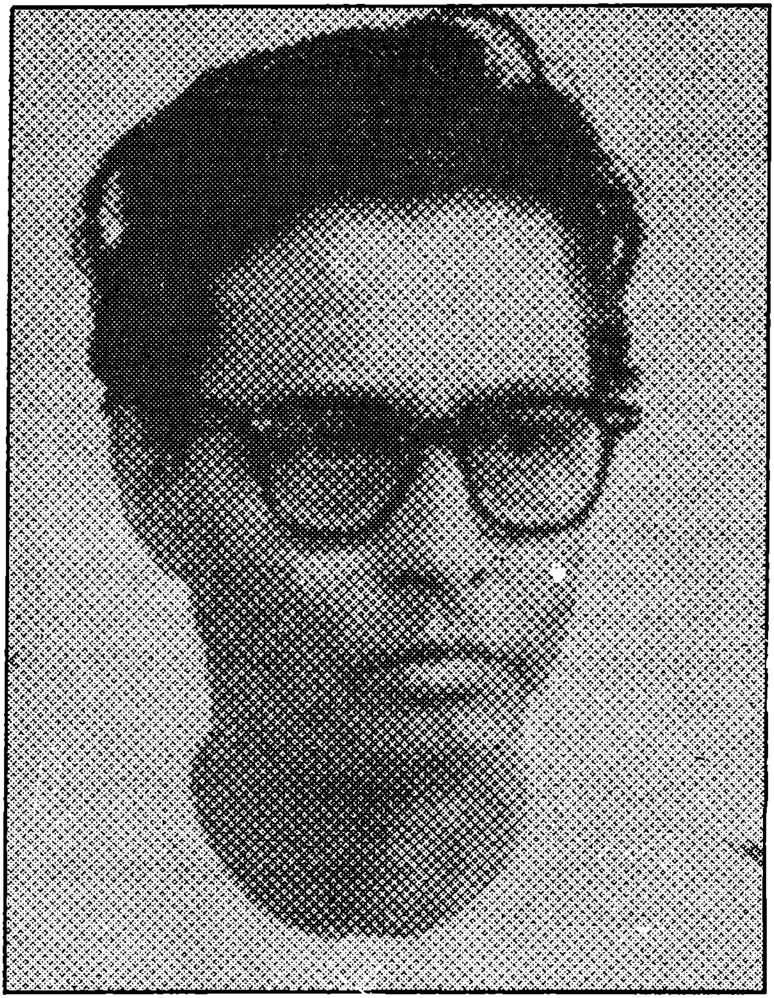

আমার পরম শ্রদ্ধেয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সৃজন কবি আহসান হাবীব আমার প্রথম নাটক 'বিরোধ'-এর ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তা স্মরণে রেখেই তাঁরই নামে উৎসর্গীত হল 'আসকার রচনাবলী'র এই সপ্তম খন্ড।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

মঞ্চ-নাটক

ইন্টারভিউ

রচনাকাল ঃ ১৯৫৯ সালে প্রথম খসড়া রচিত। পরিবর্তিত রূপঃ ১৯৭৩ সাল।

টেলি-নাটক

সবগুলো টেলি-নাটকই ১৯৭৪ সালে প্রথম খসড়া রূপে রচিত; পরিবর্তনের মাধ্যমে এগুলোকে বর্তমান রূপে সংশোধন করা হয় ১৯৭৫ সালে। এই রচনাগুলোর সঠিক খসড়াকাল কিংবা পরিবর্তনকাল এখন আর স্মরণ করা সম্ভব নয়।

বেতার-নাটক

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প পদ্মগোখরোকে যে কোন মাধ্যমের উপযোগী করে নাট্যরূপ দেয়ার ইচ্ছা বরাবরই ছিল। তদনুসারে এর পূর্বেকার খসড়া থেকে বেতার-নাটকের উপযোগী নাট্যরূপ দেয়া হয়েছিল ১৯৭৫ সালে।

প্রবন্ধ

বর্তমান খন্ডের চারটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমটির রচনা ও বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশ কাল হচ্ছে ১৯৬৩ সাল।

অন্যান্য তিনটি প্রবন্ধ অন্য শিরোনামে সত্তরের দশকে রচিত হয়। পরিবর্তিত রূপে সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে।

কিছু গান

গানগুলো ষাট/সত্তরের দশকে রচিত।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মঞ্চ-নাটক

ইন্টারভিউ ৯

টেলি-নাটক

আসামী ৪০
অশান্ত বায়ু ৬৩
নদীতে নাইয়রী নাও ১০২
শেষ রাতের ডাকগাড়ী ১৩১
লীলা-কঙ্ক ১৬০
ছায়া-ছায়া পথ ১৯৮
বীরাঙ্গনা সখিনা ২৭২

বেতার-নাটক

পদ্মগোখরো ২২৬

প্রবন্ধ

পূর্ব-পাকিস্তানের নাটক ১৮১
মাটি ও মানুষের কথা ২৪৮
সহসা নতুন ভোর ২৫৬
রঙধনুকের দেশ ২৬৪
কিছু গান ৩০০
আমার 'জীবন-কথা'র কিছু কথা ৩০৪
জীবন-বৃত্তান্ত ৩১৩

www.pathagar.com

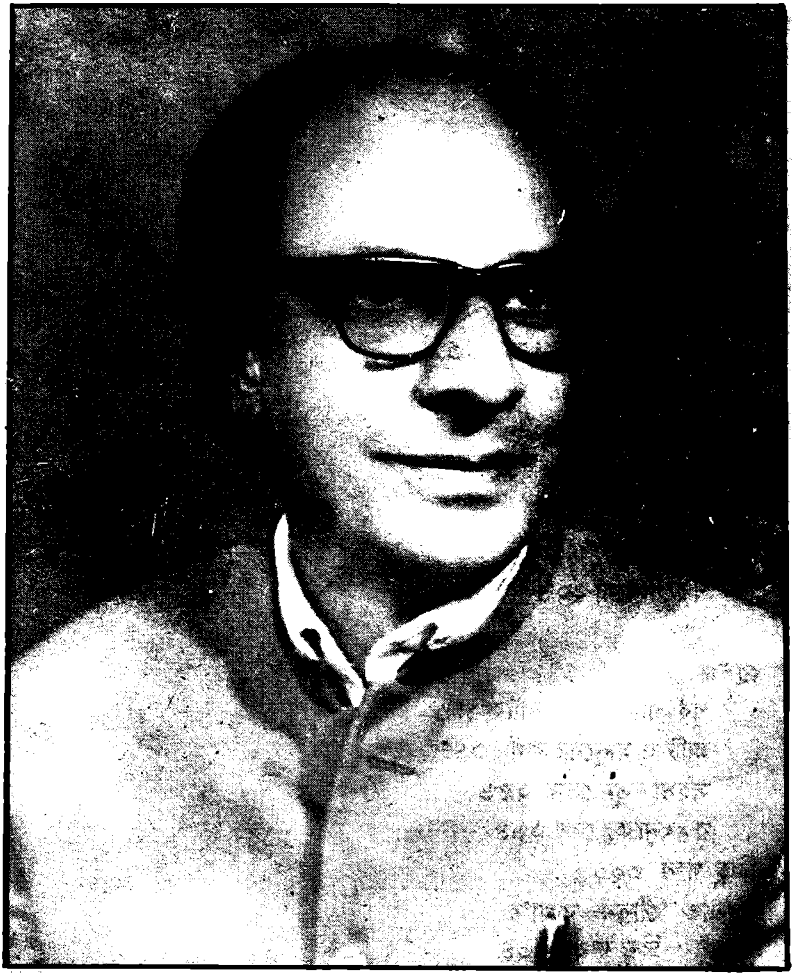

www.pathagar.com

ইন্টারভিউ

(মঞ্চনাটক)

চরিত্র—লিপি ঃ

আম্মু .... এক নিম্ন—মধ্যবিত্ত পরিবারের বিধবা প্রৌঢ়া মা
যুবায়ের .... আম্মুর অবিবাহিত বড় ছেলে
শাহ্‌রিয়ার .... আম্মুর বিবাহিত দ্বিতীয় ছেলে
পারভীন .... আম্মুর অবিবাহিতা ষোড়শী কন্যা
মিলি .... শাহ্‌রিয়ারের আধুনিকা স্ত্রী
খালাম্মা .... আম্মুর আশ্রিতা এক ভদ্রমহিলা
রিপোর্টার .... এক সাপ্তাহিক বিনোদন পত্রিকার রিপোর্টার
আসাদ .... এক জেল—ফেরত বিধ্বস্ত লোক
মাসুদ হাসান ...... এক তরুণ
১ম জন
২য় জন .... মাসুদের ভক্ত মস্তান ধরণের তরুণ
৩য় জন

※

(জিগাতলা এলাকার একটি সাধারণ বাড়ীর ড্রইংরুম; যথাসাধ্য সাজানো—গোছানো। তখন সকাল। বাইরে কলিং বেল বাজে। ড্রইংরুমে আসে পারভীন, দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বাইরে থেকে মাসুদ হাসান বলে—)

মাসুদ ঃ পত্রিকা নিয়ে যান।

পারভীন ঃ (দরজা খুলে) দিয়ে যান।

(মাসুদ হাসান দরজা পার হয়ে একটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পারভীনের হাতে দেয়। কিছুটা অগোছালো মস্তান ধরণের তরুণ মাসুদকে দেখে নিয়ে পারভীন বলে—)

বরাবর পত্রিকা দেয় সেই বুড়ো লোকটি কোথায়?

মাসুদ ঃ তিনি অসুস্থ। তাই আমাকেই আসতে হল।

পারভীন ঃ আপনি কে? কি নাম? কি করেন?

মাসুদ ঃ তিনি আমার নানা। আমার নাম মাসুদ, মাসুদ হাসান খান।

www.pathagar.com

গ্র্যাজুয়েশ্যন হয়ে গেছে, এখন এই সাপ্তাহিক বিনোদন পত্রিকায় পার্ট টাইম করি। কিন্তু এক হকারকে এত কথা জিজ্ঞেস করলেন .... আপনি কে? কি নাম? কি করেন?

পারভীন : আমি এ বাড়ীর একমাত্র মেয়ে, নাম পারভীন, পারু। এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছি। এবার আসতে পারেন।

(মুখে মৃদু হাসি নিয়ে চলে যায় মাসুদ। সোফায় বসে বিনোদন সাপ্তাহিকীতে মনোনিবেশ করে পারভীন। নিজের সাজসজ্জা ঠিকঠাক করতে করতে আসে মিলি। পত্রিকা থেকে মুখ না তুলেই পারভীন বলে–)

মেম সাহেবের সকালের সাজসজ্জা হয়ে গেল এর মধ্যেই?

মিলি : বিনোদন পত্রিকায় এত করে কি গিলছেন ননদিনী?

পারভীন : গিলছি এক মহিলাকে।

মিলি : নিজে মহিলা হয়ে অন্য এক মহিলাকে গিলছিস? তা মহিলাটি কে?

পারভীন : পাকিস্তানী কোটিপতি যায়েদী–হত্যা মামলার এক বাঙালিনী সাক্ষী। বিচিত্র পরিচয়– নার্স, প্রমোদবালা .... কত কি! তিনি এখন গোপনে বাংলাদেশে বাস করছেন! সব কথা উঠেছে পত্রিকায়। পড়বে নাকি?

(মিলি পত্রিকাটি নিয়ে দেখে)

মিলি : দেখতে খুবই মোহনীয়া রে পারু।

পারভীন : শাহ্‌রি ভাইয়া হলে বলত– লোভনীয়া।

মিলি : (পত্রিকায় চোখ রেখেই) তা হয়তো বলত– পুরুষ তো! .... আরে, এ যে দেখছি রীতিমত এক সিনেমা!

পারভীন : কিছু দিন আগে থেকেই লেখালেখি হচ্ছে। ওই যায়েদী সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি ভাবী?

(তখনই খালাম্মা এসে ফুলদানীতে ফুল রাখে এবং অন্যান্য সাজানো গোছানোর কাজে মনোযোগী হয়)

মিলি : একটি ভেড়া। সব দিক থেকেই।

পারভীন : রেখে ঢেকে কথা বল ভাবী। রুচিহীন মন্তব্যে খালাম্মা আহত হতে পারেন। আজ সকালের নাশতার মেন্যু কি থাকছে খালাম্মা?

খালাম্মা : তোমাদের যা যা পছন্দ তার অনেকগুলোই থাকছে রে পারু। আজকের নাশতায় বাড়ীর সবাই একত্র হচ্ছে তো!

www.pathagar.com

পারভীন : বড় ভাইয়া যে এখনও আসছে না খালাম্মা?

মিলি : বিজ্ঞানমনস্ক ডাক্তার, বলা যায় আপনভোলা। এখানে আসার কথা ভুলেই গেছেন কি না....

খালাম্মা : না না, যুবায়ের অবশ্যই আসবে।

(পারভীন আবার বিনোদন পত্রিকায় চোখ রাখে)

পারভীন : ওর চেহারায় রীতিমত যাদু আছে!

মিলি : কার চেহারার কথা বলছ?

পারভীন : মামলার সাক্ষী এই মহিলাটির। ভাবছি, আমার চেহারাটা এমন সাদামাটা হল কেন?

খালাম্মা : মা পারু, তোমার আম্মু সুপ করছেন। তাঁকে একটু সাহায্য কর গে'।

পারভীন : (অনিচ্ছায় যেতে যেতে) যাচ্ছি। (আপন মনে) কোন্ দিন যে এই গৃহ–স্কুল থেকে মুক্তি পাব!

(চলে যায়)

খালাম্মা : পারু এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেছে।

মিলি : সেটা আপনার দৃষ্টিতে। যাক, আমার মাথাটা কেমন ঝিম্ মেরে আছে। গতরাতে একটা আজেবাজে পার্টিতে না গেলেই ভাল করতাম।

খালাম্মা : এসব পার্টিতে বেশি না যাওয়াই ভাল বউমা। একটা এস্‌পিরিন দেব?

মিলি : না, ওসব লাগবে না। আধুনিক সমাজে চলতে গেলে পার্টিতে যেতে হয়। আপনাদের আগের দিনগুলো তো আর বসে নেই!

খালাম্মা : পার্টির ব্যাপার আগেও ছিল, এখনও আছে।

মিলি : পার্টির সেই আগের দিনে জানি না কি করে কেন আপনি পরিবারের বন্ধন মুক্ত হয়ে এ বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলেন!

খালাম্মা : কি করে আর কেন যে আমি সেই পরিবারমুক্ত হয়ে এ বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলাম, সেসব কথা তোমার শাশুড়ী জানেন। তবে সেই পাকিস্তান পিরিয়ডে যখন এখানে এসে আশ্রয় নিই, তখন তোমার স্বামীও বেশ ছোট। আর এখন তো....

মিলি : এখন তো আপনি আমার শাশুড়ীর ছোট বোনই নন শুধু, এ বাড়ীর এক জাঁদরেল গার্ডিয়ান!

www.pathagar.com

খালাম্মা : গার্ডিয়ান নই বউমা, তবে কিছুটা সম্মান জানাতে চাইলে আমাকে গভর্নেস বলেও ভাবতে পার। আমার দিক থেকে বলতে পারি– এ বাড়ীকে এখন আমি নিজের বাড়ী বলেই মনে করি।

মিলি : তা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু গভর্ন করে আমার স্বামীটিকে আর একটু উচ্চাভিলাষী করতে পারলেন না? একটা আরও ভাল চাকরী, জিগাতলার এই খামারবাড়ী ছেড়ে আরও একটু মডার্ন এলাকায় ....

খালাম্মা : প্রাইভেট ফার্মের চাকরীটাই তোমার স্বামীর পছন্দ। আর জিগাতলার এ পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে মডার্ন এলাকায় একটা বাড়ী— তাও হয়ে যেতে পারে!

মিলি : আর হয়ে যাবে! দু'বছর ধরে তো বলেই যাচ্ছি। কিন্তু আপনাদের ছেলে তো যে-কে সেই! লাইফে কোন এ্যাম্‌বিশ্যনই নেই। আপনি সেই বিখ্যাত সিদ্দিকী সাহেবকে জানেন?

খালাম্মা : তোমার মুখে ওই নামটা আগেও শুনেছি।

মিলি : কয়েক বছর আগে রিফিউজী হয়ে আসেন ঢাকায়। আর আজ? চমৎকার বাড়ী, একাধিক গাড়ী। একজন আধুনিক ভদ্রলোকের যা যা চাই, সবই তার আছে। রিফিউজী কোন এক সিদ্দিকী যদি এতসব করতে পারে, তাহলে ....

(তখনই ড্রইংরুমে আসে শাহ্‌রিয়ার)

শাহ্‌রিয়ার : সুপ্রভাত খালাম্মা!

খালাম্মা : সুপ্রভাত শাহ্‌রিয়ার!

মিলি : গোসল করতে এত দেরী লাগল? এতবড় বাড়ীতে দু'টি মাত্র বাথরুম থাকার যে কি ঝামেলা!

শাহ্‌রিয়ার : (চিন্তান্বিতভাবে) আমাকে কেউ ফোন করেছিল?

মিলি : কই, না তো! তোমাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে?

খালাম্মা : গতরাতে অনেকক্ষণ বোধ হয় পার্টিতে ছিলে! নাশতার আগে এক কাপ চা করে দেব?

মিলি : না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না খালাম্মা! পরে এক কাপ খাওয়া যাবে।

খালাম্মা : ওদিকে নাশতার কি হল, দেখি।

(খালাম্মা চলে যায়। শাহ্‌রিয়ার ফোন করে)

www.pathagar.com

শাহ্রিয়ার : হ্যালো! এটা কি সিদ্দিকী সাহেবের চেম্বার? ..... নেই তিনি? .... বলতে পারেন কখন পাওয়া যাবে তাঁকে? আমি জিগাতলা থেকে শাহ্রিয়ার বলছি। .... আচ্ছা, থ্যাঙ্ক ইউ।

মিলি : সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ? স্ট্রেঞ্জ! তাহলে কোন অভিলাষের ছোঁয়া লেগেছে বলতে হয়!

(আম্মু আসেন)

আম্মু : এই যে শাহ্রি! তোকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে? চাকরীর ব্যাপারে কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

শাহ্রিয়ার : আমার ওই সামান্য চাকরীতে আবার গোলমালের কি আছে আম্মা?

মিলি : গোলমাল কি হতে পারে না? কত বড় চাকরী, চলে গেলে তো জীবনটাই ব্যর্থ!

(বলেই বিরক্ত হয়ে চলে যায়)

আম্মু : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আজকাল শাশুড়ী হওয়ার বড় ঝামেলা রে! কিছু বলতে চাইলেও বলা হয়ে ওঠে না। অথচ তোদের চিন্তায় ....

শাহ্রিয়ার : কিচ্ছু ভেবো না আম্মু। মিলি এমনিতে ভালই, তবে ... ইয়ে ... একটু এ্যাম্বিশাস্ আর কি! জেনে রেখো, তার মতামত সব সময় আমার মতামত নয়!

আম্মু : এই সকালটায় তোকে খুবই অস্থির মনে হচ্ছে!

(টেলিফোন বেজে ওঠে। শাহ্রিয়ার ব্যগ্রভাবে গিয়ে টেলিফোন ধরে)

শাহ্রিয়ার : হ্যালো! কে? ও! পত্রিকা অফিস থেকে? বিনোদন সাপ্তাহিকী? .... হ্যাঁ, একজন মিস খান এখানে থাকেন। .... ইয়েস .... আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলতে চান? .... ঠিক আছে, বলব। (ফোন রেখে) সাপ্তাহিক পত্রিকার রিপোর্টার। সবাইকে রেখে দরকার হল খালাম্মাকে!

আম্মু : তাকে ডেকে দিলেই পারতিস!

শাহ্রিয়ার : রিপোর্টার বললেন– তিনি এখানেই আসবেন। খালাম্মার সঙ্গেই তার চাক্ষুস পরিচয় ও কথাবার্তা হবে।

আম্মু : তাহলে তাকে তো বলে রাখতে হয়!

(বাইরে থেকে আসে তরুণ ডাক্তার যুবায়ের)

www.pathagar.com

যুবায়ের : আম্মু!

আম্মু : যুবায়ের! শেষ পর্যন্ত আম্মুকে দেখতে এলে তাহলে! কিন্তু আজকের দিনটা আমার কাছে থাকবি তো?

যুবায়ের : থাকব বলেই এলাম আম্মু। কেমন আছ শাহ্‌রি?

শাহ্‌রিয়ার : তেমন খারাপ কিছু নয়।

যুবায়ের : তোমাদের জন্য একটা খবর আছে।

শাহ্‌রিয়ার : তোমার ল্যাবরেটরি সম্পর্কে?

যুবায়ের : তা–ই। ল্যাবরেটরির জন্য একটা জায়গা পেলাম। বড় জায়গা নয়, তবুও যন্ত্রপাতি বসানো যাবে।

আম্মু : খুবই খুশীর খবর বাবা। এবার তাহলে তুমি তোমার গবেষণার কাজে এগিয়ে যেতে পারবে।

যুবায়ের : তা পারবারই কথা, কিন্তু সমস্যা থেকে যাচ্ছে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য মোটা টাকার।

শাহ্‌রিয়ার : টাকার সমস্যাই জীবনের প্রধান সমস্যা ভাইয়া!

আম্মু : এজন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় না? অথবা তোদের হাসপাতালের কোন ফান্ড থেকে কোন ঋণ?

যুবায়ের : না আম্মু, এসব সোর্স দেখা হয়ে গেছে। কোন আশা নেই। তাছাড়া আমরা যা নিয়ে গবেষণা করছি, তা এখনও প্রাথমিক স্তরেই রয়ে গেছে। এ–অবস্থায় গবেষণার ফলাফল সম্পর্কেও কিছু বলা যাচ্ছে না।

শাহ্‌রিয়ার : যে রোগ নিয়ে তোমার গবেষণা, তাতে চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে কত অসহায় মানুষ! তার প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হলে দেশের যে কত উপকার .... আচ্ছা, একাজে সাহায্য করতে ব্যক্তিগতভাবেও কেউ এগিয়ে আসছে না?

যুবায়ের : নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এখানে আমরা তা এখনই আশা করতে পারি না। তাই নিজেদের চেষ্টাতেই এগিয়ে যাব ভাবছি। এই ক'বছরে তার জন্য কিছু সঞ্চয়ও করে রেখেছি আম্মু!

(পারভীন আসে)

পারভীন : এই তো বড় ভাইয়া এসে গেছেন। এখন তো নাশতার টেবিলে যাওয়া যায় আম্মু!

(তখনই ফোন বাজে। পারভীন গিয়ে ফোনে কথা বলে। তারপর ফোন হাতে চেপে ধরে বলে–)

www.pathagar.com

		আম্মু, সেই সাপ্তাহিক বিনোদন পত্রিকার এক রিপোর্টার আসছেন। মিস খান মানে খালাম্মার সঙ্গে দেখা করতে চান।
আম্মু	ঃ	ঠিক আছে, আসতে বলে দে'।
		(পারভীন নিম্ন কণ্ঠে কথা বলে ফোন রেখে দেয়)
যুবায়ের	ঃ	খালাম্মার কাছে ওসব আজেবাজে পত্রিকার কি কাজ পড়ল?
আম্মু	ঃ	এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। পারু, তোর খালাম্মাকে খবরটা জানিয়ে দে'।
		(পারভীন চলে যায়। শাহ্‌রিয়ার জানালাপথে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে)
যুবায়ের	ঃ	বাইরে কি দেখছ শাহ্‌রি?
শাহ্‌রিয়ার	ঃ	একটা গুন্ডামত লোক এখানে-ওখানে থেকে আমাদের বাড়ীটা দেখছে!
		(তখনই আসে মিলি! আম্মু ভেতরে যান)
মিলি	ঃ	ওই লোকটাকে আমিও লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হয়, আমাদের খালাম্মাকেই খুঁজছে লোকটা।
যুবায়ের	ঃ	না না, লোকটা যে এ বাড়ীর কাউকে খুঁজছে, তারই বা নিশ্চয়তা কি?
মিলি	ঃ	নিশ্চয়তা কোন কিছুরই নেই। তবুও খালাম্মাকে খোঁজার সম্ভাবনাটাই বেশি।
		(পারভীন আসে। তার হাতে তখনও সেই সাপ্তাহিকীটা)
পারভীন	ঃ	নাশতা কিন্তু রেডি।
যুবায়ের	ঃ	চল শাহ্‌রি, তোমার অফিস কেমন চলছে, নাশতা খেতে খেতে তা শোনা যাবে।
মিলি	ঃ	কিন্তু রিপোর্টার আসছে যে?
শাহ্‌রিয়ার	ঃ	খালাম্মা এসে তার সঙ্গে কথা বলবেন। এস।
		(যুবায়েরকে নিয়ে শাহ্‌রিয়ার ভেতরে যায়। মিলিও যাচ্ছিল, পারু তাকে হাত ধরে আটকে রাখে। হাতের পত্রিকাটা দেখায়, বলে-)
পারভীন	ঃ	ভেতরে ওই মামলার ওপর এমন একটা রিপোর্ট আছে যার সঙ্গে খালাম্মার সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়।
মিলি	ঃ	তাই নাকি? পত্রিকার রিপোর্টারও আসছে।
পারভীন	ঃ	তক্কে তক্কে থেকে শুনব আমরা। মানুষ যে কে কেমন তা

www.pathagar.com

সহজে বুঝা মুস্কিল।

(তখনই বাইরে কলিং বেল বাজে)

ওই, রিপোর্টারই হবে!

(গিয়ে দরজা খোলে)

আপনিই বোধ হয় পত্রিকার রিপোর্টার?

রিপোর্টার : জ্বি। ভেতরে আসব?

পারভীন : আসুন।

(রিপোর্টার ভেতরে আসে।)

আপনি বসুন, আমরা খালাম্মাকে ডেকে দিই।

(রিপোর্টার বসে। ওরা বেরিয়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই আসে খালাম্মা)

খালাম্মা : আপনি আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন?

রিপোর্টার : আমি এই সাপ্তাহিক বিনোদন পত্রিকাটির রিপোর্টার।

(বিনোদন পত্রিকাটি খালাম্মার সামনে রাখে)

আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতেই আমার এখানে আসা। এতে আপনার সহযোগিতা আমি পাব আশা করি।

খালাম্মা : মেয়েরা এই বাড়ীতে পত্রিকাটা রাখে। কিন্তু আমার মত এক অখ্যাত মহিলার ইন্টারভিউ .... আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

রিপোর্টার : বুঝতে পারছেন না? আমাদের পত্রিকা যখন এ বাড়ীতে আসে, তাহলে যায়েদী সাহেবের কেসটার রিপোর্টটা পড়েছেন হয়তো!

খালাম্মা : (কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে) পড়েছি, কিন্তু তাতে কি?

রিপোর্টার : আমাদের বিশ্বাস, আপনি যায়েদী সাহেবকে অনেকদিন থেকেই চিনতেন!

খালাম্মা : আমার আশঙ্কা হচ্ছে– আপনাদের কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। আপনি আমাকে আর কারও সঙ্গে .... মানে .... আমাকে সেই মহিলা বলেই মনে করছেন যায়েদী সাহেবকে যার অনেকদিন থেকেই চেনার কথা।

রিপোর্টার : অন্যকে চেনাজানার ব্যাপার তো, ভুল হতেও পারে! আচ্ছা– (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) আপনি কি এক সময়, মানে ওই পাকিস্তান পিরিয়ডে, করাচীতে ক্যাবারে নর্তকী লিলি হান্‌যা নামে পরিচিতা ছিলেন না?

www.pathagar.com

খালাম্মা ঃ ক্যাবারে নর্তকী লিলি হান্‌যা!! আমিই সেই ক্যাবারে নর্তকী– এ ধারণা আপনার হল কি করে?

রিপোর্টার ঃ কিছুদিন ধরেই আমরা মিস হান্‌যার সন্ধান করছি। ব্যাপার কি জানেন, আমরা কিছুদিন আগেকার বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ওপর একটা জীবনী–সিরিয প্রকাশ করে চলেছি।

খালাম্মা ঃ আপনাদের সে–সিরিযটার কথা আমি জানি। কিন্তু কোন ক্যাবারে নর্তকীও কি বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন আপনারা?

রিপোর্টার ঃ অবশ্যই মনে করি। আগের দিনের 'কন্‌যারভেটিভ্‌ ধারণা আমাদের নেই। ক্যাবারে নর্তকীও সমাজের অন্যান্যদের মত এক মানুষ। তাই তার কোনও খ্যাতি মানুষেরই খ্যাতি। এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জনের খুঁজে পাওয়া তথ্যাবলী থেকে তাদের জীবনের কীর্তি–কাহিনীর কথা রি–মেক করেছি। কিন্তু আপনার বেলায় .... আই মীন মিস হান্‌যার বেলায় আমরা তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনা কাহিনীই প্রকাশ করতে চাই।

খালাম্মা ঃ এই হঠাৎ ব্যতিক্রমের কারণ?

রিপোর্টার ঃ একটা চমক সৃষ্টি– এইমাত্র! জাস্ট এ্যা কাল্‌চারেল্‌ ফান্‌!

খালাম্মা ঃ (বিদ্রুপের হাসি মুখে এনে) কাল্‌চারেল্‌ ফান্‌। কিন্তু যতটুকু জানি, লিলি হান্‌যার কাহিনী তো সুকাহিনী নয়!

রিপোর্টার ঃ এটা সু বা কু–এর সংজ্ঞার ব্যাপার। সকলের কাছেই সে–সংজ্ঞা এক নয়। মিস হান্‌যা ছিলেন সে সময়কার পাকিস্তানে সবচে' দৃষ্টি আকর্ষণকারী এক রমণী। রূপই বলুন, আর চাকচিক্য বা গ্লেমারই বলুন– সব দিকে থেকেই তিনি ছিলেন অনন্যা। তাই ধনকুবের যায়েদী সাহেবের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিবরণ পাঠকের কাছে খুবই আকর্ষণীয়ই হবে।

খালাম্মা ঃ আপনি মনে করেন– মিস হান্‌যার বিপথগামী জীবনের নোংরা খুটিনাটি পাঠকেরা লুফে নেবে? ভ্রান্ত জীবনের নোংরা চড়ায় এতটাই আটকে গেছে আজকের মানুষ?

রিপোর্টার ঃ আটকে গেছে কি না বলতে পারি না, তবে সেই চড়ার ওপর আজ তাদের উৎসুক দৃষ্টি।

খালাম্মা ঃ উৎসুক না বলে উৎপিপাসু বলা যায় না?

www.pathagar.com

রিপোর্টার : তা–ও হয়তো বলা যায়।

খালাম্মা : আচ্ছা, মিস হান্‌যা তো মানুষের ওই উৎপিপাসু চড়ায় হারিয়েই গেছে। তাকে সেই হারিয়ে যাওয়া অবস্থাতেই একটু শান্তিতে থাকতে দিতে পারেন না আপনারা?

রিপোর্টার : অবশ্যই পারি। আমরা শুধু তার স্বকথিত কাহিনীটাই চাই। আর তার জন্য বেশ কিছু পরিমাণ টাকাও আমরা দেব।

খালাম্মা : মানলাম– আপনারা টাকা দিয়ে মিস হান্‌যাকে কিছুটা শান্তিতে থাকার সাহায্য করতে চান। কিন্তু তার ভাঙা জীবনের পুরনো কাহিনীতে মানুষ এত আনন্দ পাবে কেন?

রিপোর্টার : এজন্য যে সে–কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক ধনকুবেরের হত্যা রহস্য। সেসময়ের উচ্চ বিলাসী জীবনের নারকীয় অথচ মজাদার এক স্বরূপ! এতে মানুষ পাবে উত্তেজনাকর এক নেশাগ্রস্ততার আনন্দ। যাক, আপনি কিন্তু নিজেরই অজান্তে আমাদের প্রত্যাশার অনেক কাছাকাছি এসে গেছেন! তাছাড়া, অনেক অনুসন্ধানের পর আপনার প্রকৃত নামও আমরা জেনেছি।

খালাম্মা : আমার সেই প্রকৃত নামটা কি?

রিপোর্টার : রোকসানা।

খালাম্মা : তাহলে রোকসানার কাহিনীও আবিষ্কৃত হয়েছে নিশ্চয়?

রিপোর্টার : পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই জানা হয়ে গেছে।

খালাম্মা : শুনতে পারি না কতটুকু জানলেন?

রিপোর্টার : আসাদ নামের এক যুবকের সঙ্গে রোকসানা ঘর ছাড়ে। ঘর মানে পাকিস্তানের সেই প্রথম দিককার বিখ্যাত উঁঠতি বড়লোক আলহাজ্ব শওকত হোসেন খানের সাজানো সংসার। সঙ্গে ছিল বেশ পরিমাণ টাকাকড়ি–গয়নাগাঁটি। চলে যায় তারা পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে ঘটনাচক্রে রোকসানা নিজেকে করে তোলে এক লোভনীয় পণ্য সামগ্রী। তারপর — হ্যাঁ, ওই 'তারপর'টাই আমরা শুনতে চাই তারই মুখ থেকে। এবং যা এ্যাভোয়েড করার জন্যই মিসেস রোকসানার বর্তমান অজ্ঞাতবাসের প্রয়াস।

খালাম্মা : বহু বছর আগে এ কাহিনী আমি পড়েছিলাম এক নাটকে। নাটকের নাম 'প্রচ্ছদপট'। সে–নাটকের অন্যতম দু'টি চরিত্র

www.pathagar.com

রোকসানা-আসাদের কাহিনীই কিছুটা বললেন আপনি। আর আপনার বলা কাহিনীটুকুই আমি জানি। অজ্ঞাত বাসে রোকসানা কোথায় কিভাবে আছে, কিছুই আমি জানি না।

রিপোর্টার : আচ্ছা, এক সময়ে আপনি নার্স ছিলেন না?

খালাম্মা : রোকসানা বেগমের পশ্চিম পাকিস্তানী জীবনের আর কোন কথা আমার জানা নেই। হয়তো তিনি সেখানে নার্সের কাজও শিখছিলেন!

রিপোর্টার : আপনি তাহলে রোকসানা বা মিস হান্‌যা নন?

খালাম্মা : জ্বি না।

রিপোর্টার : আচ্ছা, দেখুন তো- (একটা ফটো দেখিয়ে) এই ছবিটা আপনার নয়? বেশ ক'বছর আগের তোলা ফটো।

খালাম্মা : (ছবিটা দেখে নিয়ে) হ্যাঁ, মনে হয় আমারই আগেকার ছবি। তবু বলছি- ছবির এই মহিলা আমি নই।

রিপোর্টার : কিন্তু আমরা নিশ্চিত- এই ছবি রোকসানা বেগমেরই আগের দিনের ছবি।

খালাম্মা : আমার সঙ্গে এই ছবির পুরোপুরি মিল যা দেখছেন- আমি বলব, সেটা দৈবক্রমে।

রিপোর্টার : আমি এখন উঠব। (মুখে হাসি এনে) আমার ফোন নম্বর দিয়ে যাচ্ছি। যদি আপনার মতের কোন পরিবর্তন হয়, যদি রোকসানা বেগমের বাকি অজানা কাহিনী দিতে চান, তাহলে আমাদের টাকার প্রস্তাব তো রইলই, মোটা অঙ্কই পাবেন- আমাকে ফোনে ডাকলেই আমি আসব। আসি।

(চলে যায় রিপোর্টার। নির্বাক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে খালাম্মা। যুবায়ের ও শাহ্‌রিয়ার আসছে কথা বলে বলে। তা-ই শুনে সচেতন হয়ে ওঠে খালাম্মা। আসে যুবায়ের ও শাহ্‌রিয়ার)

যুবায়ের : আমাদের বাড়ীর বাগানটা কিন্তু চমৎকার।

শাহ্‌রিয়ার : বাগানে কাজ করার জন্য যদি আরও কিছু সময় পেতাম! কিন্তু মিলির লাইফ স্টাইলটা এমন যে তার সঙ্গে তাল মিলাতেই আমার অনেক সময় কেটে যায়।

যুবায়ের : তারপর খালাম্মা, পত্রিকার রিপোর্টার এসেছিল কেন?

খালাম্মা : ইন্টারভিউ নিতে। ওরা জেনেছেন, আমি এমন একজন মহিলাকে চিনি জানি, যার ওপরে ওদের প্রচন্ড ঔৎসুক্য।

www.pathagar.com

শাহ্‌রিয়ার : আপনি কিন্তু খালাম্মা একজন রহস্যজনক মহিলা!

(মিলি এসে রুমের এটা ওটা দেখে)

খালাম্মা : হ্যাঁ, তোমাদের কথাবার্তা থেকেও আজ এমনটা মনে হচ্ছে আমার। যাক, নতুন ল্যাবে কবে থেকে কাজ আরম্ভ করছ যুবায়ের?

যুবায়ের : তা নির্ভর করছে বাদবাকি অর্থ সংগ্রহের ওপর।

খালাম্মা : ল্যাবের জন্য কোথায় জায়গা পেলে?

যুবায়ের : মালিটোলায়।

মিলি : মালিটোলার গলিতে প্রতিষ্ঠিত হবে আপনাদের সায়েন্টিফিক ল্যাবরেটরি?

যুবায়ের : অল্প ভাড়ায় অন্য কোথাও জায়গা পেলাম না তো!

মিলি : আপনারা বড় হতে চান, অথচ তার জন্য যতটুকু রিস্ক নেয়া দরকার তা নিতে ভয় পান। আপনার ভাইটিরও এই-ই নেচার।

শাহ্‌রিয়ার : মিলি, তুমি কি অনেক টাকার স্বপ্ন ছাড়া ঘুমঘোরেও আর কিছু দেখ না?

মিলি : না, দেখি না। সবার মত আমরাও অর্থশালী হতে চাই। আর অস্বীকার করতে পার– তুমিও তা-ই চাও? চাও, অথচ তা করতে চাও ভীরুর মত।

যুবায়ের : দেখুন খালাম্মা, বাইরের আকাশে মেঘ জমছে। বৃষ্টি হবে।

(যুবায়ের ও খালাম্মা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়)

খালাম্মা : বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও আসতে পারে।

যুবায়ের : ওই যে, গুন্ডামত লোকটাকে আবার দেখা যাচ্ছে!

(শাহ্‌রিয়ারকে ফোন করতে দেখে মিলি বলে–)

মিলি : কাকে আবার ফোন করছ?

শাহ্‌রিয়ার : (উত্তর না দিয়ে) হ্যালো, সিদ্দিকী সাহেব? .....আমি শাহ্‌রিয়ার বলছি। অনেক কষ্টে আপনাকে পেলাম। .... হ্যাঁ হ্যাঁ, টাকাটা সম্পর্কেই .... কি বললেন? .... কিন্তু আপনাকে যে তার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে! .... না না, আর অপেক্ষা করার কোন সুযোগই আমার নেই। .... সিদ্দিকী সাহেব, হ্যালো, হ্যালো .... হায় কপাল!

(হতাশভাবে ফোন রেখে দেয় শাহ্‌রিয়ার)

www.pathagar.com

মিলি : কি হয়েছে?

শাহ্‌রিয়ার : এক অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছি আমি! চরম এক বোকামী করে ....

মিলি : কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।

যুবায়ের : কি ব্যাপার শাহ্‌রি? সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে তোমার একটা ডিলের কথা আমি শুনেছিলাম!

শাহ্‌রিয়ার : সে ব্যাপারেই। আমার দেওয়া টাকা সে এখন ফেরত দিচ্ছে না! (মিলিকে) তোমার মনে আছে নিশ্চয়, আমরা একটা বাড়ী কেনার ব্যাপারে তার সাহায্য চেয়েছিলাম। সে তখনই বিশ হাজার টাকা চাইল তার সাময়িক একটা প্রয়োজন মেটাতে। বলেছিল- এর বদলে সে আমাকে সহজ কিস্তিতে একটা বাড়ী পাইয়ে দেবে।

মিলি : তারপর?

শাহ্‌রিয়ার : আমাদের ফার্মের ক্যাশ থেকে ওই টাকা আমি তাকে দিয়েছিলাম।

মিলি : এত বোকা তুমি?

শাহ্‌রিয়ার : সিদ্দিকী আমাকে কথা দিয়েছিল- প্রয়োজন হওয়া মাত্র সে আমাকে ওই টাকা দিয়ে দেবে!

যুবায়ের : না, সিদ্দিকীরা তা কোনদিন দেয় না।

মিলি : শাহ্‌রির চাকরীই যাবে না শুধু, মোকদ্দমাতেও জড়িয়ে পড়তে পারে! তাতে মান-সম্মান ....

শাহ্‌রিয়ার : (যুবায়েরকে) ভাইয়া, এই বিপদ থেকে বাঁচার কোন উপায়ই আমার নেই?

(সবাই চুপচাপ, উৎকর্ণ। খালাম্মা ও পারভীন চলে যায়)

যুবায়ের : কালই যদি টাকাটা তুমি পাও, তাহলে লোক জানাজানির আগে তুমি তা ক্যাশভুক্ত করতে পারবে?

শাহ্‌রিয়ার : তা পারব। কিন্তু এতগুলো টাকা আমি কালকের মধ্যে পাচ্ছি কোথায়?

(পারভীন ভেতরে আসতে চেয়েও আড়ালে দাঁড়ায়)

যুবায়ের : সে টাকা আমিই দেব তোমাকে।

শাহ্‌রিয়ার : তুমি দেবে?

মিলি : ভাইজান, আপনি সত্যি-সত্যিই এতগুলো টাকা দেবেন

www.pathagar.com

আমাদের? সত্যিই?

যুবায়ের : ভাইকে বিপদ থেকে বাঁচাতে তা-ই করতে হবে আমাকে!

শাহ্‌রিয়ার : কিন্তু তুমি যে ল্যাব করার জন্য মাসের পর মাস ধরে এই টাকা জমিয়েছ?

যুবায়ের : ল্যাব করার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে!

(পারভীন আসে)

পারভীন : আম্মু নানা রকম শরবত বানাতে ব্যস্ত। তোমাদেরকে তাঁর কাছে যেতে বলেছেন।

মিলি : শরবত বানাচ্ছেন তিনি। এর জন্য সবাইকে সেখানে যেতে হবে কেন?

পারভীন : তোমরা চেখে টেখে দেখবে, কথা বলবে — আম্মু আজ ভীষণ খুশীতে আছেন।

মিলি : আচ্ছা, তুমি যাও। আমি সবাইকে নিয়ে আসছি।

(পারভীন চলে গিয়ে আবার আড়ালে দাঁড়ায়)

শাহ্‌রিয়ার : কিন্তু আমি তোমাকে তা করতে দিতে পারি না ভাইয়া!

যুবায়ের : বোকার মত কথা বলো না শাহ্‌রি। এ্যাম্‌বিশ্যনের ফাঁদে পড়ে যা করেছ, তার পরিণতিটা তুমি অনুধাবন করতে পারছ না।

শাহ্‌রিয়ার : কিন্তু তার অর্থ যে তোমার এতদিনের স্বপ্নকে ইচ্ছা করে ভেঙ্গে দেয়া!

যুবায়ের : এসব সেন্টিমেন্টাল কথা রাখ। আমি এখনই চেক লিখে দিচ্ছি। কাল ভাঙ্গিয়ে যা করতে হয় ঠিক ঠিক করে ফেলবে।

(ব্যাগ থেকে চেক বই বের করে চেক লেখে)

শাহ্‌রিয়ার : তোমার টাকা আমি শিগগীরই ফিরিয়ে দেব ভাইজান!

যুবায়ের : পার, দিয়ো। কিন্তু এ ব্যাপারটা যেন আর কেউ না জানে।

(পারভীন আড়াল থেকে চলে যায়। যুবায়ের চেকটা শাহ্‌রিয়ারকে দেয়)

মিলি : আপনি এক মহৎ ব্যক্তি ভাইজান!

যুবায়ের : তোমার এ মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

(আম্মু আসেন, সঙ্গে খালাম্মা)

আম্মু : কই, তোমরা আসছ না? যুবায়ের এতবড় একটা সুখবর নিয়ে এল। তারই জন্যে আজকের লাঞ্চটা তোমাদের ফুফুর বাসায় হলেও তা হবে আমাদের পারিবারিক এক প্রীতিভোজ।

www.pathagar.com

সেখানে কিছু নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরা আমাকে সাহায্য কর। এস। একা আমি পেরে উঠছি না।

যুবায়ের : কিন্তু আমি সাংঘাতিক স্মরণীয় কিছু করতে যাচ্ছি না আম্মু!

আম্মু : হ্যাঁ, তা-ই করতে যাচ্ছিস। একটা নতুন প্রয়াসে তুই সফল হতে যাচ্ছিস। আমি জানি, তোর এ প্রয়াসে দেশের আপামর জনসাধারণ উপকৃত হবে। এর চাইতে মহৎ কাজ আর কি হতে পারে? আর তোর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মাসের পর মাস সঞ্চয় করে গেছিস সামান্য আয়ের অংশ! তোর সেই স্বপ্ন আজ রূপ নিতে যাচ্ছে শুনেই আমার এই আনন্দ! এবার আয় তোরা।

(আম্মু চলে যান। অন্যেরাও যাবে, তখনই খালাম্মা এসে যুবায়েরকে বলে-)

খালাম্মা : যুবায়ের, তোমার সঙ্গে সামান্য একটা কথা আছে।

মিলি : (সন্দিগ্ধকণ্ঠে) আম্মা যে সবাইকে ডাকছেন!

যুবায়ের : তোমরা এগোও, আমি খালাম্মাকে নিয়ে আসি।

(শাহ্‌রিয়ার ও মিলি চলে যায়)

খালাম্মা : এইমাত্র চেক লিখে দিয়ে শাহ্‌রিকে তুমি বিপদমুক্ত করলে। পারু আড়াল থেকে সবই শুনেছে, দেখেছে।

যুবায়ের : তাই নাকি? আম্মুকেও বলে নি তো?

খালাম্মা : না, আমাকেই বলেছে শুধু। আর কাউকেই বলতে আমি মানা করে দিয়েছি।

যুবায়ের : আমি বিশ্বাস করি, আপনার মুখ থেকে খবরটা আর ছড়াবে না খালাম্মা!

খালাম্মা : অবশ্যই ছড়াবে না। কিন্তু তোমার ল্যাবের কি হবে?

যুবায়ের : কিছুদিনের জন্য কাজটা স্থগিত থাকবে- এই আর কি।

খালাম্মা : খুবই দুঃখের কথা!

যুবায়ের : এ সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন কথা নয়। আর ওই বাচাল মেয়েটাকে আপনি সামলান খালাম্মা। .... এ কি! আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? মনে হচ্ছে, দুনিয়ার এক আশ্চর্য জিনিস দেখছেন! অমন করে তাকিয়ে থাকবেন না- প্লিয। এমন কিছুই আমি করিনি যাতে দুনিয়াটা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে!

www.pathagar.com

খালাম্মা ঃ আজকের দুনিয়ায় এমনটি সাধারণত কেউ করে না, করতে চায় না! তাই তোমাকে দেখছিলাম। তুমি এগোও বাবা, আমি আসছি।

(যুবায়ের চলে যায়। খালাম্মার মনে বিভিন্নমুখী চিন্তার স্রোত। একবার টেলিফোনটার দিকে তাকায়, পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে যেন অন্য চিন্তায় ডুবে যায়। বোঝা যাচ্ছে, খালাম্মা খুবই দ্বিধাগ্রস্ত। কিছু একটা করতে চায়, কিন্তু মনের দিক থেকে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এসব ভাবান্তর হচ্ছে খুব দ্রুত। আর তখনই টেলিফোনটা বেজে ওঠে। সেদিকে ত্রস্তপায় এগিয়ে যায় খালাম্মা, ফোন তোলে)

হ্যালো! কে? আবার আপনি সেই বিনোদন পত্রিকা থেকে? .... কি বললেন? .... এই অল্পক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটার ডেভেলপমেন্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যার ফলে এ নিয়ে আপনাদের একটা সান্ধ্য স্পেশ্যাল বের করতেই হচ্ছে? স্ট্রেঞ্জ! .... এবং আমাকেই তার প্রায়শ্চিত্তের ফলটা ভোগ করতে হবে? .... ও, আপনারা একেবারে নিরুপায়? .... কি বললেন? স্টোরি না দিলে আমি আরও কঠিন বিপদে জড়িয়ে যাব? ..... আর দিলে আমাকে নিয়ে আর যাতে ঘাঁটাঘাঁটি না হয়, সেদিকটা দেখবেন আপনারা? .... ঠিক আছে, আসুন। আমার স্টোরি দেয়ার জন্য আমি তৈরী।....কিন্তু কখন আসছেন? এই মিনিট কয়েকের মধ্যে? আচ্ছা, আপনি কি আগে থেকেই জানতেন যে এ বাড়ীর সবাই আমরা দুপুরে কাছেই এক আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াতে যাব?.... ও, জানতেন না? .... না না, ঠিক আছে। আমি বাড়ীতেই থেকে যাচ্ছি।

(ফোন রেখে দেয় খালাম্মা। মুখে তার চিন্তা মেশানো দৃঢ়তা। আম্মু আসেন। পেছনে পেছনে এসে দরজার প্রায় আড়ালে দাঁড়ায় মিলি ও পারভীন)

আম্মু ঃ কি গো, তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ? ওদের বাড়িতে লাঞ্চ টাইমের আগেই তো যেতে হবে। শুধুমাত্র খাওয়াটাই তো বড় কথা নয়! সবাই বসে গল্পগুজব করব, সকলের একত্র হওয়া তো হয়েই ওঠে না। আজ সবাই আমরা একত্রিত হচ্ছি। তার ওপর আমার যুবায়েরের এই সাফল্য।

www.pathagar.com

আজ আমার পাওয়ার ভান্ডার যে কানায় কানায় পূর্ণ!

খালাম্মা : (সসঙ্কোচে) আপা, আমি যে হঠাৎ করেই আজ একটা অপ্রিয় কাজে জড়িয়ে গেলাম– তা তো জানেনই! পত্রিকার সেই লোকটা একটু আগে আবার ফোন করেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা আমার ইন্টারভিউ নিতে আসছেন! ব্যাপারটা নাকি আমার জন্য খুব সিরিয়াস হয়ে উঠছে। আমি তাই আপনাদের সঙ্গে ও বাড়ীতে আর যেতে পারছি না।

(দরজার প্রায় আড়ালে থেকে মিলি ও পারভীন পরস্পরের দিকে তাকায়। তাদের মুখে খুব 'মজাদার সন্দেহ')

আম্মু : কি যে এক মুস্কিলে আটকে গেলে! পত্রিকার ব্যাপার–স্যাপার — ইন্টারভিউ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও তো দেখছি না! তাহলে তোমাকে ছাড়াই আমাদের যেতে হবে। ঠিক আছে, আমরা মনে করব — তুমিও আমাদের সঙ্গেই আছ! কিন্তু ইন্টারভিউ দেবে বেশ বুঝে শুনে।

(আম্মু চলে যান। মিলি–পারভীনও কেটে পড়ে। রুমের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়ায় খালাম্মা)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সেই একই ড্রইংরুম। তখন মধ্যাহ্নের অবসান হয়েছে। খালাম্মা ড্রইংরুমে একা দাঁড়িয়ে ভাবছে। নিজেরই নেপথ্য কণ্ঠ ভেসে আসছে নিজেরই কানে। সেসব কথা শোনার সময় খালাম্মা কিছুটা পায়চারি করে, আবার স্থির হয়ে দাঁড়ায়)

নেপথ্যকণ্ঠে

খালাম্মা ঃ আজ থেকে প্রায় দুই যুগ, হ্যাঁ, সুদীর্ঘ প্রায় দুই যুগ ধরে সর্বরকম বঞ্চনার শিকার হতে হতে শেষতক আজ আমি এক জঘন্যতম অপরাধের আসামী? কিন্তু আমিই তো ছিলাম ..... কি ছিলাম আমি? পুরো কাহিনীর নিয়ন্তা এক ভয়ঙ্কর নারী, অথবা নীরব নির্দোষ এক অবহেলিতা চরিত্রের অভিনেত্রী?

(তখনই আসেন আম্মু, আর কিছুটা পেছনে এসে দরজায় দাঁড়ায় মিলি ও পারভীন)

আম্মু ঃ তুমি আর যেতে পারছ না যখন, তখন আমরাই গেলাম বোন। আসতে দেরী করব না। বাসায় তুমি একা রইলে। সাবধানে থেকো।

(আম্মু চলে যান। তাঁর পেছনে পেছনে যাওয়ার আগে মিলি ও পারভীন বলে–)

মিলি ঃ খুব সাবধানে। একা থাকবেন, বরং রুমের দরজা–জানালা বন্ধ করে দিন।

পারভীন ঃ শুধু রিপোর্টার এলে খুলে দেবেন। বলবেন আপনার গোপন কাহিনী!

(ওরাও চলে গেলে খালাম্মা ব্যগ্রভাবে রুমের দরজা–জানালা বন্ধ করে এসে মাঝখানে দাঁড়ায়)

খালাম্মা ঃ আমি না খুললে যে কেউ এখন আর এখানে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু রিপোর্টার তো আসবে। রোকসানা সম্পর্কে রিপোর্টারের মুখ থেকে যা শুনেছি, তার সূত্র ধরে মনগড়া কিছু বলে দেব? কিন্তু ওরা যদি মিথ্যা বলে তা ধরে ফেলে? তাহলে? তাহলে আমার কোন্ কাহিনী জানাব তাকে?

(তখনই একটি ভাঙা ভাঙা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে আসে নেপথ্য

www.pathagar.com

থেকে। সে-কণ্ঠ শুনে অনেকটাই ঘাবড়ে যায় খালাম্মা। তাঁর মনে অপ্রকাশিত প্রশ্নঃ একি ইতিহাসের কণ্ঠ, অথবা বিকৃত সমাজ-বিচ্যুতির? ঘাবড়ে গিয়েও খালাম্মা উত্তর দিয়ে যায়, এবং এক সময় নিজেরই অজ্ঞাতে যথেষ্ট দৃঢ় কণ্ঠেই উত্তর দিতে থাকে)

নেপথ্য কণ্ঠ : তোমার বা তার কাহিনী বলে তো কথা নয়, কথা হচ্ছে সে-সময়কার পঁচা-গলা-ক্লেদাক্ত সমাজের এক কাহিনীর।

খালাম্মা : কিন্তু সে-কাহিনী বলার জন্য আমাকেই মনোনীত করা হল কেন?

নেপথ্য কণ্ঠ : তোমাকেই সে সময়ের প্রতিনিধি বলে ধরে নেয়া হয়েছে, তাই।

খালাম্মা : কিন্তু কেন? অন্য সব সক্রিয় চরিত্র থাকতে আমাকেই প্রতিনিধি করা হল কেন?

নেপথ্য কণ্ঠ : কারণ তোমাদের পরিবারেই ছিল এমন কয়েকটি চরিত্র যাতে ধরা পড়েছিল সমাজের একটি বিশেষ দিক। দেশের বৃহত্তর সমাজ দারিদ্র আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে কাতরালেও তোমাদের ছিল সোনার হরিণ ধরার ইচ্ছা। এর জন্য এল নৈতিক অধঃপতন, এল চূড়ান্ত লাম্পট্য, নীরব ধ্বংসের বিলাস-মধুর অদম্য আকর্ষণ।

(হঠাৎ সেই কণ্ঠ খুবই রুক্ষ হয়ে ওঠে)

মিস রোকসানা সমাজের কি পরিচয় তুলে ধরেছিল?

খালাম্মা : পরিবারে কি শুধুমাত্র রোকসানাই ছিল?

নেপথ্য কণ্ঠ : না, ছিল তার বড় বোন ফরযানাও। ছিল তাদের একমাত্র ভাই জাহিদ হোসেন খান। সবার ওপরে ছিলেন সমাজ-প্রধান বড়লোক আলহাজ্ব শওকত হোসেন খান।

খালাম্মা : (হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে) জানি, এর পর কি বলা হবে তা আমি জানি। কিন্তু রোকসানার প্রেমিক আসাদের কথা? তার চরিত্রে সমাজের কোন্ রূপ ফুটে উঠেছিল?

নেপথ্য কণ্ঠ : অজ্ঞান উচ্চাভিলাষীর অসহায় রূপ! যে-নাটকে এসব তুলে ধরা হয়েছিল, তার কথা তুমি জান। (শান্ত কণ্ঠে) আপাতত আমার আর কিছু বলবার নেই।

(ক্ষণকালের নীরবতা। তখনই কলিং বেল বেজে ওঠে)

www.pathagar.com

খালাম্মা ঃ কে?

(দরজা খুলে দিয়ে)

আসুন।

(রিপোর্টার আসে। কিন্তু তখনই আলো চলে যায়)

রিপোর্টার ঃ আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। আমরাও এলাম, আর কারেন্টও চলে গেল!

(খালাম্মা নিজেই টেবিলে রাখা স্ট্যান্ডের মোমবাতি জ্বালায়। সে-আলোতে রুমের কিছুটা আলোকিত হলেও রুমের বাদবাকি অংশে সৃষ্টি হয় আলো-আঁধারের এক রহস্যময় আবহ)

আমাদের কাজে হাত দেয়ার আগে আপনার পাওনার ব্যাপারটা সেরে ফেলতে চাই। এসব ব্যাপার যথেষ্ট টাচি বলে চেকের বদলে আমি নগদ টাকাই নিয়ে এসেছি। এই বান্ডেলে পঁচিশ হাজার টাকা রয়েছে। মেহেরবানী করে টাকাটা নিন।

(মোমবাতির স্ট্যান্ডের কাছে রিপোর্টার খালাম্মাকে টাকার বান্ডেলটা দেয়। কম্পিত হাতে বান্ডেলটা গ্রহণ করে খালাম্মা)

আপনি এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? বান্ডেলটা খুলে টাকাটা বুঝে নিন। এতে ঘাবড়ে যাবার মত কিছু নেই।

খালাম্মা ঃ বান্ডেলে আপনার কথামত টাকাই আছে বলে আমি বিশ্বাস করছি। আর .... হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটাই ঘাবড়ে যাওয়ার মত কি না, তাই ....

(বেশ উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে রিপোর্টার)

রিপোর্টার ঃ আপনাকে অভয় দিচ্ছি- ঘাবড়াবেন না। আমার দু'জন এ্যাসিসটেন্ট কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে দরজার ওপাশটায় আছে। আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু যন্ত্রের মাধ্যমে তারা আমাদের দেখছে। ওখানে প্রোজেকশ্যন মেশিনও আছে। আপনার পাকিস্তানী জীবনের কিছু চিত্র আমরা সংগ্রহ করেছি। বাকি কাহিনী বলার আগে তার কিছুটা দেখে নেবেন না মিস রোকসানা?

খালাম্মা ঃ এখানে নিজেকে আমার বন্দিনী মনে হচ্ছে। যা করতে চান, করুন। শুধু প্রার্থনা- তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আমাকে মুক্তি দিন!

www.pathagar.com

রিপোর্টার : (খুবই উৎসাহিত কণ্ঠে) সেই পাকিস্তানী জীবন — নবযৌবনের প্রধানাংশের কাছে সে–জীবন অত্যন্ত উদ্দাম, দুরন্ত, যৌনাভ্যাসে মদির, উচ্ছল!

(আদেশের সুরে)

এ্যাসিসটেন্ট! স্টার্ট!

(ড্রইংরুমের দেয়ালে প্রক্ষেপিত হয় চলন্ত ছবি, যৌন উদ্দীপনাময়ী নাচ–গানের রেকর্ডকৃত ছবি। নৃত্যরত অর্ধোলঙ্গ নরনারীর নৃত্য-প্রয়াস, তার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন গান। এমনি আবহে প্রায়ান্ধকারেই কথা বলে রিপোর্টার–)

এই–ই ছিল আপনার দুরন্ত জীবনের প্রারম্ভিক পরিবেশ মিস লিলি হান্‌যা! নিশ্চয়ই মনে পড়ছে সব! ছবির এ পর্যায়েও আপনি দৃশ্যপটে দেখা দেন নি। দেখা দেবেন আরও পরে। চরম লোভনীয় যৌবনের উন্মত্ত প্রকাশ এক উর্বশী আপনি! যায়েদীরা তখন অক্ষম কামনায় অধীর!

(ছবিতে দেখা যায়, প্রায় প্রৌঢ় কোন এক মাতাল যায়েদী তখন এগিয়ে আসা কোন 'উর্বশী'র হাত ধরতে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আদেশের সুরে রিপোর্টার বলে–)

এ্যাসিসটেন্ট, পাস অন্‌।

খালাম্মা : না, থাক।

রিপোর্টার : থাকবে? কেন? শুনুন মিস রোকসানা, যথেষ্ট টাকা আপনি নিয়েছেন। আমাদের প্রয়োজনে কোঅপারেট আপনাকে করতেই হবে। পাস অন্‌ এ্যাসিসটেন্ট!

(চলন্ত ছবিতে দেখা যায়, বিপর্যস্ত চেহারার আসাদ প্রায়ান্ধকারে পিস্তল ধরিয়ে দিচ্ছে এক গুন্ডাকে। গুন্ডা এগিয়ে যায়। আসাদ প্রায়ান্ধকারেই দাঁড়িয়ে দেখে)

খালাম্মা : আমি অসুস্থ বোধ করছি।

(তখনই আলো এসে যায়)

রিপোর্টার : সৌভাগ্য আপনারই। কারেন্ট এসে গেছে। আপনার কথামত লাইট অফ্‌ না করে এখন আর প্রোজেকশ্যন চালাব না। ততক্ষণ টেক রেস্ট।

খালাম্মা : হতভাগিনী রোকসানার উদ্দাম জীবন আপনাদের কাছে ধরা পড়ে আছে। গ্রাহকদের বিনোদন দিতে আর যা যা বলার

www.pathagar.com

প্রয়োজন, তা আপনারা লিখে নেবেন। এই সাদা কাগজে আমি দস্তখত করে দিচ্ছি।

(ড্রয়ার থেকে সাদা কাগজ বের করে একাধিক শিটে দস্তখত করতে থাকে খালাম্মা)

রিপোর্টার : পাগলের মত এত শিটে সই করছেন কেন?

খালাম্মা : আপনাদের দেয়া টাকার বিনিময়ে। ওই টাকাটার খুবই প্রয়োজন আমার।

(দস্তখত করা শিটগুলো রিপোর্টারের হাতে দেয়)

রিপোর্টার : মিস রোকসানা, জীবনের অনেক ভুলের মত এখনও বোকার মত যে ভুল করলেন, আমি তার সুযোগ গ্রহণ করব না। আপনি পাশের রুমে গিয়ে হাতমুখ ভাল করে ধুয়ে আসুন, আমি এর মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু কথা আপনার স্বীকৃতি হিসাবে এর একটা শিটে লিখে আনছি। বাকিগুলো আপনাকে ফেরত দিয়ে যাব।

(হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকার মত খালাম্মার অবস্থা তখন। রিপোর্টারের কথামত পাশের রুমে যায়। আর ঠিক তখনই মাসুদ হাসান ড্রইংরুমে আসে)

কি ব্যাপার, মেশিন ছেড়ে তুমি এখানে মাসুদ?

মাসুদ : একজন বিধ্বস্ত চেহারার লোক এই রুমে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। বলছে, এ বাড়ীর মিস রোকসানাকে সে ব্যক্তিগতভাবে চেনে-জানে। কি জন্য আমরা এখানে, তা সে জেনেছে। বলে--মিস রোকসানার সঙ্গে তার ইন্টারভিউও নিতে হবে।

রিপোর্টার : ওকে বুঝিয়ে বল--তার ইন্টারভিউ আমরা কাল-পরশু নেব। সে যেন আমাদের অফিসে যায়। আমি মিস রোকসানার একটা স্টেটমেন্ট তৈয়ার করছি। আমাকে যেন কয়েক মিনিট ডিসটার্ব করা না হয়।

(ড্রইং রুমের এক কোণে সোফায় বসে সাদা কাগজের একটা শিটে লিখতে আরম্ভ করে রিপোর্টার। মাসুদ বাইরে যায়। এবং তখনই ড্রইংরুমে ঢোকে এসে শাহ্‌রিয়ার ও মিলি)

শাহ্‌রিয়ার : (রিপোর্টারকে) একি, ইন্টারভিউ নিতে এসে এখানে খুব এ্যাডভেঞ্চার করছেন বলে মনে হচ্ছে?

(এর মধ্যে খালাম্মাও এসে যায়)

www.pathagar.com

মিলি : আপনাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি খালাম্মা?

খালাম্মা : হ্যাঁ, কাজ শেষ হয়ে গেছে আগেই। আমি হাতমুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছিলাম! কিন্তু তোমরা এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লে?

মিলি : আপনার জন্য সেখানেও আমাদের সাংঘাতিক রকমের একটা চিন্তা ছিল তো!

খালাম্মা : সাংঘাতিক রকমের চিন্তা? সেটা কি রকম?

(রিপোর্টার খালাম্মার কাছে এসে তাকে লেখা শিটটি দেখায়)

ঠিক আছে, আমাকে পড়তে হবে না।

রিপোর্টার : আমি সাংবাদিকতার সততা ভিত্তিক কর্তব্য পালনে সচেতন থেকেছি। এই নিন আপনার সই করা বাকি শিটগুলো।

(বাকি শিটগুলো খালাম্মার হাতে দেয়। এবার রিপোর্টার কথা বলে শাহ্রিয়ারের সঙ্গে)

আমাদের কাজটাই এ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে জড়িত মিস্টার শাহ্রিয়ার! এখানেও যা করে গেলাম, অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারবেন--বেশ বুদ্ধিমত্তার সাথেই আপনাদের একটা নিখুঁত পরিচয় যন্ত্রস্থ করে নিলাম। আসি।

(চলে যায় রিপোর্টার। শাহ্রিয়ার ও মিলি খালাম্মার মুখোমুখি হয়)

শাহ্রিয়ার : জানি না, কোন্ পরিচয়ের সঙ্গে আপনার এতদিনের আশ্রয়দাতা একটি নির্দোষ পরিবারকে জড়িত করলেন!

খালাম্মা : পরিচয়টা প্রকাশ পাবে আমার, তোমাদের নয়। তবে হ্যাঁ, এতে তোমাদের মহত্ত্বকে অনেকেই বোকামীর নামান্তর বলে ভাববে হয়তো।

মিলি : মানুষ এতটা উদার না-ও হতে পারে। সুন্দর শব্দের আড়ালে আমাদের এমন পরিচয় হয়তো তুলে ধরবে যাতে ধারণা হবে—কোন কোন পরিবার তো আজকাল এমন ব্যবসাও করে ....

(তখনই সেখানে আসে যুবায়ের)

যুবায়ের : বাক্যটি তোমার শেষ করোনা মিলি। অশালীন, অশোভন কিছু না ঘটে, তারই জন্যে আম্মা আমাকে তোমাদের পেছনে পেছনে পাঠালেন। শাহ্রি, তোমরা তোমাদের ঘরে গিয়ে

www.pathagar.com

বিশ্রাম কর, প্রিয়।

(শাহ্‌রিয়ার ও মিলি চলে যায়। খালাম্মার মুখোমুখি হয় যুবায়ের)

বিনোদন পত্রিকার এ-জাতীয় ইন্টারভিউ-এ আপনি রাজী হলেন কেন খালাম্মা?

খালাম্মা : রাজী না হয়ে আমার গত্যন্তর ছিল না।

যুবায়ের : আপনাদের ভেঙে যাওয়া পরিবারের কাহিনী আমি জেনেছি। তবু কেন জানিনা, আপনাকে সত্যি-সত্যিই আমার খালাম্মাই মনে হয়। এই সত্তর দশকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশের দশককে করুণাই করতে হয় শুধু!

খালাম্মা : অর্থাৎ আমাদের সে-সময়টার বিষবৃক্ষ আজ এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে, এই তো?

যুবায়ের : বললেন, ইন্টারভিউ না দিয়ে আপনার গত্যন্তর ছিল না। কেন? আমি আপনার কাছে অসঙ্কোচ উত্তরই আশা করি খালাম্মা!

খালাম্মা : (ক্ষণকাল ভেবে নিয়ে) টাকার জন্য বাবা, ওরা আমাকে অনেক টাকাই দিয়েছে।

যুবায়ের : আপনার নিশ্চয়ই টাকার খুব দরকার পড়েছিল? কিন্তু হঠাৎ করে এতটা দরকার --

খালাম্মা : হ্যাঁ, হঠাৎ করেই পরপর ঘটে গেল এমন কিছু ঘটনা, দৈবক্রম ছাড়া অন্য কিছুতে এর ব্যাখ্যা হয়না। সব কিছু একেবারেই হঠাৎ। হঠাৎ করেই আজ শুনলাম তোমার স্বপ্ন-সাফল্যের কথা, হঠাৎ করেই শুনলাম শাহ্‌রির বোকামীর কথা! সে-বোকামীর পরিণাম থেকে ভাইকে বাঁচাতে মুহূর্তের মধ্যে তোমার স্বপ্নকে অবলীলায় ভেঙে ফেলতে দেখলাম। তারপর হঠাৎ করেই এল আমার ইন্টারভিউর প্রশ্ন। এ ইন্টারভিউ দিতে কিছুতেই আমি রাজী হতাম না। কিন্তু ঘটনাক্রমের সব কিছু ভেবে আমাকে রাজীই হতে হল। এবং ভাবতে অবাক লাগে --সব কিছু হঠাৎ করে একদিনে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটে গেল! তাছাড়া, অনেক বছর পর আজই মিলিদের কথায় অনুভব করলাম—তোমাদের কারও কারও কাছে আমার প্রতি শ্রদ্ধাটা নেহায়েতই একটা করুণা।

www.pathagar.com

সব শেষে ইন্টারভিউ শেষ করে স্থির করলাম—টাকার প্রয়োজনটা মিটিয়ে আজই আমাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে।

যুবায়ের : আমি যে এখন এক গোলকধাঁধায় আটকে গেছি খালাম্মা! তবু অনুরোধ- আমাকে শুধু বলুন, পত্রিকা থেকে পাওয়া টাকা কি প্রয়োজন মেটাবে আপনার?

খালাম্মা : বলব। কিন্তু তার আগে আপার আর তোমার-আমার মধ্যে এতদিনকার সুসম্পর্ক আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার দাবীতে আমি তোমাকে একটা সহজসাধ্য কাজ করার অনুরোধ জানাব। তোমাকে সে-অনুরোধ রক্ষা করতে হবে।

যুবায়ের : সে-অনুরোধ যদি সত্যিই সহজসাধ্য হয় তাহলে কথা দিলাম--আপনার অনুরোধ রাখব খালাম্মা।

খালাম্মা : প্রয়োজনটাও যেমন দেখা দিল হঠাৎ, তেমনি টাকা পাওয়ার চান্সটাও এসে গেল হঠাৎ করেই। টাকাটা আমি নিয়েছি তোমার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্যে, তার অতি-প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে নেয়ার জন্য। এই সে টাকার বান্ডেল।

(টাকার বান্ডেলটা যুবায়েরের সামনে বাড়িয়ে ধরে। যুবায়ের অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে থাকে)

চরিত্রহীনারও মাতৃত্বের সাধ থাকে যুবায়ের। সে-ও দুনিয়াতে রেখে যেতে চায় কোন সন্তান যার কল্যাণ হয় তার অন্যতম কাম্য। আমার সন্তান যুবায়ের এ টাকা নিতে আর কুণ্ঠিত হতে পারে না!

যুবায়ের : (দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে) কিন্তু খালাম্মা ---

খালাম্মা : তোমার গবেষণার কাজটা যে কত মহৎ—তোমার আম্মুর মত বরাবর আমিও তা ভেবে এসেছি। বিশ্বাস করে এসেছি, এ কাজে তুমি সফল হবে। সাধারণের কল্যাণে আসবে তোমার আবিষ্কার। নিরাময় হবে কত রোগী! ভাইকে অপমান থেকে বাঁচাতে তুমি সে-কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখতে যাচ্ছ। কিন্তু এখন .... টাকাটা নাও যুবায়ের। তোমার খালাম্মার অর্থহীন নিষ্ফল এ জীবন কিছুটা সার্থকতার পরশ পাক।

(টাকার বান্ডেলটা হাতে নেয় যুবায়ের)

www.pathagar.com

যুবায়ের : আম্মু আর আপনার আশা যেন পূর্ণ হয় খালাম্মা! এ টাকা নিতে আমার যে কি ভয়ঙ্কর এক দ্বিধা! তবু আমি নিলাম! কিন্তু আপনি কিছুতেই এ বাড়ী থেকে চলে যেতে পারবেন না! যে কোন অবস্থাতেই নয়।

খালাম্মা : আমাকে যে যেতেই হবে বাবা! এ পরিবারের জন্য এখানে আমার অবস্থান আর মঙ্গলজনক হবে না।

যুবায়ের : কোথায় আপনি যাবেন?

খালাম্মা : এমন একটা আশ্রয় আমাকে খুঁজে নিতে হবে, যেখানে আর কেউ আমাকে জানবে না।

যুবায়ের : আমি ফুফুদের বাড়ী থেকে আম্মুকে আনতে যাচ্ছি। আসতে দেরী হবে না।

(চলে যায় যুবায়ের। খালাম্মাও ভেতরে যায়। রুমের এক জায়গায় আবার দেখা দেয় শাহ্‌রিয়ার ও মিলি। নীরবে পরস্পরকে প্রশ্ন করে– কি ব্যাপার! একটা বড় ব্যাগ নিয়ে খালাম্মা ফিরে আসে। তৎক্ষণাৎ কেটে পড়ে শাহ্‌রিয়ার ও মিলি। খালাম্মা ব্যাগটা খুলে আরও দু'য়েকটা জিনিস তাতে ভরে নেয়। দরজায় বেল বাজে। দরজার কাছে যায় খালাম্মা। দরজা খুলতেই একজন বিধ্বস্ত চেহারার প্রৌঢ় লোক রুমে ঢুকে পড়ে)

খালাম্মা : আপনি .... আপনি কে?

প্রৌঢ় : বলছি, আমার নাম বলছি। আপনিই তো রোকসানা বেগম?

(খালাম্মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ের দিকে তাকায়)

খালাম্মা : তোমার নাম আসাদুর রহমান? আসাদ?

আসাদ : চিনতে পারছ তাহলে মিসেস রোকসানা? কিংবা মিস লিলি হান্‌যা? এখনকার নামটা আজও সংগ্রহ করতে পারিনি মহামানী খালাম্মা! এত সবের পরেও চিনতে পারছ দীর্ঘদিন ভুলে যাওয়া তোমার স্বামী আসাদকে? জিজ্ঞাসা করবে না– এতদিন কোথায় ছিলাম? কেমন ছিলাম?

খালাম্মা : খুনের সঙ্গে জড়িত এক পলাতক আসামী কোথায় কিভাবে এতদিন কাটিয়েছে, তা জানার কোন আগ্রহ আমার নেই।

আসাদ : ভয়ও কি নেই? খুনের সঙ্গে জড়িত পলাতক আসামী খুন করার যন্ত্রপাতি ছাড়া কখনো থাকে না!

খালাম্মা : তুমি আমাকে চিনতে সত্যিই ভুল করছ। তাই এবার আসতে পার।

আসাদ : আজ পর্যন্তও তুমি একটা নির্লজ্জ হোর মাত্র। ইংরেজি শব্দ

www.pathagar.com

হোরের অর্থটা বোধ হয় জান—ডব্লিও এইচ ও আর ই-Whore! সব পরিচয় গোপন করে তুমি আজ এত ভন্ড এক সাহসিনী যে, কোন এক রোকসানার জীবন-কাহিনী টাকার বদলে বিনোদন পত্রিকায় বিক্রি করতেও কুণ্ঠিতা হওনি!

খালাম্মা ঃ টাকার খুব প্রয়োজন ছিল আমার।

আসাদ ঃ এতদিনেও কোন পরিবর্তন তোমার হয়নি দেখছি। সর্বদাই তোমার খুব প্রয়োজন ছিল টাকার। আর তা পেতে গিয়ে দেহ-মন-যৌবন-সম্মান কোনকিছুই বিলিয়ে দিতে তোমার কোন অনীহা নেই!

(তখনই আসে শাহ্‌রিয়ার ও মিলি)

শাহ্‌রিয়ার ঃ তুমি কে? এখানে কি চাও?

আসাদ ঃ অনেক দিনের পাতানো সম্পর্কে আমি আপনাদের খালুজান! এই রোকসানা বেগম আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

মিলি ঃ গাঁজা খেয়ে এখানে আসনি তো?

খালাম্মা ঃ ওর কথা বিশ্বাস করো না বউ মা! ও একটা প্রতারক, খুনের সঙ্গে জড়িত এক পলাতক আসামী।

(অট্টহাস্য করে ওঠে আসাদ)

আসাদ ঃ প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের উঠতি বড়লোক আলহাজ্ব শওকত হোসেন খান। তাঁর দুই কন্যা- বড়টি ফরযানা, ছোটটি রোকসানা। দু'জনের চেহারা হুবহু এক। কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে ফরযানার সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রেম। কিন্তু ঢাকায় এসে ওদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা হয় রোকসানার সঙ্গে। আমার চোখে নামে মোহের ঘোর। তারপর গোপনে আমার আর রোকসানার পলায়ন। চলে যাই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে। আমাদের বিয়ে হয়। কিন্তু .... তার পরের কাহিনী আপনারা পত্রিকায় নিশ্চয় পড়েছেন। বহুদিন পর এই রোকসানার খোঁজ পেয়ে আমি তার কাছে এসেছি বোঝাপড়া করতে। আপনারা আমাদের নির্জনে কথা বলতে দিন। স্মরণ রাখবেন- আমি নিরস্ত্র নই! কিন্তু আমার কাজে বাধা না দিলে আমি কারও কোন ক্ষতি করব না।

(চলে যায় শাহ্‌রিয়ার ও মিলি)

খালাম্মা ঃ তোমাকে আবারও বলছি- যথেষ্ট হয়েছে, এবার তুমি আসতে পার।

www.pathagar.com

আসাদ ঃ নাটকীয়ভাবে তোমাদের কর্মকাণ্ডের দৃশ্যপটে উদয় হয়ে এমনিতে চলে যাব বলে তো আমি আসিনি।

খালাম্মা ঃ তাহলে কেন এসেছ?

আসাদ ঃ কিছু কথা বলে আমার জীবনের শেষ কর্তব্যটা পালন করতে। শোন রোকসানা বেগম, তুমি এখন বুড়িয়ে গেছ। তোমার একটা ভুল এখন ভেঙে যাওয়া উচিত। সেই প্রথম পরিচয় থেকে তোমার প্রতি আমার অস্বাভাবিক আকর্ষণের পেছনে যা ছিল তা প্রেম নয়, লালসা। রঙ্গময়ী এক লোভনীয় নারীকে একান্ত করে পাওয়ার একটা উদগ্র কামনা। তোমার বড় বোন ফরযানাই ছিল তোমাদের পরিবারে একমাত্র নারী যাকে আমি ভালবাসতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু তোমার রূপ-যৌবন তার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছিল যে ছিল একটা বিপথগামী পরিবারে ততটুকু মহীয়সী যতটুকু ঘৃণ্য নারকীয় ছিলে তুমি রোকসানা, তুমি!

(খালাম্মার নীরব মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে)

এমনি অবস্থায় আমার অকপট স্বীকৃতি শুনে তোমার ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে? কত যে ধূর্ত চালাক তুমি, তা ভেবে খুব আনন্দ পাও? আনন্দ পাবার কিছু নেই। কারণ, যার জীবনটাকে সর্বরকমে ধ্বংস করে দিয়েছ তুমি, মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় ধরে সে এখানে এসেছে তোমার ওষ্ঠের ওই হাস্য-রেখা চিরতরে বিলীন করে দিতে।

(খালাম্মার গলা টিপে ধরতে চরম হিংস্রতায় এগিয়ে আসতে থাকে আসাদ। আর ঠিক তখনই পিস্তল বাগিয়ে বাইরের দরজার আড়াল থেকে এগিয়ে আসতে থাকে মাসুদ খান)

মাসুদ ঃ অতটা ডিটেকটিভ নাটকের সময় এখনও আসেনি মিস্টার আসাদ!

(উদ্দেশ্য বদলে স্থির হয়ে দাঁড়ায় আসাদ)

খালাম্মা ঃ এখনও তুমি আমাকে চিনতে পারনি আসাদ? অগ্নিময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে রোকসানা মরে গেছে কবে! কিন্তু আজও গোপনে এখানে বেঁচে রয়েছি আমি, রোকসানারই বড় বোন ফরযানা।

(হতাশভাবে মাথা নত করে আসাদ। তখনই রুমে এসে নীরবে দাঁড়ায় যুবায়ের, শাহ্‌রিয়ার ও মিলি)

www.pathagar.com

কিন্তু তুমি কে যুবক?

মাসুদ : আপনাদের দু'বোনের নাটক আপনারা শেষ করলেন। উল্লেখই করলেন না তাদের কথা যাদের জীবনের হাহাকারে ভরা ছিল সেদিনের আকাশ বাতাস!

খালাম্মা : তুমি কি আমাদের ভাই জাহিদ হোসেনের কথা বলছ?

মাসুদ : বলছি সেই চরম নাটুকে চরিত্র জাহিদ হোসেনের কথা। বলছি বিচিত্র রুচিহীন আপনাদের আব্বার কথা, বলছি সেই সর্বহারা হাসান মাষ্টারের কথা, আর বলছি হাসান মাষ্টারের কন্যা হতভাগিনী মঞ্জুর কথা!

খালাম্মা : মঞ্জুকে তো বিয়ে করেছিল আমাদের জাহিদ! তুমি কি আমাদের ....

মাসুদ : আমার আব্বা জাহিদ হোসেন খান প্রাণ দিয়েছেন একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে। আমার নানা বৃদ্ধ হাসান মাষ্টার এখন পত্রিকার হকার। আমার মা মঞ্জু বলে যাঁকে আপনি জানেন, অবসর সময়ে ঘরে বসে তিনি কাগজের ঠোঙা বানান। গ্র্যাজুয়েট হয়ে আমি ওই বিনোদন পত্রিকায় পার্ট টাইম করি। উচ্চ সমাজের অনেকেই আমাকে মস্তান বলেও জানে এবং মানেও। আমার লোকজন আছে। আজকেই হঠাৎ আপনার জন্য পরিকল্পিত ইন্টারভিউ সম্পর্কে জানতে পেরে সকাল থেকে এ বাড়ীর প্রতি লক্ষ্য রাখছি। আর রিপোর্টারের এ্যাসিসটেন্ট হয়ে এখানে এসেছি নাটকের গতিধারা অনুধাবন করতে।

(যুবায়েরদেরকে উদ্দেশ করে)

আসাদ সাহেবের জন্য পুলিশ ডাকার প্রয়োজন নেই। বাইরে আমার লোকজন রয়েছে। তারাই তার ব্যবস্থা করবে। মারবে না, বিচারে যা সাব্যস্ত হয়, তা-ই করবে। আমি ফরযানা নামের মহীয়সী এই নারীকে নিয়ে যাচ্ছি আমার ঠিকানায়, নতুন নাটকের মহড়া স্থলে।

(মাসুদ হাততালি দেয়। কয়েকজন মস্তান ধরণের তরুণ ড্রইংরুমে ঢুকে দরজার কাছে এ্যাটেনশ্যন অবস্থায় দাঁড়ায়)

আমার সেই ফুফু-আম্মা। আমার ঠিকানায় যাবেন।

www.pathagar.com

খালাম্মা : এ কি, এখানকার পরিস্থিতি যে ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে! এই তরুণেরা কারা? ওরা এখানে কেন?

মাসুদ : যাদের সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন, উত্তর তারাই দেবে। একটু ভিন্ন ধরণের মস্তান বলেই সমাজে ওদের সাধারণ পরিচয়। এবং ওরা আমাকে ওদের হিতৈষী বলেই জানে। প্রশ্নের উত্তর দাও বন্ধুরা!

১ম জন : আমরা সবাই জন্মসূত্রে ভদ্র সন্তান, এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত সুজন বলেই পরিচিত ছিলাম।

২য় জন : কিন্তু বেকারত্ব আমাদের এমন সব কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করছে যার জন্য সমাজ থেকে আমরা লাভ করেছি 'মস্তান' খেতাব। ঠিক তাদেরই মত একই খেতাব যারা প্রকৃতই শয়তান মস্তান। অথচ আমরা অপরাধ করি না, সাধ্যমত অপরাধীর বিচার করি।

৩য় জন : আমাদের সংখ্যা দেশে ক্রমেই বাড়ছে। ধারণা করছি, দু'হাজার সাল নাগাদ আমরাই দেশে তরুণদের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রুপে পরিণত হব। কিন্তু শয়তানদের দলে ভিড়বে ক'জন, জানি না।

খালাম্মা : কিন্তু তোমরা এ সময়ে এখানে কেন?

১ম জন : বর্তমানে আমরা 'প্রচ্ছদপট' নাটকের হাসান মাষ্টার আর মঞ্জু খালার কেসটা হাতে নিয়েছি।

২য় জন : আমাদের বিচার সভায় বিচার হবে তাদের যারা নিরাপরাধ সরল হাসান মাষ্টার আর মঞ্জু খালার সর্বনাশের জন্য দায়ী।

৩য় জন : হঠাৎ করেই ঘৃণ্য চরিত্রের ওই আসাদ সাহেবটিকে এ বাড়ীর চারদিকে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরাফেরা করতে দেখে আমরাও সচেতন হয়ে গেলাম। আর হঠাৎ করেই ধরা দিলেন তিনি অতি সহজেই!

খালাম্মা : তোমরা কি এ বাড়ীর মান-সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নও?

(এবার সবাই একসঙ্গে অতি-পরিষ্কার দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেয়)

সবাই : সকল মানুষের প্রতিই আমরা শ্রদ্ধাশীল। শত্রু আমরা তাদের, যারা মানুষের শত্রু, দেশের শত্রু। আর তারাই শুধু আমাদের বিচার-সভার আসামী। আপনার পিতাও আজ বেঁচে থাকলে হাসান মাষ্টারকে সর্বস্বান্ত করার অপরাধে তাকে আসামীর

www.pathagar.com

কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত।

খালাম্মা : আসাদ সাহেবের বিচার তোমরা করবে বলছ। কিন্তু রোকসানার বিচার? সে তো আজ বেঁচে নেই! আমার বিচার? আমাদের ভাই জাহিদ হোসেনের বিচার?

সবাই : জাহিদ হোসেন খান নিজের বিচার এমন ভাবে নিজেই করেছেন, কোন দেশের ইতিহাসে যার তুলনা হয় না।

খালাম্মা : কিন্তু আমি? আমিও তো শওকত খানের কন্যা! খান পরিবারের প্রতিনিধি!

সবাই : না, আপনি আমাদের কাছে জাহিদ হোসেন খানের সেই অবহেলিতা মায়ের প্রতিনিধি, যে মা-কে আমরা সম্মানের আসনে বসাতে চাই। এতদিন ধরে মাসুদ সাহেব তো আপনাকেই খুঁজছিলেন! আমাদের মঞ্জু খালা বড় একা, বড় নীরব! হঠাৎ করেই আজ আপনাকে পেয়ে গেলাম। আসুন আমাদের সঙ্গে, এক নতুন ঠিকানায়।

(ফরযানার ব্যাগটা হাতে নিয়ে সবিনয়ে ফরযানাকে বাইরে বেরুতে ইঙ্গিত করে মাসুদ খান। 'মস্তান' তরুণেরা সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যাগ এবং খালাম্মার অন্যান্য জিনিস (কিছু থাকলে) নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। খালাম্মার কাছে আসে যুবায়ের)

যুবায়ের : অভিমানে আম্মু আসতে চাইলেন না এখন। কিন্তু আম্মু বলে দিয়েছেন—তিনি আপনার বড় বোন হয়েই থাকলেন! যাবার সময় আমিও জানিয়ে দিচ্ছি খালাম্মা—আপনার দান সগৌরবে আমি মাথা পেতে নিলাম।

(খালাম্মাকে কদমবুসি করে যুবায়ের। হাসিমুখে আশীষ জানায় খালাম্মা। এবং হাসিমুখেই বেরিয়ে যেতে থাকে মাসুদদের সঙ্গে)

www.pathagar.com

আসামী

চরিত্র-লিপি

রফিক
নাজমা
মীর সাহেব
পাগলাটে লোক
মরিয়ম
সানাউল্লা
মোহ্‌সিন খান
রাবেয়া
বরকত
দ্বারওয়ান
দোকানী
ও
বুলু

www.pathagar.com

(ঢাকা জেল-গেটের সামনে নানারকম স্বাভাবিক শব্দ, লোকজনের কল-গুঞ্জন)

পাগলাটে লোক : এই যে বাপজান-ভাইজানরা, আপনাগো আপন জন জেলখানা থনে মুক্তি পাইল, গলায় কত ফুলের মালা- সকলের মনে আনন্দের সীমা নাই। আল্লায় আপনাগো আনন্দ বজায় রাখব — এই ফকীররে কিছু দিয়া যান। বড় গরীব, আপনাগো দশজনের দয়ার উপ্রে দিনপাত চালাই। কিছু দিয়া যান বাবারা!

(রিকশার ঘন্টা বাজে)

কেউ দেহি ফিইর‍্যাও তাকায় না! — এই যে সায়েব, আপনেও জেলখানা থনে মুক্তি পাইলেন মনে অয়? কিন্তু কেউ ফুলের মালা দিয়া সম্মান জানাইল না- ব্যাপারডা কি? কেউ তো নিতেও আইল না দেহি! তাই বুঝি মুখখান অত আন্ধাইর?

রফিক : রাস্তা ছাড়েন।

পাঃ লোক : রাস্তা তো ছাড়াই আছে! আমিও আপনের লগে লগে একটু আগ্গুয়াই। বুঝলেন- এই হইল দুনিয়া। একই জেলখানা থনে বাইরইয়া কেউর গলায় ফুলের মালা, কেউর মুখ আন্ধাইর কালা! অথচ আপনেও একজন ভদ্র মানুষ — হে হে — আমি একটা পাগলা ফকীর। সময়ে পাগল, সময়ে ফকীর।

(মোটরের হর্ণ বাজে)

সংসারে মন খারাপ কইরেন না সা'ব। নিজের কে কে আছে?

রফিক : স্ত্রী, ছোট ছেলে, ভাই-বোন। মেয়াদ পূরণের আগেই মুক্তি পেয়ে গেলাম। তাই —

পাঃ লোক : বাড়ীতে চিডি লেখার সময় পান নাই? তাইলে আর কি! কয় বচ্ছর খাটলেন?

রফিক : চার বছর।

পাঃ লোক : নির্চয়ই কইবেন- বিনা দোষে। মনে অয় লেখাপড়া জানা লোক- চাকরী বাকরী করতেন নাকি?

রফিক : হ্যাঁ, একটা ফার্মে — খুব বড় কিছু না।

পাঃ লোক : গোলমাল ঘটানির লাইগ্যা আমাগো দেশে খুব বড় চাকরীর দরকার অয় না। যাউক গা'। আল্লা'র নাম লইয়া ঘরে ফিইয়া

www.pathagar.com

যান। ইস্ত্রির ছাওয়াল কি অবস্থায় আছে, গিয়া খবর ল'ন। হক মুর্শেদ, হক।

রফিক : (আপন মনে নিম্নকণ্ঠে) স্ত্রী–ছাওয়াল কি অবস্থায় আছে — নাজমা, বুলু —

(কলতলায় বাসন মাজার শব্দ। দূর থেকে মীর সাহেব বলেন—)

মীর সাহেব : (দূর থেকে) মা নাজমা!

নাজমা : জ্বি আব্বা?

মীর সাহেব : (দূর থেকে) বুলু কোথায়?

নাজমা : বুলু তো কলতলায় আমার বাসন মাজা দেখছে।

মীর সাহেব : একটু তাড়াতাড়ি কর মা, নাশতার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

নাজমা : এক্ষুণি আসছি আব্বা। বুলু, দুষ্টুমী করে টেপের পানি ছিটাও কেন? মুখ ধুয়ে নানার কাছে যাও। নাশ্‌তা খাবে।

বুলু : নানার বাসায় থাকতে ভাল লাগে না আম্মা! আমাদের নিজের বাসায় যাও না কেন?

নাজমা : কথা বলে না বুলু। মুখ ধোও।

বুলু : আচ্ছা আম্মু, এতদিন হয়ে গেল– আব্বা আসেন না কেন?

নাজমা : চুপ কর বুলু। এত কথা আমার ভাল লাগে না।

(হাতের বাসন–কোসন পড়ে যাওয়ার শব্দ)

(রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে রফিক ও পাগলাটে লোকটি)

পাঃ লোক : কি ভাবতাছেন খাড়ইয়া খাড়ইয়া? ঘর–সংসারের কথা?

রফিক : এ্যাঁ! না — মানে —

পাঃ লোক : আমার কথায় কিছু মনে কইরেন না। আপনের ঘর–সংসারের কিছু বেতালা আছে বইল্যা আমার মনে অইতাছে। বুঝলেন, ওই ছিরিঘরে মানে জেলখানায় আমারও যাওয়া–আসা আছে। ওইখানে গেলে বাড়ীঘর, ইস্ত্রি–পরিবারের কি অয়, জানা আছে। (রাগ ও পরিহাস মিশিয়ে) বাড়ীঘর, বাসা — বা — সা — বুঝলেন, বাসা। বুঝি, আপনের বাসায় সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না, সন্দে অইতাছে। হক মুর্শেদ, হক। বেতালা অইলেও, বুঝলেন– কেরমে কেরমে সহ্যও অইয়া যাইব।

রফিক : কিন্তু এখন আপনার কথাগুলো ঠিক —

www.pathagar.com

পাঃ লোক : সহ্য অইতাছে না। ঠিক আছে, আপনের পথে আপনে চলেন। আমি চলি আমার পথে।

রফিক : হ্যাঁ, তা-ই ভাল। চলি। (চলে যায়)

পাঃ লোক : চাইর বচ্ছর তুমি জেলে। ঘর তো নির্চয়ই ভাঙছে। ঘরনীর নতুন ঘরও বান্ধা অইছে কি না কে জানে। হক মুর্শেদ, হক। দেন বাবারা, এই গরীবরে কিছু দিয়া যান।

(রাস্তার চলমান লোকজনের সামনে হাত পাতে)

(রাস্তায় একটা সেলুনের সম্মুখ। নানা রকম শব্দ)

সানাউল্লা : এই যে রাইটার সায়েব!

রফিক : কে?

সানাউল্লা : আমি সানাউল্লা। আপনে রফিক সায়েব না? আপনাগো লগে জেল খানায় কয়েদী আছিলাম তো! আপনে আছিলেন আমাগো রাইটার। অশিক্ষিত কয়েদী গো চিডিপত্র, নালিশ, দরখাস্ত- এইসব লেখাই আছিল আপনের কাজ। মনে পড়ে না আমারে?

রফিক : এখন মনে পড়েছে।

সানাউল্লা : ছাড়া পাইয়া বাড়ীঘরে ফিরতাছেন। তাই সেলুনে গিয়া চুলদাড়ি কাটাইবেন। যান, কাটান গিয়া।

রফিক : আপনি তো বেশ কয় মাস আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন। এখন কি করছেন?

সানাউল্লা : হেই আগের কাজ। মানে ভিড়ের মধ্যে দুই আঙ্গুলের কাজ।

রফিক : কিন্তু আবার ধরা পড়লে তো –

সানাউল্লা : যামু, ওইখানে আবার যামু। দুইন্যাইডা আগের মতই চলতাছে, ওইখানে আমাগো যাওয়া-আসাও আগের মতই চলব। যান, সেলুনে গিয়া বসেন। চিনা লোকের সঙ্গে দেখা অইয়া গেল, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এইখানে আইতাছি। হ্যাঁ, অখন তো আপনের মনে শুধু হেই ঘর-সংসারের কথা!

ফ্ল্যাশ ব্যাক

(রফিকের বাসায় রফিক কথা বলছে নাজমার সঙ্গে)

নাজমা : আশেপাশের গিন্নীরা সবাই বলছে –

www.pathagar.com

রফিক : কি বলছে নাজমা বেগম?

নাজমা : যাও, জানে না যেমন!

রফিক : এই রফিক সাহেব জানে তো তার নাজমার কথাই! কিন্তু আশেপাশের গিন্নীরা যা বলছে —

নাজমা : তা-ও তুমি জান। তবু আমার মুখ থেকে শুনতে চাইছ। একথা তো এখন সবাই জানে- তোমার সঙ্গে বিয়েতে আব্বার তেমন মত ছিল না।

রফিক : প্রাইভেট ফার্মের এক সামান্য ওয়ার্ক সরকারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তোমার মীর সাহেব আব্বার মত মানী লোক কি করে রাজী হন বল?

নাজমা : তবু তো বিয়ে হল!

রফিক : হল, কারণ মীর সাহেবদের অমত তাদের মেয়ের জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত টিকল না।

নাজমা : তাই সবাই বলছে- তুমি আমাকে জয় করে এনেছ।

রফিক : হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে প্রেমের জয় হয়েই যায়। কিন্তু এখন সেই প্রেমকে বাঁচাতে চাই যে অনেক টাকা!

নাজমা : তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। যে রোজগার তুমি করছ, তাতেই আমাদের সংসার চলছে আর চলবেও। তোমার বোনের বিয়েতে আমার গয়নাগাটি আমি স্বেচ্ছায়ই খুলে দিয়েছি। ভাল পাত্রে রাবুর বিয়ে হয়েছে। আমার কোলে এসেছে বুলু। অভাব তো আমার নেই!

রফিক : হঠাৎ এসব কথা কেন নাজমা?

নাজমা : কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, অনেক টাকার চিন্তা তোমাকে যেন পেয়ে বসেছে।

রফিক : তোমার হাত, তোমার গলা, কান- সবই যে খালি নাজমা!

নাজমা : এখন খালি, কিন্তু সময়ে —

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

রফিক : তুমি রান্নাঘরে যাও। কেউ এসেছে, আমি দেখি।

(দরজা খোলার শব্দ। নাজমা চলে যায়, আসে মোহ্‌সিন সাহেব)

একি, মোহ্‌সিন সাহেব যে!

www.pathagar.com

মোহ্সিন ঃ বেশিক্ষণ বসব না (নিম্নকণ্ঠে) ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে যে সব কথাবার্তা ফাইন্যাল হয়ে গেছে, তা ঠিক আছে তো?

রফিক ঃ (নিম্নকণ্ঠে) আছে। কিন্তু এত বিপজ্জনক কাজ — কখন না ফেঁসে যাই।

মোহ্সিন ঃ (নিম্নকণ্ঠে) এত ভয় পাচ্ছেন কেন? নো রিস্ক্, নো গেইন।

রফিক ঃ (নিম্নকণ্ঠে) তাছাড়া আপনি যেখানে পেতে যাচ্ছেন পাঁচ লাখ, সেখানে আমি মাত্র পাঁচ হাজার —

মোহ্সিন ঃ (নিম্নকণ্ঠে) আহা, কাজটা আগে হয়ে যাক। আপনার পাওনা সম্পর্কে দেখব তখন। আমি কথা দিচ্ছি। (রফিক নীরব) তাহলে রিপোর্টটা কালকেই —

(বাইরের রাস্তায় একটা চলন্ত গাড়ীতে ব্রেক কসায় গাড়ী থেমে যাওয়ার শব্দ। মানুষের কোলাহল, এ্যাকসিডেন্ট)

(বাইরের কোলাহল হঠাৎই থেমে যায়। সম্পূর্ণ নীরবতা। এই নীরবতার মধ্যে মীর সাহেবের ধীর কণ্ঠে চরম নৈরাশ্য ধরা পড়ে)

মীর সাহেব ঃ এই অবস্থায় সমাজে আমি মুখ দেখাব কি করে নাজমা? আমাদের জামাই রফিক শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির দায়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল!

নাজমা ঃ আমি — আমি এর কি উত্তর দেব আব্বা?

মীর সাহেব ঃ কয়েক বছরের জেল তার অবধারিত।

নাজমা ঃ চারদিক থেকে শুধু শুনতে পাচ্ছি ছিঃ ছিঃ আর ছিঃ ছিঃ —

(কান্নায় ভেঙে পড়ে নাজমা)

(সেলুনের সামনে রাস্তার শব্দ).

সানাউল্লা ঃ আসেন রফিক সায়েব। কথা কইতে কইতে আগাই।

রফিক ঃ চলুন।

(রাস্তায় নানা রকম শব্দ। তার মাঝেই ওরা কথা বলে চলছে)

সানাউল্লা ঃ জেলে একদিন আমার একখান চিডি লেখতে লেখতে আপনের সব ঘটনা আমারে খুইল্যা কইছিলেন রাইটার সায়েব।

রফিক ঃ সেসব কথা এখনো মনে আছে?

www.pathagar.com

সানাউল্লা ঃ আছে। জেলে তো আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু অপরাধ কইরাই ঢুকি। একজনের লগে আরেক জনের জানাজানি অয়। অইলেও অনেকের কথাই মনে থাকে না। কিন্তু দু'য়েক জনের কথা মনে গাইথ্যা থাকে।

রফিক ঃ আমি কি সেই দু'য়েক জনের একজন?

সানাউল্লা ঃ আপনে অপরাধ কইরাই জেলে ঢুকছিলেন। কিন্তু আপনেরে অনুতাপ করতে দেইখ্যা মনে অইছিল- অপরাধী হিসাবে আপনে নেহায়েতই কাঁচা। এর লাইগ্যাই বোধ অয় আপনের কথা মনে গাইথ্যা রইছে। অখন কই যাইবেন? বাসায়?

রফিক ঃ বাসা তো নাই।

সানাউল্লা ঃ আপনের ইস্ত্রি —

রফিক ঃ জেলে চার বছরে একদিন এসেছিল। একা। বাসা ছেড়ে বাপের কাছে যাওয়ার আগে। তার অল্প কয়েকটা কথা থেকে বুঝলাম- আমার কলঙ্কে কালো হয়ে গেছে সকল আত্মীয়-স্বজনের মুখ।

সানাউল্লা ঃ তার পরে চিঠিপত্র আসে নাই?

রফিক ঃ খুব কম। বাপ-মা তো আগেই মারা গেছেন। ভাইয়েরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। বোনটি আছে শ্বশুর বাড়ীতে। কিন্তু — মানে আমি তো আজ সবার কাছেই অপরাধী।

সানাউল্লা ঃ আপনেরে উপদেশ দিমু, অত সাহস আমার নাই। তয় যা-ই করতে চান, আপনের ইস্ত্রি-ছাওয়ালের খোঁজ আগে নিয়া —

রফিক ঃ (হঠাৎ দৃঢ় কণ্ঠে) না। ওদের খোঁজ করার আগে একবার মোহ্সিন খানের খবরটা নেব। পাঁচ হাজারের দুর্নীতিতে সব গেল আমার, পাঁচ লাখের কি হল তা দেখে আসি।

(দ্রুত পায় চলে যায় রফিক, চেয়ে থাকে সানাউল্লাহ্)

(রাস্তায় নানা রকম শব্দ। সেই শব্দ ক্রমে কমে আসে। তারপর শব্দ নেই বললেই চলে)

(একটা বড়লোকের বাসা থেকে ভেসে আসে বিদেশী মিউজিক, গেটে দ্বারওয়ান। রফিক এসে দাঁড়ায় তার সামনে)

দ্বারওয়ান ঃ কি চান?

www.pathagar.com

রফিক : এ বাড়ীর মালিক খান সাহেবের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। মানে মোহ্‌সিন খানের সঙ্গে। আমি তার নিজের লোক। অনেকদিন ঢাকায় ছিলাম না। তাই ঠিকানা সংগ্রহ করে এসেছি। চার বছরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে তো। তাই বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম।

দ্বারওয়ান : মারফতী লাইনে সব কথাবার্তা কইতাছেন দেখি। যাউক, নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়া এক কথায় এই 'খান এন্টারপ্রাইজ'। এর মালিকের এই বাড়ীখান দেইখ্যাই আচানক লাইগ্যা গেছেন, অফিস দেখলে তো ভিমরি খাইয়া যাইবেন।

রফিক : সত্যি, দেখতে দেখতে এত বড় হয়ে গেলেন খাঁ সাহেব। সব সময় খুব ব্যস্ত থাকেন বোধ হয়?

দ্বারওয়ান : দিনরাইত লোকজন, অফিস, সভাসমিতি- অবসরই নাই।

রফিক : সমাজ-সেবা করে খুবই সুনাম কুড়িয়েছেন নিশ্চয়?

দ্বারওয়ান : আরে, বুইঝাও বোঝেন না? আরও কাছে আয়েন। (নিম্নকণ্ঠে) চাইর-পাঁচ বচ্ছর আগের খবর জানি তো। রবারের চপ্পল পায় দিয়া ঘুরাফেরা করত। এর পরে তো ম্যাজিক! কইতাছেন- আপনে তার নিজের লোক। আর আমি? দূর সম্পর্কের আত্মীয়। উনি আত্মীয় ক'ন না, আমিও স্মরণ করাইয়া দেই না। দয়া কইরা এই বাসায় দ্বারওয়ানের চাকরী দিছেন- যথিষ্ট। কইছ্‌লাম মাইনা বাড়াইতে। উত্তর নাই।

(অদূরে গাড়ীর হর্ণ বাজে)

সরেন, আইতাছে।

(গাড়ী এসে থামে। দরজা খুলে আবার বন্ধ করা হয়)

মোহ্‌সিন : কে? ও, রফিক সাহেব যে! কবে কখন এলেন?

রফিক : আজই, একটু আগে। কিছু কথা ছিল।

মোহ্‌সিন : আসুন। দ্বারওয়ান, ড্রাইভারকে অপেক্ষো করতে বল।

(দ্বারওয়ান গেট বন্ধ করে- তারই শব্দ হয়। ওরা এগোয়। পরক্ষণেই প্রাসাদোপম ঘরের দরজা খোলার মিউজিক বাজে। ওরা রুমে ঢোকে)

রফিক : চমৎকার ড্রইং রুম!

মোহ্‌সিন : আজই ছাড়া পেলেন?

www.pathagar.com

রফিক : সকালে। কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে কিছুদিন আগেই ছাড়া পেয়ে গেলাম।

মোহ্সিন : এখনও বাসায় যান নি?

রফিক : আমাদের মত আসামীদের ভাড়া-করা বাসা চার বছর থাকে না।

মোহ্সিন : হুঁম্, আমিও মাঝেমধ্যেই ভেবেছি- আপনার এতবড় একটা মিস্হ্যাপ হয়ে গেল।

রফিক : জ্বি। কিন্তু আপনি তো আল্লা'র রহমতে ভালই আছেন বলতে হবে। ড্রইংরুমের দরজা খোলে মিউজিকের সঙ্গে —

মোহ্সিন : আপনার কথাগুলো অন্য রকম মনে হচ্ছে?

রফিক : আজকাল যা মনে আসে তা — মানে যা-তা বলে ফেলি। জীবনের পরীক্ষায় অসদুপায়ে পাশ করতে গিয়ে ধরা পড়ে ফেল্ করলাম। আপনি বেঁচে গিয়ে পাশ করলেন। একেবারে ফার্স্ট ডিভিশনে — হাঃ হাঃ —

মোহ্সিন : তবু কি ভবিষ্যতের কথা বলা যায়? চারদিকে এত সব কাজ, কখন কোথায় ভুল করে বসব। ধরাও হয়তো পড়তে হবে।

রফিক : ধরা পড়লেও শাস্তির বেলায় আপনি 'ডিভিশন'ই পাবেন। আর বেরিয়ে আসবার দিন আপনার গলায় পড়বে ফুলের মালা।

মোহ্সিন : (ব্যক্তিত্বপূর্ণ দৃঢ়কণ্ঠে) রফিক সাহেব! (মুহূর্তে কণ্ঠস্বর সংযত করে) মুখের কথা যেন খাঁচার পাখী! বলবার সময় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তা উড়ে গিয়ে কোথায় কি অনর্থ বাধায়— কিছু বলা যায় না।

রফিক : (যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে) জ্বি স্যার, এইমাত্র তা বুঝতে পারলাম। আরও বুঝতে পারলাম— পজিস্যন মানুষের ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে দেয়। তখন তাঁর কথাও হয়ে ওঠে বাণী! ছাড়া পেয়ে আপনাকে দেখতে এসেছিলাম, দেখে গেলাম। অনেক দিনের পরিচিত বলে কিছু কথাও বলে ফেললাম। মাফ করে দেবেন। এবার আসি।

মোহ্সিন : একটা অনুরোধ— এসব কথা, মানে আপনার ওই কাজটার সঙ্গে আমার ইন্ভল্ভ্মেন্টের কথাটা কখনো কারও কাছে বলবেন না। আপনার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। আপনাদের খাওয়াপরার কথাটা আমি ভেবে দেখব। এগ্রিড্?

www.pathagar.com

রফিক ঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনার সেদিনকার প্রস্তাবে কেন যে আমি এগ্রিড্ হয়েছিলাম, তার অনুতাপ আমাকে তিলে তিলে দগ্ধে মারছে। আপনার কোন ভয় নেই স্যার। আমার জন্য যা হয়েছে বিষ, আপনার জন্য তা-ই হয়েছে অমৃত। বিষের জ্বালায় ছটফট করব আমরা, হযতো ধ্বংসই হবে পরিণাম। কিন্তু স্যার, আপনারা যে অমর! কোন ভয় নেই, এসব কথা — একি, মানিব্যাগ খুলছেন কেন স্যার?

মোহ্সিন ঃ এতদিন পর আপনজনদের কাছে যাবেন, বেশ কিছু খরচপাতি আছে তো।

রফিক ঃ সামান্য এক মানুষ, খরচপাতিও সামান্য। তা সঙ্গে আছে স্যার। আস্সালামু আলাইকুম।

(বেরিয়ে যায় রফিক। মোহসিন খান দাঁড়িয়ে প্রাগ করে)

(গাছ-গাছালিতে ভরা একটা নির্জন স্থানে পাখীর ডাক। একটা গাছের নীচে বসে আছে রফিক। আসে পাগলাটে লোকটি)

পাঃ লোক ঃ (উদাস কণ্ঠে) হক মুর্শেদ, হক। আরে, আপনে দেখি হেই জেল-ফেরত সায়েব। কি ব্যাপার? অখনতরি আপনে নিজের ঘর-দুয়ারে যান নাই?

রফিক ঃ যাব।

পাঃ লোক ঃ দিলে দাগা নিয়া পথে পথে ঘুরতাছেন মনে অয়? কিন্তু মাইন্ষে-ভরা পথ ছাইড়া এইসব গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়া — ইয়ে মানে আমি গাঞ্জা টানতে চাইছিলাম। ঘিন্না টিন্না না করলে কাছে আইসা বইতে পারেন। — (রফিক এসে কাছে বসে) বইলেন সায়েব? আসলে মানুষটা আপনে বড়।

রফিক ঃ কি করে জানলেন?

পাঃ লোক ঃ আমার মত মাইন্ষের পাশে আইয়া বইলেন! এতেই বোঝা যায়।

রফিক ঃ মানুষের কাছে হাত পেতেই তো আপনার কিছু রোজগার হয়। আপনি মানুষ-ভরা পথ ছেড়ে এই নির্জনে কেন?

(পাঃ লোকটা একটানা হাসতে থাকে। হাসির শেষ দিকটা কান্নার মত)

www.pathagar.com

পাঃ লোক : জেলে আপনে কি কাজ করতেন?

রফিক : রাইটারের কাজ।

পাঃ লোক : তাইলে তো আমাগো মত মাইন্‌ষের লগে চিনাজানা আছে। সকালেই তো কইছি একবার — ওই ছিরিঘরে আমারও যাওয়া-আসা আছে। কথাডা —

রফিক : আমার মনে আছে।

পাঃ লোক : জীবনী তো আমাগোও একটা আছে। আছে না?

রফিক : আমি নিশ্চয় করে জানি, আপনাদের মত লোক কয়েদী হয় যারা, তাদেরও আছে কত বিচিত্র জীবন-কাহিনী — দুঃখে মলিন, সুখে উজ্জ্বল, হিংস্রতায় ভয়াল, প্রেমে জ্যোতির্ময়।

পাঃ লোক : থাকে না, থাকে না। শেষতক এইসব কিছুই থাকে না। পরথম পরথম জেলখানায় ঢোকে যারা, রাইটার হইয়া তাগো কথাই আপনে জানছেন। তাতেই এইসব সুন্দর সুন্দর কথা কইতাছেন। কিন্তু ওইখানে থাকতে থাকতে যতই দিন যায়, ততই কেরমে কেরমে সহ্য হইয়া আসে আপনজন গো বিচ্ছেদ জ্বালা। কেরমে কেরমে ঝাপসা হইয়া আসে ঘর-সংসারের সব স্মৃতি।

রফিক : ঝাপসা হয়ে এলেও স্মৃতি কি একেবারেই মুছে যায়?

পাঃ লোক : এ্যাঁ! কি জিগাইলেন? একেবারেই মুইছা যায় কি না! হাঃ হাঃ হাঃ — (শান্ত কণ্ঠে) নদী মইরা যায়, শুকাইয়া যায়। এক সময় ঘাসে ঢাকা পইড়া যায় মরা নদীর বুক। কিন্তু ওই যে মরা নদীর বুকে নীচার মত থাইক্যা যায় একটু আধটু জায়গা- ওইটায় কিয়ে যেন তিরৃতির্ করে, বড় কষ্ট দেয়। (হঠাৎ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) হক মুর্শেদ, হক! (আবার করুণ কণ্ঠে) অনেক কথা মইরা গিয়াও কিছু কথা তিরৃতির্ করে এই বুকটায়—এই সব্বনাইশ্যা বুকটায়! (বুকে থাপড়াতে থাকে, উচ্চ কণ্ঠে বলে—) ইচ্ছা করে ভাইঙ্গা ফেলাই! শেষ কইরা দেই তার তিরৃতিরানি! (তারপর আত্মবিস্মৃতের মত) হুঁম্, কি যেন কইতাছিলেন?

রফিক : আপনাদের মত অপরাধী আসামীদের কথা।

পাঃ লোক : (আত্মবিস্মৃতভাবে) হপ্তায় মোলাকাতের দিন ভিড় জমে জেল-গেটের সামনে! ছিড়া ময়লা কাপ্‌ড়ে শরীল ঢাইক্যা ইস্ত্রী

www.pathagar.com

আইসা দাঁড়ায় লোহার গরাদ দেওয়া বেষ্টনীর বাইরে। আমি জেলখানার কয়েদী। আমার সামনেও খাড়ইয়া শুকনা মুখে কথা কয় আমার জোয়ান ইস্ত্রী মইরম! বিয়ার পরে পরে ডাকতাম মরিয়ম কইয়া!

ফ্ল্যাশ ব্যাক

(জেলখানায় বেষ্টনী)

মরিয়ম : টাকা পয়সা কিছুই হাতে নাই। আমি ক্যামনে সংসার চালামু, কও।

পাঃ লোক : (উদাস কণ্ঠে) যারা আমারে আইন্যা এই জেলে আটক রাখছে, তাগো কাছে গিয়া জিগা রে মইরম বিবি। তারাই উত্তর দিব।

মরিয়ম : কি যে কও তুমি! তারা কি কইব?

পাঃ লোক : তয় আমি এইখানে আটকা থাইক্যা কি কমু?

মরিয়ম : পাগলামী কইর‌্যা ঘর-সংসার সাজাইছ্লা তুমি। চুরি-চামারি কইর‌্যা জেলে আইসা ঢুকছও তুমিই। অখন উত্তর তারা দিব ক্যান?

পাঃ লোক : (তেমনি উদাস কণ্ঠে) অখন আমার মন ফইক্‌রালীর দিকে ঝুঁইক্যা পড়ছে।

মরিয়ম : তোমার বড় ছাওয়াল ইষ্টিশনে কুলিগিরি করে। এক পয়সাও দেয় না। সেয়ানা মাইয়াডার মতিগতি ভালা দেখতাছি না। আরও আছে দুই পোলা-মাইয়া। ওগো খাওনের যোগাড় করি ক্যামনে?

পাঃ লোক : জেলের মালিকের কাছে না জিগাস তো দুইন্যাইর মালিকের কাছে জিগা।

মরিয়ম : খুব তো ফইক্‌রালী ধরছ! ছোড ছাওয়ালডা মইরা গেছে একদিনের জ্বরে!

পাঃ লোক : (মুহূর্তে চমকে ওঠে) কি কইলে? ছোট পোলাডা মইরা গেছে?!

(মরিয়ম ডুকরে কেঁদে ওঠে)

যাউক। ভালাই আইছে। দিন দেখছে তার!

মরিয়ম : আমি কি করুম অখন?

www.pathagar.com

পাঃ লোক : আমি আর কি কমু? যাই, দেখা–সাক্ষাতের সময় ফুরাইয়া গেছে।

(রিকশার বেল বাজতে থাকে একটানা। — ফ্ল্যাশ আউট)

পাঃ লোক : (ব্যথাতুর কণ্ঠে) হক মুর্শেদ, হক। (ম্লান হাসি) মইরা গেছে। ওইডারেই আদর করতাম বেশি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ছাড়া পাইয়া বস্তীর ঘরে গেলাম। কেউ নাই বস্তীর হেই ঘরে। লোকজনের কাছে শুনলাম, সেয়ানা মাইয়াডা নিজের পথ চিনছে। আর মইরম — উপায়ান্তর না দেইখ্যা অন্যের লগে নিকা বইয়া নতুন সংসার সাজাইছে। কর্ম শেষ। আমি মুক্ত, ফি-রি। কি অইলো সায়েব? চুপ কইরা আছেন, আমার মত গাঞ্জাতেও অভ্যাস নাই — তয় চইল্যা যান!

রফিক : (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) তা–ই যাচ্ছি।

পাঃ লোক : হক মুর্শেদ, হক।

(গাঁজার কলকেয় টান দিয়ে কেশে ওঠে)

(জনবহুল রাস্তা। বাসস্ট্যান্ড। তারই কোলাহল)

সানাউল্লা : এই যে রফিক সায়েব, কি ব্যাপার? অখনো এই বাসস্ট্যান্ডে খাড়া। আপনজনদের কাছে যাওনের লাইগ্যা রওনা দেন নাই?

রফিক : বাসে উঠছিলাম। পথ–খরচা বাবত জেল–কর্তৃপক্ষ যা দিয়েছিল, পকেট কেটে তা নিয়ে গেছে।

সানাউল্লা : তাই নাকি? এই বাসস্ট্যান্ডেই তো?

রফিক : হ্যাঁ, ভিড় ঠেলে আমি উঠতে যাচ্ছিলাম।

সানাউল্লা : সায়েব, এইখানে একটু খাড়ন। আমি আইতাছি। না আইলে যাইয়েন না কিন্তু। এই দোকানটার বেঞ্চে একটু বসেন। দোকানী ভাই, একটু দেইখেন।

(দোকানে চায়ের কাপ–পিরিচের মৃদু শব্দ)

দোকানী : বসেন সায়েব। আমি বিকিকিনিতে ব্যস্ত। দেখি না দেখি, যাইয়েন না কিন্তু। (নিম্ন কণ্ঠে) সাংঘাতিক গুন্ডা খুনী ওই সানাউল্লা। বহুদিনের দাগী আসামী।

রফিক : ঠিক আছে, আপনি নিজের কাজে মন দেন।

(রাস্তার শব্দ দ্রুতপায় পথ চলছে পাগলাটে লোকটা)

www.pathagar.com

পাঃ লোক : (উত্তেজিতকণ্ঠে) মইরা গেছস? তোর মত পোলা মইরা গেলে আমার কিরে? মইরা যা, আরও মর্। মইরা সব সাফ অইয়া যা। আমার কি? তুই বেটা গুন্ডার বাচ্চা, দুই বছরের ছাওয়াল যখন, তোত্লাইয়া তোত্লাইয়া ডাকতো — বা'জান। (হঠাৎ বুক ফাটা আর্তনাদ) বাজান!! — মইরা যা। তাতে আমার কি? কেমন মায়ের ছাওয়াল তুই, জানস না? হায়রে বিবি মইরম জান। পীরিতের মানুষ আমার — হাঃ হা — পীরিত — (চীৎকার করে) মইরম জান!!!

(প্রচন্ড শব্দ করে একটা বাস চলে যায়, হর্ণ বাজে)

(বাসস্ট্যান্ডে আগের মতই শব্দ)

সানাউল্লা : এই যে সায়েব, দেখেন তো– এই মানিব্যাগডা আপনের?

রফিক : হ্যাঁ, এটাই তো আমার মানিব্যাগ। কি করে পেলেন?

সানাউল্লা : সব ট্যাকা আছে কিনা আগে দেখেন।

রফিক : (ব্যাগ খুলে দেখে) হ্যাঁ, সব টাকাই আছে!

সানাউল্লা : আমাগোরই এক ওয়ার্কার নিয়া গেছিল। আপনেরে তো চিনে না, মাফ কইরা দিয়েন। আমার দিকে তাকাইয়া আছেন ক্যান? আর দেরী কইরেন না সায়েব, নিজের পথ ধরেন।

রফিক : এমন একটা মন নিয়ে আপনি এসব কাজের সঙ্গে জড়িত থাকছেন কেন?

সানাউল্লা : রোজগারের তো আর কোন পথ নাই। মনডাও আর নাই। আসামীর ছাপ একবার যার গায়ে পড়ে, রোজগারের অনেক পথই তার বন্ধ অইয়া যায়। যাউক, আপনে সায়েব আপনজনগো কাছে গিয়া দাঁড়াইতে আর সঙ্কোচ কইরেন না। উল্‌টা–পাল্‌টা চিন্তা আপনের মনে তুফান তুলতাছে— বুঝি। তবু আপনে যান।

(রফিকের ভাবান্তর হয়। তার কানে ভেসে আসে নাজমার কথা–)

নাজমা : শেষ পর্যন্ত এই করলে তুমি। পাঁচ হাজার টাকা ঘুষের দায়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে? এই পোড়া মুখ আমরা কি করে দেখাব এখন!! ছিঃ ছিঃ ছিঃ —

(এর পরই রফিকের চোখে ভাসে পাগলাটে লোকটার গাঁজার কলকেয় টান দেওয়ার দৃশ্য; কানে ভেসে আসে মরিয়মের কথা–)

www.pathagar.com

মরিয়ম : পাগলামী কইরা ঘর–সংসার সাজাইছ্লা তুমি। চুরি–চামারি কইরা জেলে আইসা ঢুকছও তুমিই। অখন উত্তর তারা দিব ক্যান্?

(এবার ভেসে আসে পাঃ লোকটার কথা–)

পাঃ লোক : (ব্যথাতুর কণ্ঠে) হক মুর্শেদ, হক। (ম্লান হাসি) মইরা গেছে। ওইডারেই আদর করতাম বেশি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ছাড়া পাইয়া বস্তীর ঘরে গেলাম। কেউ নাই বস্তীর হেই ঘরে। লোকজনের কাছে শুনলাম, সেয়ানা মাইয়াডা নিজের পথ চিনছে। আর মইরম — উপায়ান্তর না দেইখ্যা অন্যের লগে নিকা বইয়া নতুন সংসার সাজাইছে। কর্ম শেষ। আমি মুক্ত, ফি — রি। কি অইলো সায়েব? চুপ কইরা আছেন, আমার মত গাঞ্জাতেও অভ্যাস নাই — তয় চইল্যা যান!

(সানাউল্লার কথায় রফিকের সম্বিত ফিরে)

সানাউল্লা : রফিক সায়েব, চুপ কইরা থাইকেন না। কথা কইলে মনের গুমোট ভাবটা কিছু কাটে।

রফিক : (ব্যগ্র কণ্ঠে) সানাউল্লা মিয়া, ওই যে পাগলাটে লোকটা — পাগলা ফকীর, ক্ষিপ্ত হয়ে হন হন করে এগিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। ওকে চেনেন?

সানাউল্লা : চিনি। আমাগো সমাজেরই লোক। আমরা কই পাগলা ফকীর। যখন–তখন ক্ষ্যাপামী করে, পাগলামী করে। লোকটা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি দুঃখী। রোজ তো এই–ই করে। ভিক্ষা–টিক্ষা কইরা যা পায়, তা–ই নিয়া ফিইরা যায় তার আগের বস্তীতে। ক্ষ্যাপার মত চলছে তো– একটু পরেই দেখা যাইব, ট্যাকাপয়সা যা পাইছে, তাই দিয়া বস্তীর এতিম আর রাস্তার পোলাপান লইয়া গোশতরুটি খাইতাছে! এর ছোড ছাওয়ালডারে খুবই আদর করত!

রফিক (হঠাৎ আবেগে) আমার একমাত্র ছেলের নাম বুলু!

(রফিকের মন চলে যায় কোন এক বাসগৃহে)

(মীর সাহেবের বাসায় কথা বলছেন মীর সাহেব ও নাজমা)

মীর সাহেব : বুলুর ভবিষ্যত ভাবতে গেলেই আমার চিন্তা–ভাবনা সব কিছু গুলিয়ে যায় রে নাজমা! সে যে এখনও ছোট! সামনে তার পুরা ভবিষ্যতটা পড়ে আছে। রফিকের ব্যাপারে আমার

www.pathagar.com

ছেলেরা ক্ষমাহীন। আমার দিনও ফুরিয়ে এসেছে। জেলের মেয়াদ শেষ হলে রফিক ফিরে আসবে। কিন্তু তোদের ঘর-সংসার আবার হবে কি না — তোর কাছ থেকে কিছুই আজও জানতে পারলাম না।

নাজমা : আপনি বুলুর ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন আব্বা!

মীর সাহেব : (কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে) হ্যাঁ, আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু তাতে যে তোর কথাও এসে যায়! আমার চোখের সামনে তোর ভাই-ভাবীরা তোকে অবহেলা আর অসম্মান করতে আরম্ভ করেছে। রফিককে বিয়ে করতে গিয়ে তুই সবাইকে অগ্রাহ্য করেছিলি। আজ তারা তার শোধ নিচ্ছে। রফিক আর তুই, তোদের যা হবার তা শুধু আল্লা'ই জানেন। কিন্তু এই মাসুম বাচ্চাটা?

নাজমা : এর কোন উত্তরই আমার জানা নেই আব্বা। জানি, আপনি যতদিন আছেন - ভাই-ভাবীরা অন্তত এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে না আমাকে। বুলুকে নিয়ে আমি এখানেই থাকতে পারব। কিন্তু আপনাদের জামাই ফিরে এলে কি হবে, অথবা তার আগেই আপনি বিদায় নিলে কি হবে, তার কিছুই আমার জানা নেই!

মীর সাহেব : (রাগে) জামাই, আমাদের জামাই! — যাক, একমাত্র আলেমুল গায়েবই জানেন- তোর আর বুলু সম্পর্কে সামান্য একটু আশা নিয়েও আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারব কি না! রফিক জেল থেকে ফিরে এসে কি করবে, বাঁচবার কোন্ পথ তার খোলা আছে, কিছুই তো জানি না।

(মীর সাহেবের মত নাজমার দৃষ্টিতেও শূন্যতা)

(রাস্তায় দাঁড়িয়ে সানাউল্লা রফিককে বলে –)

সানাউল্লা : শোনেন সায়েব, যে ব্যাপারডার কিছুই জানেন না, তা নিয়া বেহুদা মাথা ঘামাইতাছেন ক্যান? এই আপনের মত মাইন্ষেরা- নিজেগো যারা ভদ্দরলোক বইল্যা পোজ্পাজ্ করেন, অথচ বেআক্কলের মত কলঙ্কের কাম কইর‍্যা

www.pathagar.com

বসেন– তাগো নিয়াই মুস্কিল। অপরাধ করছেন, জেল খাটছেন — ব্যস, ফুরাইয়া গেল। আপনে পুরুষ মানুষ না? ভুলের শাস্তি শেষে মাথা উঁচা কইর‍্যা খাড়ন। জীবনে ভুল হয়, শাস্তি হয়। তাই বইল্যা বাকী জীবন নষ্ট কইর‍্যা দিবেন? জাইত গেল বইল্যা পাগলের মত পথে পথে ঘুরবেন? জাইত কি কচুপাতার পানি? একটু নাড়া লাগলেই পইড়া যায়? ভুল কইর‍্যা আল্লা'র কাছে ক্ষমা চাইলে মাফ পাওয়া যায়, আর শ্বশুর গোষ্ঠীর কাছে মাফ পাওয়া যায় না? না পাইলে তাগো মুখে থুথু ছিডাইয়া চইল্যা আইবেন। শ্বশুর গোষ্ঠী না, নিজের স্ত্রী কি কয় তা গিয়া শোনেন আগে। তার পরে নিজের কর্তব্য ঠিক করেন। দাবী করেন নিজের ছাওয়ালরে।

রফিক : হ্যাঁ, তা–ই করব। কিন্তু তার আগে যাব আমার বোনের কাছে। তার কাছেই পাব সকলের খবর। জানি, সকলের ছিঃ ছিঃ'র চাবুক আমার গায়ে পড়লেও রাবু তার মায়ের পেটের ভাইকে —

সানাউল্লা : বেশ তো, তা–ই যান।

(দূর থেকে একটা বাস এসে চলে যায় দূরে। — আরম্ভ হয় ফিল্মের জমকালো সুরের গান। প্রথমে মৃদুভাবে, পরে স্বাভাবিক লেভেলেই তা বাজতে থাকে)

(সাজানো একটা কোঠায় রাবু এটা ওটা করছে। রাবেয়া অর্থাৎ রাবুর স্বামী বরকত এসে ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকে–)

বরকত : রাবু! এই যে, মেহ্‌মানরা সব এসে গেছেন। বাকী শুধু বরপক্ষের সেই বিরাট বড়লোক আত্মীয় মোহ্‌সিন খান। খবর পেলাম, তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ছেন।

রাবেয়া : কোন্ মোহ্‌সিন খান?

বরকত : কোন্ মোহ্‌সিন খান মানে? সেই বড়লোক সমাজ সেবক মোহ্‌সিন খান। তাঁর পরিচয়ের জন্য তো ওই নামটাই যথেষ্ট।

রাবেয়া : আ – আমি তো কাউকেই তেমন চিনি না। তাই জিজ্ঞাস করলাম আর কি! কিন্তু তোমাকে খুবই অস্থির লাগছে?

বরকত : লাগবে না? আমার আপন বোনের বিয়ের পাকা কথা বলার জন্য মেহ্‌মান আসছেন। সবচেয়ে বড় কথা, যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে না? আমাদের আগের

www.pathagar.com

দিন আর আছে নাকি? খাবারের আয়োজন সব ঠিক আছে তো?

রাবেয়া : আছে।

বরকত : রুপু ঠিকমত কাপড়চোপড় পরেছে তো?

রাবেয়া : হ্যাঁ হ্যাঁ পরেছে। খুবই মডার্ন করে তাকে সাজানো হয়েছে। এসব ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি মেহ্‌মানদের কাছে যাও।

বরকত : যাচ্ছি। কিন্তু এদিকটায় যেন কোন ত্রুটি না হয় বুঝলে? বিয়েটা পুরা নির্ভর করছে ওই মোহ্‌সিন খানের মতামতের উপর। তবে নানা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যখন আমি জড়িত আছি, তখন এ বিয়েতে তিনি সম্মতি দেবেন— এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। আমি গেলাম।

(চলে যায় বরকত)

(জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় রফিক)

রফিক : রাবু!

(রেকর্ডের গান থেমে যায়)

রাবেয়া : কে? ভাইয়া!! তুমি? জানলার বাইরে থেকে কথা বলছ কেন? ঘরে এস।

রফিক : আসব?

রাবেয়া : কি মুস্কিল, আসবে না কেন? কবে ছাড়া পেলে তুমি?

রফিক : (ঘরে এসে) আজ সকালে।

রাবেয়া : কিন্তু ছাড়া পাওয়ার কথা তো —

রফিক : হঠাৎ করে কিছুদিন আগেই ছাড়া পেয়ে গেলাম। কাউকে জানাবার সময় পাই নি।

রাবেয়া : কেমন ছিলে ভাইয়া? খুব কষ্ট হয়েছে সেখানে?

রফিক : তা তো কিছু হয়ই। তোরা কেমন? তুই ভাল আছিস রাবু?

রাবেয়া : ভালই তো! নানা রকম বিজনেস — অবস্থা আমাদের অনেক ভাল হয়ে গেছে।

রফিক : হ্যাঁ, দেখেই বোঝা যায়। রাবু, আমার জন্য তোর কোন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা —

রাবেয়া : আজই ছাড়া পেলে, ভাবীর কাছে যাও নি? দেখতে যাও নি বুলুকে?

www.pathagar.com

রফিক : তোকেই দেখতে এলাম প্রথম।

রাবেয়া : হঠাৎ ছাড়া পেলে — কেউ বোধ হয় যায় নি জেল-গেটে?

রফিক : কেউ তো জানে না। আর জানলেও যাওয়ার মত — ইয়ে মানে আব্বা-আম্মা তো নেই। ভাইয়েরা — যাক, ওরা কেমন আছে রাবু? বুলুরা? ওদের খবরাখবর রাখিস তো?

রাবেয়া : (শীতল কণ্ঠে) রাখি। তোমার কাছে চিঠিপত্র —

রফিক : দিতে বোধ হয় অসুবিধা আছে। আমার কলঙ্কে মুখ তো পুড়ে গেছে সবারই! — তোদের বাসায় মেহ্‌মান দেখছি?

রাবেয়া : আমার ননদের বিয়ের কথা হচ্ছে। সেই বড়লোক মোহ্‌র্সিন খান আসছেন। তারই আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা। খান সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সবাই খুব ব্যস্ত।

রফিক : ব্যস্ত তো হবেই! সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক আসছেন! রাবু, তোর ভাবী — ইয়ে মানে কেমন আছে নাজমা?

রাবেয়া : ভালই আছে। তবে — ইয়ে — তুমি সেখানে যাও ভাইয়া।

(কথা বলতে বলতে আসে ব্যস্ত বরকত)

বরকত : রাবু! মোহ্‌সিন সাহেব মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই — একি! আপনি — আপনি কখন এলেন? মানে ওখান থেকে —

রফিক : হঠাৎ করেই আজ সকালে ছাড়া পেয়ে গেলাম। রুপুর বিয়ের কথা বুঝি পাকাপাকি হতে যাচ্ছে?

বরকত : হ্যাঁ, আজকে আমরা খুবই ব্যস্ত। ইয়ে — মানে —

রফিক : আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

বরকত : কতদিন পর এলেন। একটু বসে যে কথা বলব — আচ্ছা, পরে আলাপ হবে। আমি ওদিকে একটু দেখি। (চলে যায়)

রফিক : যাই রে রাবু! (রাবেয়া কাঁদছে) কাঁদছিস কেন? দেখা আরও হবে। এতদিন পর তোকে দেখে গেলাম। বুঝে গেলাম - কলঙ্কিত হলেও সব কিছু থেকেই আমি বঞ্চিত নই। আমার জন্যে আমার বোনটি অন্তত —

রাবেয়া : কিছু খেয়েছ?

রফিক : তা — হ্যাঁ, খেয়েছি। আমার সময় খুব কম বলে চলে যাচ্ছি আর কি! আসি।

বরকত : (নেপথ্যে) এই তো এসে গেছেন! মোহ্‌সিন খান সাহেব এসে গেছেন।

www.pathagar.com

(চলে যায় রফিক। রাবেয়া ডুকরে কেঁদে ওঠে। ওদিকে রেকর্ডে আবার জমজমাট সুরের গান বেজে ওঠে)

(মীর সাহেবের বাসা। নাজমা দাঁড়িয়ে, মীর সাহেব আসেন)

মীর সাহেব : মা নাজমা, বুলু কোথায়?

নাজমা : বুলু বাইরে খেলা করছে। কিছু বলবেন আব্বা?

মীর সাহেব : হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখলাম— সরকারের বিশেষ বিবেচনাক্রমে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কিছু সংখ্যক কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

নাজমা : তাই নাকি।

মীর সাহেব : ভাবছি ওই রফিকের কথা। আমার এক বন্ধুর আত্মীয় ওই জেলখানায় চাকুরী করেন। তার মারফতই শুনলাম — রফিকের নাকি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

নাজমা : ভালই তো! তাহলে আপনাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ওখানেও জানাজানি হয়েছে?

মীর সাহেব : এসব কথা কি চাপা থাকে রে মা?

নাজমা : চারদিক থেকে আপনাদের জন্য এত অপমান, এত গ্লানি— সব কিছু নীরবে শুনে যাওয়া ছাড়া আমার যে আর কিছুই করার নেই আব্বা!

মীর সাহেব : এসব ব্যাপারে তুই কিছু করবি, এমন দাবী তো আমি করছি না! আর এই অপমান–গ্লানি শুধু আমাদের জন্য? তোর জন্য নয়?

নাজমা : আমার জন্য যা, তা তো সইতেই হবে। কিন্তু মীর পরিবারের মুখেও কালি পড়ল যে!

মীর সাহেব : কাবিননামার শর্ত অনুযায়ী অন্য কিছুও তুই ভাবতে পারতি। কিন্তু কিছুতেই ভাবতে চাস নি। আজ হোক, কাল হোক– সে ফিরে আসবে। আর আসবে সে একেবারেই নিঃস্ব হয়ে। তোর ভবিষ্যতটা যে খুব অন্ধকার লাগছে রে মা!

নাজমা : আব্বা, গত চারটি বছর কেটেছে আপনার স্নেহ ছায়ায়। খাওয়া পরার কোন কষ্ট আমাদের হয় নি। অবস্থার চাপে সে ছায়াটুকুও এখন নড়ে উঠছে জানি। কিন্তু এ ক'বছর বুলুকে বুকে নিয়ে রাতের আকাশে মেঘে ঢাকা তারাও তো দেখেছি!

www.pathagar.com

আজ যদি হঠাৎ করেই আঁধার ঘন হয়ে আসে, তার ভয় আমাকে আর কতটকু গ্রাস করতে পারবে আব্বা ?।

মীর সাহেব ঃ আমার দুশ্চিন্তার কথায় তোকে হয়তো আরও আহত করে গেলাম মা। কিন্তু আমি যে বাপ! মা–হারা এক অভাগিনী কন্যার বাপ!

নাজমা ঃ দোয়া করবেন আব্বা। আমি শুধু একথাই বলব– বুলুর আব্বা দুঃসময়ে আমার জন্য সান্ত্বনারও কিছু রাখল না।

(নত মুখে চলে যান মীর সাহেব)

(বরকতের বাড়ীর অঙ্গন। লোকজন জমায়েত হয়েছে সেখানে)

বরকত ঃ ওরে, একটা আনন্দের গান লাগা। বিয়ের কথা পাকা হচ্ছে — এসময় —

মোহ্‌সিন ঃ না, এইক্ষণ আনন্দের মিউজিক থাক। আমার বাসার কাছের মসজিদ থেকে নামাজ সেরে বেরিয়ে আসছি, তখন যা একটা মজার ব্যাপার দেখলাম, তা–ই বলছি। একটা পাগলা, নামাজ পড়তে মসজিদে না গিয়ে বাইরে মসজিদের দেয়ালে মাথা রেখে কান্না ভেজা গলায় কি সব বলছে! কি মনে করে দাঁড়িয়ে গেলাম। তার জন্যেই তো এখানে আসতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল। শুনি– পাগলাটা বলছে —

(ভেসে ওঠে মসজিদের বাইরেটা। সেখানে মসজিদের দেয়ালে মাথা খুঁড়ছে সেই পাগলাটে লোকটা)

পাঃ লোক ঃ দ্বীন–দুনিয়ার মালিক! গুনার শাস্তি কত আর ভোগ করব আমি! গুনা করলাম আমি, কিন্তু তার শাস্তি আমার সংসারটারে এই রকম কইর‍্যা ভাইঙ্গ্যা দিল ক্যান্? নিঝ্‌ঝুম অইয়া গেল ক্যান্ আমার হৈ চৈ–এ ভরা ঘর, ঘরের আঙ্গিনা? ছোট ছাওয়ালডারেও ছুঁইয়া গেল আমার এই গুনা? কিন্তু আরও আরও গুনাগারের ঘর? হেইসব ঘর তো হাসি–আনন্দে ভরা? আমার ঘরটাই শুধু ভাইঙ্গ্যা গেল ক্যান্? আমার লাইগ্যা মইরম অপেক্ষা করল না ক্যান্, ক্যান্?

(মিলিয়ে গেল সেই দৃশ্য)

মোহ্‌সিন ঃ কথাগুলো শুনে মনে বহুত কষ্ট পেলাম। এগিয়ে গিয়ে টাকা দিতে গেলাম। নিল না।

www.pathagar.com

বরকত : পাগলে কি না কয়, আর ছাগলে কি না খায়? এইবার একটা ভাল গান দিতে বলি স্যার?

মোহ্সিন : না, থাক। বিয়ের কথাবার্তা হউক। শুভ কাজের কথায় গান-বাজনা —

(ফুলের মালা নিয়ে মোহসিন খানের দিকে এগিয়ে আসে দু'টি ছোট মেয়ে)

(একটা থমথমে রাতের আবহ। একটা পাখী ডেকে যায়। বিছানায় ঘুমন্ত বুলুর পাশে বসে আছে নাজমা। তখনই বাইরের অন্ধকার থেকে তাকে রফিক–)

রফিক : নাজমা!

নাজমা : কে? জানলার বাইরে কে?

রফিক : (চাপা কণ্ঠে) আমি। রফিক।

নাজমা : তুমি ? কোত্থেকে কখন এলে?

রফিক : আস্তে কথা বল নাজমা। বাসার সবাই জেগে উঠবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আজ সকালে ছাড়া পেয়েছি। ছাড়া পেয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস পাই নি। কিন্তু এই চার বছর তোমাদের ছেড়ে — মানে শেষ পর্যন্ত মনকে আর বাঁধতে পারলাম না নাজমা। তাই চোরের মতই তোমাকে দেখতে এলাম। — নাজমা, তুমি কথা বলবে না? বিশ্বাস কর, এই চার বছর আমি তিলে তিলে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়েছি। বুঝতে পেরেছি – আমার ওই ঘৃণিত কাজের জন্যে — জানি, আমার কলঙ্কের কালিতে তোমাদের — নাজমা, বুলুর জন্যে এই জামা-প্যান্ট কিনে এনেছি।

নাজমা : জামা-প্যান্ট তোমার সঙ্গেই রাখ।

রফিক : নাজমা, পাতাঝরা গাছের শাখেও পাতা গজায়। পুত্রশোকাতুর মায়ের বুকও সময়ে শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু আমার কলঙ্কের দাগ কি আর কিছুতেই মোছবার নয়?

নাজমা : এখন থেকে খাবে কি? খাওয়াবে কি? আমাদের রাখবে কোথায়?

রফিক : ছাড়া পেয়েই দেখতে গিয়েছিলাম মোহ্সিন খানকে। দেখলাম, রাজার হালে আছেন তিনি। সমাজের নেতৃস্থানীয়

www.pathagar.com

ব্যক্তি। আমাকে তিনি সহানুভূতি দেখালেন। প্রস্তাব দিলেন– আমাদের খাওয়াপরার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

নাজমা : কি উত্তর দিলে?

রফিক : সে–প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করে এসেছি।

নাজমা : তারপর?

রফিক : হারানো সেই জীবন আর ফিরে পাব না জানি। কিন্তু তুমি যদি অভয় দাও, শরীরটা শক্তই আছে, পারব সৎ উপার্জনের অন্ন তোমাদের মুখে তুলে দিতে।

নাজমা : পারবে তা করতে?

রফিক : পারব নাজমা, পারব। যারা ঘৃণা করতে চায়, করুক। তুমি শুধু বল– এই আসামীকে দূরে ঠেলে দেবে না?

নাজমা : তুমি এসেছ, বাসায় কেউই জানে না। এ–অবস্থায়ই তুমি চলে যাও। ভুল করে যে নাটক আরম্ভ করেছ, তার সমাপ্তি এই রাতের আঁধারে হতে পারে না। বুলুর জামা–প্যান্টও সঙ্গে নিয়ে যাও। রোজগার কর, বসবাসের আয়োজন কর। তা যত সাধারণই হোক, তাতেই চলবে। তারপর প্রকাশ্যে দিনের আলোতে আমাদের নিতে এসো। নাটকের সমাপ্তি ঘটবে তখন। নতুন বাসায় বুলুকে দিয়ো এই জামা–প্যান্ট।

রফিক : (আনন্দমাখা কণ্ঠে) নাজমা!

নাজমা : এবার এস। বুলু হয়তো জেগে উঠবে।

(মধ্যরাতের পাখীদের কাকলী ভেসে আসে)

www.pathagar.com

অশান্ত বায়ু

চরিত্র–লিপি

আম্মা

কাজেম আলী

খসরু

চাকর

বৃদ্ধ

রহমান সাহেব

শিরীন বেগম

কলিম

মকসুদ

ডাক্তার

মীনা

ও

অন্যান্য

www.pathagar.com

(গ্রামের ক্ষেত-খামারের মাঠে অনেক লোকজনের হৈ চৈ, সঙ্গে কাসর ঘন্টা ও ঢোলের কান-ফাটানো আওয়াজ। তার মধ্যেই অত্যুৎসাহী তরুণদের অবিরাম শ্লোগান—"খসরু ভাই আগাইয়া যান, আমরা আছি আপনের সাথে।" তরুণদের শ্লোগানমুখর চোখমুখ দেখে মনে হবে— ওরা বুঝি পাগলই হয়ে গেছে। ভীড়ের মধ্য থেকে অতিষ্ঠ বিপর্যস্ত খসরু ঠেলে বেরিয়ে এসে পথ ধরে)

(খসরুদের কোঠাবাড়ী। বারান্দায় এসে দাঁড়ায় কাজেম আলী, ঘর থেকে বেরিয়ে আসে খসরু মিয়ার বিধবা আম্মা। অদূরের হৈ চৈ শোনা যায়)

আম্মা : বাইরে এত হৈ চৈ কিসের ছোট মিয়া?

কাজেম : আপনাগো জমিতে খসরু মিয়া হাল চাষ আরম্ভ করাইছে। তাই গেরামের সকলরে নিয়া একটু আমোদ-ফূর্তির ব্যবস্থা .... অবশ্য আমোদ-ফূর্তিডা একটু বেশি জোরে শোরে হইতাছে- এই আর কি!

আম্মা : কি পাগল ছেলে রে বাবা! এখানে কান রাখা দায়, ঘরে আসুন।

(দু'জনেই ঘরের অভ্যন্তরে যায়। হৈ চৈ কিছুটা কম শোনা যায়)

কাজেম : মায়ের আদর মিশাইয়াই পাগল শব্দডা উচ্চারণ করলেন ভাবী সা'ব। কিন্তু এই শব্দডাই কয়েকদিন ধইরা আমার মনে ঘুরপাক খাইতাছে।

আম্মা : কথাটা খুলে বলুন কাজেম আলী।

কাজেম : খসরু মিয়া ওই খান থাইক্যা আইসা মাথায় পানি ঢালতাছে দেখলাম।

আম্মা : (ব্যগ্র কণ্ঠে) তাই নাকি!

(দেখা যায়- অন্য বারান্দায় খসরু মিয়া মাথায় পানি ঢালছে)

তাহলে কি মাথা ধরল? কয়েকদিন ধরেই দেখছি ....

কাজেম : জ্বে। এই নিয়া আমারও বহুত চিন্তা। মাথার মধ্যে 'হাজার হাজার রগ, রগের একটা জাল। কোন্ সময় যে কোন্ রগ

www.pathagar.com

বেতালা অইয়া যায়—বুঝা মুস্কিল। সকালেই আবার গাঁয়ের ইস্কুলের লাইগ্যা বিশ হাজার টেকার চেক লেইখ্যা দিছে।

আম্মা : বিশ হাজার টাকার চেক?

কাজেম : গেরামের উন্নতি করতে চায়। তাই আগে ইস্কুলডার উন্নতি করতে আরম্ভ করছে।

আম্মা : খসরুকে নিয়ে কি যে বিপদে পড়লাম!

কাজেম : আপনাগো অত টেকার সম্পত্তি .... অদ্দিন দেখাশুনা কইরা রাখছি। অখন খসরু মিয়া নিজেই দায়িত্ব নিছে, ভালা কথা — কিন্তু গেরামের উন্নতির নামে পাগলের মত টেকাপয়সা নষ্ট করা .... অনেকেই কইতাছে- অল্প বয়সেই রোগে ধইরা ফেলাইল নাকি! আমাগো গোষ্ঠিতে আবার বরাবরই একজন কইরা পাগল অয় কি না!

(খসরু মিয়া পানি ঢালা শেষ করে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছছে)

আম্মা : (অতি ব্যগ্র কণ্ঠে) ও কাজেম আলী মিয়া, তাহলে?

কাজেম : এই চিন্তায় রাইতে আমার ঘুম নাই ভাবী সা'ব! খসরুর বাপ, আমার ভাইজান—তানিও একটু একটু পাগলামী .... জানেনই তো বোধ অয়?

আম্মা : কিন্তু ওটা তো আসল পাগলামী ছিল না!

কাজেম : আহ্লাদের পাগলামী আছিল- তাই না? আহ্লাদ করতে করতেই তো আসল জিনিসখানে ধরে গো ভাবী সা'ব!

আম্মা : (প্রায় আপন মনে অসহায় কণ্ঠে) অসময়ে খোকা পানি ঢালছে মাথায়, মাথা ধরেছে নিশ্চয়ই ....

কাজেম : আসল জিনিসখানে ধরছে কি না ....

আম্মা : (অতি কষ্টে) ওরে খোকা!

(চলে যায়)

কাজেম : (হাসি চেপে) তেইশ–চব্বিশ বছরের খসরু আইজও খোকা!

(অন্য কোঠায় জামা কাপড় বদলাচ্ছে খসরু। পাশে অস্থির অসহায় আম্মা)

www.pathagar.com

খসরু : আমি তো পাগল নই আম্মা যে অন্যের এত অকারণ দরদ কেন তা বুঝতে পারব না।

(খসরুর মুখে 'পাগল' কথাটা শুনে আঁতকে ওঠে আম্মা)

আম্মা : পাগল! আমি তো এ শব্দ উচ্চারণ করি নি। তুই বললি কেন?

খসরু : (হেসে) একমাত্র সন্তান এই খসরুর প্রতি অন্ধ স্নেহে তুমি আমার এক পাগল আম্মা।

আম্মা : কেন, অসময়ে তোর মাথা ধরে নি?

খসরু : সবাই এত করে ধরলে আমার মাথা না-ধরে আর উপায় কি?

আম্মা : তোর কথাগুলোও যে ধাঁধাঁর মত শোনাচ্ছে রে খোকা।

খসরু : স্কুলের ব্যাপারে লোকজন আসছে, আমি আসি।

(চলে যায় খসরু। আম্মার সন্দেহ আরও বাড়ে। পা টিপে টিপে আসে কাজেম আলী)

আম্মা : (অসহায় কণ্ঠে) কাজেম আলী!

কাজেম : ওইখান থাইক্যা সব কথাই শুনছি। বুঝলেন ভাবী সা'ব, পাগল হওয়ার একটা লক্ষণ হইল-এইডা যারা হইতে আরম্ভ করে তারা নিজেরে ছাড়া অন্য সবাইরে পাগল মনে করে।

আম্মা : (আঁতকে ওঠে) তাই নাকি। তাহলে তো ....

কাজেম : খোকার লগে কথা কইয়া ওরে আর ঘাটাঘাটি কইরেন না। হিতে বিপরীত হইতে পারে। ব্যাপারডা যখন আমরা বুইঝা নিছি, তখন দুইজনে নীরবে চিন্তা কইরা দেখি- কি করা যায় এখন!

•

(রাত নামে, ঝড়ো রাত। বেশ জোরে বাতাস বইছে। খসরু বিছানায় শুয়ে আলোটা কমিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ করে তার চোখে পড়ে—একটি জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আম্মা একটু সরে গেছে। অন্য জানালার পাশে থেকে কাজেম আলীকেও তাই করতে দেখে। আলোটা সে এবার একেবারেই নিভিয়ে দেয়। – বাইরে বিদ্যুৎ চমকায়, যেন পরিহাস করে।

www.pathagar.com

মেঘ গর্জনের শব্দ হয়। কাজেম আলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা-একাই কথা বলে-)

কাজেম : কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া যাইব? (চাপা প্রায়-নিঃশব্দ হাসিতে) দেখা যাউক।

(ঝড়ের মধ্যেই চলে যায়। আড়াল থেকে বাড়ীর চাকর তাকে লক্ষ্য করে)

চাকর : এই তুফানের মধ্যে একলা-একলা কথা কইতে কইতে চইল্যা গেল। সম্পত্তির লোভে পাগল অইয়া গেল নাকি!

(ঝড় থামে। ভোর হয়-হয়। আম্মা নামাজ শেষে জায়নামাজ রেখে বারান্দায় এসে দেখে- কাজেম আলীও এসে গেছে)

আম্মা : শেষ রাতে এক স্বপ্ন দেখলাম ছোটমিয়া!

কাজেম : কি স্বপ্ন ভাবী সা'ব?

আম্মা : স্বপ্নে দেখলাম- এক ফকীর এসে আমাকে বলছেনঃ তোর খোকা পাগল হয়ে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এখনও যদি ডজন খানেক খাঁটি পাগলের সঙ্গে তার দেখা হয়, তাহলে তোর খোকার পাগলামী সেরে যাবে।

কাজেম : (কি ভেবে নিয়ে) খুবই উত্তম স্বপ্ন। কিন্তু ডজন খানেক খাঁটি পাগল আমাগো এলাকায় পাওয়া মুস্কিল।

আম্মা : তাহলে উপায়?

কাজেম : ভাবী সা'ব, একটা উপায় মনে আইছে। শুনছি, আইজকাইল শহরে বন্দরে অনেক পাগল রাস্তায় ঘাটে ঘুইরা বেড়ায়। ঢাকা শহরে নাকি পাগলের ছড়াছড়ি!

(পাশের কোঠা থেকে উৎকর্ণ হয়ে শোনে খসরু)

খোকারে নিয়া ঢাকায় যাওয়া যায় না?

আম্মা : তা যাওয়া যায়। কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে উঠব কোথায়?

(কাজেম আলী চিন্তা করে। ওদিকে খসরুও চিন্তা করে। নিজের কানে ভেসে আসে নিজেরই কণ্ঠ)

খসরু : (নেপথ্য কণ্ঠে) পাগলেরা আমাকে পাগল সাজাচ্ছে। চাচা মিয়াকে আর না-ঘাটিয়ে তার প্ল্যানমত ঢাকায় গেলে কেমন হয়?

www.pathagar.com

কাজেম : উপায় পাওয়া গেছে। রহমান সায়েব নামে আমাগো এক আত্মীয়–বাল্য বন্ধুর বাসা আছে ঢাকায়। ঠিকানাও জানি। বিরাট বড়লোক।

আম্মা : কিন্তু খোকা কি ঢাকায় যেতে চাইবে?

(কথা বলতে বলতে আসে খসরু। ওরা অপ্রস্তুত হয়)

খসরু : কেন চাইব না আম্মা! থাক, আমাকে দেখে কোন কথাই চাপা দেবার দরকার নেই। কথাগুলো আমি শুনেছি। প্ল্যানটা ভালই। কিন্তু আম্মা এখানেই থাকবেন। চাচা মিয়া আর আমি গিয়ে রহমান সাহেবের বাসাতেই উঠব। তারপর ঢাকায় অনেক পাগল দেখে দু'জন সুস্থ হয়ে ফিরে আসব। আমি কিছুদিন দূরে থাকলে আম্মার পাগলমীটাও সেরে যাবে আশা করি।

কাজেম : বাবা খসরু মিয়া, আমি তোমার বাপের ভাই চাচা– কাজেম আলী। তোমার মঙ্গলের কথা চিন্তা কইরাই ....

খসরু : জ্বি। আমিও আপনার বড় ভাইয়ের একমাত্র ছেলে খসরু মিয়া। আপনার মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই বলছি– আর দেরী না করে যাবার জন্য তৈরী হোন গে'।

(অগত্যা কাজেম আলী চলে যায়)

আম্মা : কিন্তু তোকে ছেড়ে একা আমি থাকব কি করে?

খসরু : পারবে আম্মা, সে–ব্যবস্থা আমি করে যাব।

(বাজার, অনেক লোক। এক স্থানে কাজেম আলী তার এক সঙ্গীকে কি সব বোঝাচ্ছে। .... জুমা' ঘরের সামনে একজন শরীফ বৃদ্ধ কথা বলছেন খসরুর সঙ্গে)

বৃদ্ধ : তাহলে তুমি বলছ– রোজ তোমার আম্মার কাছে গিয়ে আমি তাঁকে ....

খসরু : বুঝিয়ে শান্ত রাখতে হবে। আমাদের সম্পত্তির দলিলগুলো আপনিই রাখুন। আম্মার কাছে থাকলে যে কেউ চেয়ে নিতে পারে। তাই ....

www.pathagar.com

(নীরবে রাজী হন বৃদ্ধ। খসরু নীরবে সালাম জানিয়ে চলে যায়)

(খসরুদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আম্মা ও কাজেম আলী। আম্মা কিছু টাকা তুলে দেয় কাজেম আলীর হাতে)

আম্মা : খরচের টাকা খসরু নিয়ে যাচ্ছে। এই টাকা আলাদা করে আপনাকে দিলাম। খসরু জানবে না– এমন কত কিছু করতে হতে পারে তো!

(কাজেম আলী সাবধানে টাকা রাখে যথাস্থানে)

(রেল ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানো। যাত্রীদের প্রচন্ড ভীড়। ভীড় ঠেলেই উঠছে কাজেম আলী ও খসরু। হুইস্‌ল্‌ দিয়ে ট্রেন ছাড়ে। অদূরে শরীফ বৃদ্ধ আম্মার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন গাড়ীর অবস্থা)

বৃদ্ধ : দেখ মা, দেখ। গাড়ীটার অবস্থা দেখ। একি সর্বনাশা পাগলামীতে পেয়ে বসল সবাইকে।

(আম্মার অসহায় চোখে ভেসে ওঠে চলন্ত ট্রেনের দৃশ্য। ট্রেনের দরজায় উপরে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে বসে আছে। মানুষের মেল্‌ সেখানে। ক্রমে ট্রেনের শব্দ কমে আবার বাড়ে, দৃশ্যমান হয় ঢাকা ষ্টেশন। – কাজেম আলী ও খসরু রিকশায় উপবিষ্ট। রাস্তায় এত লোক দেখে ও রিকশা–গাড়ীতে জাম হয়ে যাওয়া অবস্থা দেখে এবং বিভিন্ন ধরনের বিরক্তিকর শব্দে কাজেম আলী রীতিমত বিপর্যস্ত। চাচার এই অবস্থা লক্ষ্য করে খসরু। এর মধ্যে পাগলাটে এক ভিখারী কাউকে পথ–আটকে টাকা চেয়ে হাত বাড়ায়। এক সময় রিকশা চলতে আরম্ভ করে। .... অবশেষে রহমান সাহেবের বাসার সামনে রিকশা থামে)

(রহমান সাহেবের বাড়ীর আউট হাউসের একটা কোঠার বারান্দা। বারান্দায় কাজেম আলী হাত–পা ছেড়ে বসে পড়ে বিছানাপত্রের উপর। খসরু আসে ভেতর থেকে)

কাজেম : অতক্ষণে শব্দ একটু কমলো বইল্যা মনে অয় বাবা খসরু?

খসরু : আপাতত। রহমান সাহেবের সঙ্গে আলাপ–পরিচয় হল?

www.pathagar.com

কাজেম : হইছে, তয় মনে অইলো .... চিন্তা-ভাবনায় বহুত পেরেশান আছে!

(তখনই অদূরে ট্রাকের কর্কশ হর্ন ও চলার বিকট আওয়াজে কাজেম আলী চমকে ওঠে, হাসি চাপে খসরু)

(চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে রহমান সাহেব। টেবিলের অপর পাশে চাকর কলিম দাঁড়ানো। রহমান সাহেব কথা বলে কখনো বেশ উচ্চ গ্রামে, কখনো নিম্ন কণ্ঠে)

রহমান : তাইলে তুমি বলতে চাও কলিম, ভুল করে আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছি?

কলিম : জ্বে, মেরেছেন। আপনের মাইয়া, আমাগো মীনা আপার বিয়ার ব্যাপারে লোক আইছে মনে কইরা নিজের সয়-সম্পত্তির হাছা মিছা খবর যাগো কাছে দিছেন, জাইন্যা আইছি- তারা অইছেন ইনকাম ট্যাক্সের লোক, বিয়ার লাইগ্যা আহে নাই। নিজের বড় অবস্থা দেখাইতে গিয়া ভালা কামই করছেন!

(তখনই বিশ্রী শব্দে আবার বেজে ওঠে ট্রাকের হর্ন। চীৎকার করে ওঠে রহমান সাহেব)

রহমান : কলিম, তুই ভুইল্যা গেছস্- কথা কইতাছস্ তুই তোর মালিক রহমান সাহেবের লগে।

কলিম : জ্বি, আপনের মতই ভুল করছি বোধ অয়। আমি অখন বাইরে যাই, আপনে মেজাজ ঠিক করেন- হাই প্রেশার আছে তো! তাছাড়া রাগের মাথায় কথাও কইতাছেন আমার মত গ্রাম্য ভাষায়।

(কলিম চলে যায়। অদূরে বিশ্রী বিচিত্র শব্দ আরম্ভ হয়। রেডিওতে চড়া ভলিয়্যুমে এক ষ্টেশন থেকে অন্য ষ্টেশন ধরা হচ্ছে। এর মধ্যেই রহমান সাহেবের চীৎকার-)

রহমান : কলিম! (শব্দ আরও বাড়ে) এই কলিম!! রেডিওতে এত চড়া ভলিয়্যুমে ষ্টেশন ঘোরাচ্ছে কে?

(শব্দ অনেক কমে যায়। মেজাজী ঢং-এ আসে শিরীন বেগম, রহমান সাহেবের স্ত্রী)

শিরীন : ষ্টেশন ঘুরাচ্ছিলাম আমি।

(হঠাৎ যথেষ্ট শান্ত হয়ে যায় রহমান সাহেব)

www.pathagar.com

রহমান : তুমি? ইয়ে মানে এত জোরে?

শিরীন : হ্যাঁ। এত জোরে। তাতে কি হয়েছে?

রহমান : না, মানে চারদিকে এত শব্দ .... এর মধ্যেই আমি .... আমি ....

শিরীন : আউট হাউসে দু'জন মানুষ দেখছি .... ওরা কারা?

রহমান : আমার গ্রাম-সম্পর্কে আত্মীয়। এসেই গেছে যখন, আমি থাকতে বলেছি। তরুণটির নাম খসরু। তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে এসেছে তার চাচা কাজেম আলী মিয়া।

শিরীন : (তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠে) কাজেম আলী মিয়ার ভাতিজা খসরু? নামের নমুনা থেকে মিল পাওয়া যাচ্ছে না তো? বিচিত্র ধরনের সব আত্মীয়স্বজন তোমার। মেজাজ ঠিক থাকে কি করে!

রহমান : আমার স্ত্রী হিসাবে ওরা তোমারও আত্মীয়।

শিরীন : তাতো অবশ্যই! ওই 'কাজেম আলী' আমার আত্মীয় না হলে চলে! তা ওই সুদর্শন ভাতিজার কি চিকিৎসা করাবেন তোমার আত্মীয় কাজেম আলী?

রহমান : কাজেম আলীর বড় ভাই সানোয়ার আলী- এতদিন বিদেশেই চাকরী করত। হঠাৎ করে মরে গেল একদিন। ঢাকায় বা কোন শহরে বাসাবাড়ী না থাকায় খসরু আর তার মা গাঁয়ের বাড়ীতেই চলে যায়। সেখানে সানোয়ার আলীর সম্পত্তি অনেকটা। এখন হল কি জান?

শিরীন : আমার আর জানার দরকার নেই। ওই 'কাজেম আলী'কে দেখেই তো আমার মেজাজটা এত বিগড়ে গেল।

রহমান : আর সেই মেজাজ দেখাচ্ছিলে রেডিওর উপর?

শিরীন : তোমার উপর তা দেখাবার চান্স তো আর পাওয়া যায় না। দিনরাত আছ তো এই সব বিজনেস আর টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে।

রহমান : ইনকাম ট্যাক্সের চিন্তায় বড় ব্যস্ত আছি শিরীন।

শিরীন : ইনকাম ট্যাক্সের চিন্তা না বলে বল ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার চিন্তায়!

www.pathagar.com

(বাইরে মোটর গাড়ীর হর্ন বাজে)

রহমান : ওই মকসুদ এসে গেছে। আমার বিজনেস পার্টনার।

শিরীন : (কণ্ঠে মমতা এনে) গাড়ীর শব্দেই তা বোঝা যায়।

রহমান : একটা কথা তোমাকে বলতে চাই শিরীন।

শিরীন : কি কথা?

রহমান : সেদিন মকসুদ বলছিল ....

শিরীন : কি বলছিল?

রহমান : না .... মানে .... ইয়ে .... তোমার কথাবার্তায় কিছুটা অসঙ্গতি ....

শিরীন : তার অর্থ আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? (আরও চড়া গলায়) আমার খিটখিটে মেজাজের কথা তুমি প্রায়ই বলে থাক। মকসুদও এখন তোমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে? এবার তোমরা আমাকে পাগল সাজিয়ে .... (চীৎকার করে) আমি সব বুঝতে পারছি। আমিও দেখে নেব, আমিও প্রমাণ করব–পাগল হচ্ছি আমি না তোমরা?

(রাগে চলে যায়। অন্য দিকে সন্তর্পনে ঢোকে কাজেম আলী)

কাজেম : কি ব্যাপার ভাই রহমান সায়েব?

রহমান : (বিরক্ত কণ্ঠে) তুমি এ সময়ে এখানে কেন কাজেম আলী? আমাদের একটা প্রাইভেসি আছে তো।

কাজেম : কি জানি ভাই, পেরাইভেসির কথাডা খেয়াল না কইরাই ঢুইক্যা পড়ছি। বাইরে যাইতেছিলাম, শুনলাম পাগল–টাগলের কথা হইতাছে। ভাবলাম– দেখি ব্যাপারডা কি। আমিও পাগল নিয়া পড়ছি তো!

রহমান : পাগল নিয়ে পড় নি, নিজেই পাগল হয়েছ। যেখানে যাচ্ছিলে, যাও।

কাজেম : (যেতে যেতে আপন মনে বলে–) মাথার অবস্থা দেখি সবখানেই এক ....

(বেরিয়ে যায়। আসে মকসুদ)

রহমান : চল, যেতে যেতে বলছি। তোমার ভাবীকে ম্যানেজ করতে হবে। কিন্তু মকসুদ, আমি যে পাগল–বেষ্টিত হয়ে গেলাম!

(ওরা বেরিয়ে যায়)

www.pathagar.com

(বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে কাজেম আলী দেখে- অদূরে কলিম নিবিষ্ট মনে আঙ্গুলে কি গণে গাচ্ছে। কাজেম আলী তার কাছে গিয়ে বলে-)

কাজেম ঃ এই যে ভাই।

কলিম ঃ (চাপা নির্দেশে) চুপ, শব্দ কইরেন না- হিসাবে আউলা লাইগ্যা যাইব।

কাজেম ঃ তুমি বুঝি বা'জান এই বাসার চাকর?

কলিম ঃ চাকর না, কেয়ারটেকার। তয় বাসার ওভারঅল দায়িত্বে আছি তো, তাই কাজকাম বাজার-সদায় নিজের হাতেই করতে হয়; এই সব ব্যাপারে আমি এক্কেরে ফি-রি .... বেগম সা'বরে খালি বাজারের হিসাবটা ঠিকমত মিলাইয়া দিতে অয়।

কাজেম ঃ (যেতে যেতে আপন মনে) ওরে বাবা, এই মিয়ার অবস্থাও দেখি ওই রকমই!

(চলে যায়)

কলিম ঃ চাইর দিকে পাগল-এর মধ্যে বাজারের টেকাপয়সা মাইরা কোন রকমে আছি। এর উপ্রে জুটলো আইসা নতুন পাগল। আউট হাউস হইছে পাগলের আস্তানা। আরে, কইতে কইতে আউট হাউসের আর এক পাগল দেখি ঘর-বারান্দা করতে আরম্ভ করছে!

(আউট হাউসের বারান্দায় এসে ঘরে গিয়ে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ায় খসরু)

খসরু ঃ (আপন মনে) কুঁজোয় পানি নেই, কাউকে দেখছিও না যে ডাকব। এই যে মিয়া!

কলিম ঃ (দূর থেকে) বাজারের একাউন্ট নিয়া ব্যস্ত আছি।

(সরে যায় সেখান থেকে)

খসরু ঃ চাকরটা না শুনেই চলে গেল! ওই যে একটি মেয়ে আসছে। ইয়ে .... এই যে .... একটু শুনবেন?

(মীনা অদূরে এসে ডাক শুনেই চলে যায়)

www.pathagar.com

যাঃ, মেয়েটাও না শুনে চলে গেল! কিন্তু পানি ....

(কলিমকে আবার দেখা যায়)

এই যে মিয়া, শোন। এক গ্লাস পানি।

কলিম ঃ (দূর থেকেই) কইলাম তো, ব্যস্ত আছি– পরে। (চলে যায়)

খসরু ঃ আশ্চর্য! কেউ শোনে না, সবাই ব্যস্ত। (মীনাকে আবার দেখা যায়) এই যে, শুনুন।

মীনা ঃ (কাছে এসে) কাকে চান?

খসরু ঃ চাই আপনাকেই .... মানে ইয়ে – একটা প্রয়োজন ....

মীনা ঃ ফাম্বলিং না করে চট করে বলে ফেলুন।

খসরু ঃ (মীনার কথায় বিব্রত বোধ করে কোন রকমে বলে ফেলে) পানি।

মীনা ঃ পানি?

খসরু ঃ ঘরে নেই। দয়া করে যদি ....

মীনা ঃ পানি– খাওয়ার, না মাথায় দেয়ার?

খসরু ঃ (আপন মনে কিছুটা নিম্ন কণ্ঠে) ব্যস, আরও একজন।

মীনা ঃ বিড় বিড় করে কি বলছেন?

খসরু ঃ পানি খাওয়ার জন্যই চেয়েছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে– আপনাদের এখানে কিছুদিন থাকলে মাথায়ও দিতে হবে।

মীনা ঃ (রাগে) যত্তসব পাগল এসে জোটে। (চলে যায়)

খসরু ঃ খুবই বিপদে আছি বলে মনে হয়। যাক, পাগল দেখতেই যখন আসা, তখন যত বেশি দেখা যাবে ততই ভাল।

(কলিম আসে, হাতে পানি ভরা গ্লাস)

এই তো এসে গেছে।

কলিম ঃ জ্বে– (তখনই দেখে—মীনাও আসছে পানি নিয়ে) .... মানে এসে গেছে।

(একদিকে পানি ভরা গ্লাস মীনার হাতে, অন্য দিকে পানি ভরা গ্লাস কলিমের হাতে। খসরু কিংকর্তব্য বিমূঢ়। হঠাৎ কলিম নিজের গ্লাস দেখে বলে–)

আরে, এই গেলাসে ময়লার মত কি জানি পড়ছে।

(গ্লাস নিয়ে চলে যায়। মীনার মুখে যেন হাসি ফুটতে চায়)

www.pathagar.com

খসরু : (গ্লাসটা হাতে নিয়ে) আমি ঢক্‌ঢক্‌ করে পানি খাব, আর আপনি মেয়ে মানুষ হয়ে তা দেখবেন, বরং ভিতরে রেখে আসি, পরে খাব।

(গ্লাস রাখতে ভেতরে যায়, মীনার ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে, আসে খসরু)

মীনা : আপনি কি পরিবারের ছোট ছেলে?

খসরু : ছোটও বলতে পারেন, বড়ও বলতে পারেন। মানে আমিই একমাত্র সন্তান। (গড় গড় করে বলতে থাকে) আব্বা মারা গেছেন বিদেশে চাকরীরত অবস্থায়। আম্মা আছেন। কোন শহরে বন্দরে বাসাবাড়ী নেই। গাঁয়ের বাড়ীতে আছি। সুশিক্ষিত। টাকাপয়সা পরিমাণ মতই আছে। জমিজমাও বলতে গেলে যথেষ্ট ....

মীনা : এই সব পারিবারিক পরিচয় কেন?

খসরু : না, একসংগেই সেরে ফেললাম আর কি? আপনি বোধ হয় রহমান সাহেবের একমাত্র মেয়ে?

মীনা : আমাদের এখানে এসে ওঠার উদ্দেশ্য?

খসরু : এই বেড়াতে আসা এবং নানা রকম লোকজনের সাথে কথা বলা, তাতে ....

মীনা : আমি উদ্দেশ্যটা জানতে চাইছি।

খসরু : বেশ কিছুটা রাগ দেখাচ্ছেন বলে মনে হয়?

মীনা : নয়তো কি অনুরাগ দেখাব? শুনুন, সোজাসুজি বলি। আপনিও কি টাকার বদলে আমাকে বিয়ে করতে চান?

খসরু : মানে .... বিয়ে– দেখুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মীনা : বিয়ের পর যদি দেখেন– এই সাজানো বাড়ীঘর সব ফাঁকা– তখন?

খসরু : কি মুস্কিল। আমি আপনাকে বিয়ে করতে যাব কেন?

মীনা : (হঠাৎ সন্দেহ বশে) তাহলে কেন আপনি এসেছেন?

খসরু : আমার চাচা আম্মাকে বুঝাতে সফল হয়েছেন যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। তাই চিকিৎসার জন্য এখানে নিয়ে আসা।

মীনা : ও! আপনি তাহলে পাগল?

www.pathagar.com

খসরু ঃ আপাতত। আর আলাপ পরিচয়ে মনে হচ্ছে ....

মীনা ঃ কি মনে হচ্ছে?

খসরু ঃ আপনিও কিছুটা ওই রকমই। (রাগ করে মীনা চলে যায়) ব্যাপার কি, এবাড়ীর সবাই দেখি অদ্ভুত।

(কলিম আসতে আসতে বলে –)

কলিম ঃ জ্বে। আপনের চাচামিয়াও কম অদ্ভুত না।

খসরু ঃ কেন, কি করেছেন তিনি?

কলিম ঃ রাস্তায় এক দোকানের পাশে দেখলাম – চিনাজানা কার সাথে ফাসুরফুসুর করতাছে।

(কলিম আড় চোখে দেখে রাস্তার পাশে নিম্ন কণ্ঠে কথা বলছে একটা লোক ও কাজেম আলী)

লোক ঃ শোনেন কাজেম ভাই, এই শহরে টেকা খরচ করলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়।

কাজেম ঃ বাঘের চোখ অহন থাউক। যে পাগলের সন্ধান দিলা, তারে দিয়া খসরু মিয়ারে অন্যরকম চিকিৎসা করানি যাইবো না?

লোক ঃ কইলাম তো টেকা ছড়ান– দেখবেন, সব কাম ফতে।

(আবার খসরু–কলিমের দৃশ্য)

কলিম ঃ মনে অইলো খুবই ধরিবাজ আপনের ওই চাচা। (অদূরে দেখে নিয়ে) ওই যে আপা দেখি বিল্ডিং–এর বারান্দায় দাঁড়াইয়া কি ভাবতাছেন।

খসরু ঃ কাছে গিয়ে শোন– কোন কিছু করতে বলেন কিনা। আমিও চৌকির পায়াটা একটু ঠিক ঠাক করে নেই, ঢিলা হয়ে গেছে।

(কলিম চলে যায়। খসরু যায় ভেতরে)

(বারান্দায় মীনা কথা বলছে কলিমের সাথে)

www.pathagar.com

মীনা : শোন কলিম, আউট হাউসের ওই ভদ্রলোকের অসুখ। এখানে থেকে চিকিৎসা করাবেন। দেখো, ওঁর যেন কোন অসুবিধা না হয়। তাহলে মনে কষ্ট পাবেন।

কলিম : কষ্ট পাইতে দিমু ক্যান্ আপা? আমি আছি, আপনে আছেন। আমরা ....

মীনা : (কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে–) তোমাকে আম্মা খুঁজছিলেন তখন। হয়তো কাজ আছে।

(কলিম চলে যায়। মীনাও চলে যায় অন্য কাজে)

(নিজের কক্ষে শিরীন বেগম ব্যাঙ্কের পাস বই দেখে কাগজে লিখে হিসাব করছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ে ড্রেসিং টেবিলের গ্লাসে ভেসে ওঠা নিজের চেহারার ওপর। সুসজ্জিতা, রূপসী; যৌবনময়ী শিরীন বেগম নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয় যেন .... বারান্দায় কলিম আপন মনে কথা বলে)

কলিম : নাহ্, কাজকাম থাকলে আমারে ডাকতো। অখন বেগম সায়বের কাজকাম একলা একলা, নিজের লগে।

(অন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে মীনা শোনে– আউট হাউসে খুব জোরে খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, দাঁড়ায় এসে আউট হাউসে)

মীনা : এই যে দেখুন, শব্দটা একটু কম করলে ভাল হয় না?

খসরু : হয়, কিন্তু তাতে কাজটা ভাল হয় না।

মীনা : ওই বুঝি বিছানার সাজসজ্জা? গোছগাছ কাকে বলে জানা নেই? কোনদিন একা বাইরে থাকেন কি নাকি?

খসরু : আম্মার অতি আদরের সন্তান— বুঝতেই তো পারেন। তা ছাড়া আমি যে অসুস্থ।

মীনা : (নিজেই গুছিয়ে দিতে চেয়ে নিজেকে নিরস্ত করে) ধরুন ওই বালিশটা .... ঠিক আছে, কলিমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

খসরু : নিজেই করতে চেয়ে ....

(মীনার দৃষ্টিতে শাসনের আভাস পেয়ে কথা ঘুরিয়ে নেয়)

www.pathagar.com

না না, মানে আবার কলিম কেন?

(মুখ গম্ভীর করে চলে যায়। .... শিরীন বেগম জানালা দিয়ে দেখে- মীনা কলিমকে আউট হাউসে যেতে বলছে। কলিম এগুচ্ছে)

(কাজেম আলী একটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা দেয়ালে সাইনবোর্ড পড়ছে। পাশে তার সেই পরিচিত জন। সাইন বোর্ডে লেখা আছে - "ডাঃ এম. আহমেদ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ"। কাজেম তাকায় পরিচিত জনটির দিকে। সে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানায় - এই ডাক্তারই সেই ডাক্তার)

(আউট হাউসের বারান্দায় কথা বলছে খসরু ও কলিম)

কলিম : ওই এম. আহমেদ ডাক্তারের লগে আমার তো খুবই জানাশোনা। বুঝেন তো যে দিনকাল পড়ছে, কোন সময় কার লাইগা ওই ডাক্তারের দরকার পইড়্যা যায়।

খসরু : তুমি খুব বুদ্ধিমান কলিম। আচ্ছা, তোমার আপার কোন অসুখ বিসুখ ....

কলিম : ক্যান্, আপামনির মেজাজের কোন তাল পাইতাছেন না?

খসরু : মেঘ-রৌদ্রের খেলা তো, তাল পাওয়া মুস্কিল। তা ছাড়া, এ বাসার সবাইকে আমার কাছে কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়। তুমি কি বল?

কলিম : আমি আর কি কমু। বেশ কিছুদিন আগে যখন এই বাসায় আইলাম- তখন আমারও মনে অইছিল, যত সব পাগলের মধ্যে আইয়া পড়ছি আমি। সবাই নিজের হিসাব নিকাশ লইয়া ব্যস্ত। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আমিও লাইগা গেলাম হিসাব নিকাশে। এই বাসার সব খাইখরচা তো সব আমার হাত দিয়াই হয়। রোজই তার থাইক্যা পরিমাণ মত মাইরা দেই, জমাই, দেশে পাঠাই। সব পাগলের মেলে আইসা আমিও পাগল হইয়া গেলাম সা'ব। তয় মীনা আপার কথা

www.pathagar.com

ধইরা জিগাইলেন যখন, তখন একটা মারফতি কথা কইয়া যাই ঃ মীনা আপার পাগলামীডা বড় দুঃখের পাগলামী।

(চলে যায় কলিম। বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে খসরু। কল্পনায় তার চোখে ভাসে রাতের ঢাকা নগরীর একটি নীরব দৃশ্যঃ রাস্তার এক পাগলাটে ভিখারী তার বস্তির ঝুপড়িতে ফিরে এসেছে। তার কাছে এগিয়ে আসে জীর্ণা-শীর্ণা স্ত্রী, তার ছেলেমেয়েরা। পাগলা ভিখারী কিছু টাকাপয়সা, কিছু সংগৃহীত খাদ্য তুলে দেয় স্ত্রীর হাতে। তার পর পাগলামীর কাপড় চোপড় খুলে রাখে। আপন মনেই বলে-)

পাগল ঃ পাগল সাইজাও রোজগার বাড়াইতে পারতাছিনা। পাগল সাইজা যাগো কাছে হাত পাতি, দেখি বাঁইচা থাকার লাইগ্যা তারাও আমার মত পাগল। কেউ জাইন্যা শুইন্যা, কেউ না-জাইন্যা। কেরমে কেরমে দেশটা পাগলে ভইরা যাইতাছে, ভইরা যাইতাছে!

(সকাল। আউট হাউসের বারান্দায় কথা বলছে খসরু আর মীনা)

মীনা ঃ আব্বার কাছে আপনার চাচা একটু আগে বলছিলেন- পাগলের ডাক্তার পাওয়া গেছে। কিছু পরেই আপনাকে নিয়ে যাবেন সেই ডাক্তারের কাছে। কি, যেতে রাজী তো?

খসরু ঃ আপনার কি মনে হয়?

মীনা ঃ আপনাদের সব বৃত্তান্তই আমি জেনেছি- আব্বা বলছিলেন আম্মাকে। ভাবছি আধুনিক যুবক হয়েও চাচার নির্দেশে এই অদ্ভুত ধরনের চিকিৎসার জন্য ঢাকা পর্যন্ত যখন এসেছেন, তখন বাকী নির্দেশও পালন করবেন।

খসরু ঃ পালন করব আরও একটি কারণে। (মীনা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়) ডাক্তারের সংগে পরিচিত হওয়া আমার জন্য খুব জরুরী। কখন কার জন্য দরকার পড়বে ....

(কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে চলে যায় মীনা)

(সাইনবোর্ড লেখা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম. আহমেদ-এর চেম্বারের সামনের রাস্তায় রিক্শা থামে। রিকশায় বসে

www.pathagar.com

আছে মীনা। চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে কলিম। জিজ্ঞাসু মীনাকে কলিম নীরবে জানায় যে ওরা ভেতরেই আছে। কলিমের ইংগিতে রিকশা ফিরে চলে)

(ডাক্তারের চেম্বার। ডাক্তার নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করছেন কাজেম আলীকে)

কাজেম : তাইলে ডাক্তর সা'ব, আসল কথাডা খুইলাই কই। আমার ভাতিজা এক্কেরে পাগল না। একটু একটু পাগল।

ডাক্তার : একটু একটু পাগল?

কাজেম : জ্বে, একটু একটু পাগলামী করে।

ডাক্তার : দৃষ্টান্ত দিন, মানে উদাহরণ।

কাজেম : দেদার খরচপাতি করে, আর অনেক আজগুবি কাজকামের পেলেন করে। এই নিয়া আমাগো বহুত চিন্তা।

ডাক্তার : হুঁম। কিন্তু আমার কাছে কেন এলেন, তা-ই বলুন।

কাজেম : পরামর্শ নিতে। (বেশ অন্তরংগ চাপা কণ্ঠে) আপনে যদি খসরু মিয়ারে খালি এই পরামর্শডা দেন যে তোমার বাপের ভাই চাচার কথাবার্তা শুনবা, তোমার চাচা যখন যা যা করতে কয় তা-ই করবা, তাইলেই ব্যস্।

ডাক্তার : ব্যস্?

কাজেম : ব্যস্। (আরও অন্তরংগ কণ্ঠে) ডাক্তর সা'ব, এর লাইগ্যা আপনের ফিস্ আমি বেশি কইরাই দিমু।

ডাক্তার : জেনেই তো এখানে এসেছেন যে আমি পাগলের ডাক্তার?

কাজেম : জ্বেও।

ডাক্তার : যতটুকু বুঝতে পারছি- চিকিৎসার দরকার আপনারই।

কাজেম : (ঘাবড়ে গিয়ে) কি কইলেন ডাক্তর সা'ব?

ডাক্তার : দেরী হলে আপনি আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারেন। এবার ওয়েটিং রুমে গিয়ে আপনার ভাতিজাকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

কাজেম : (হতাশাপূর্ণ কণ্ঠে) আইচ্ছা, তা-ই করি।

(দরজা পার হয়ে যায় কাজেম আলী। অপেক্ষারত খসরুকে বলে-)

যাও বাবা, ডাক্তর সা'ব তোমারে যাইতে কইছেন।

www.pathagar.com

(খসরু ভেতরে যায়। ঘাবড়ে যাওয়া কাজেম আলী কলিমের সংগে কথা বলে)

আমার কাছে সব কিছুই আউলা-ঝাউলা মনে অইতাছে। পাগলের ডাক্তর, অথচ চেহারা-সুরত দেইখ্যা আর কথাবার্তা শুইন্যা মনে অয়- ডাক্তর নিজেই একজন পাগল।

(ডাক্তারের চেম্বার। কথা বলছে ডাক্তার ও খসরু।

ডাক্তার ঃ আপনার চাচাকে এতক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলাম। তার অনেক কথাই শুনলাম। ডাক্তার হিসেবে আমার সিদ্ধান্ত, তার চিকিৎসাই বেশি জরুরী।

খসরু ঃ কিন্তু তাতে তিনি রাজী হবেন বলে তো মনে হয় না।

ডাক্তার ঃ সেটা আপনাদের, বিশেষ করে আপনার চাচার, বিবেচ্য। এবার আপনি। মিঃ খসরু, গ্রামে থেকে আপনি কি করেন?

খসরু ঃ অল্পদিন হল গেছি। বলতে গেলে কিছুই করি না। একটা নতুন ধরনের স্কুল গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম।

ডাক্তার ঃ কিসের স্কুল?

খসরু ঃ গাঁয়ের গরীব সাধারণ মানুষদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার স্কুল। মানে ওই স্কুলে সাধারণ পড়াশুনার সংগে সংগে কামারের কাজ, কুমারের কাজ, তাঁতীর কাজ, তাছাড়াও হাঁস-মুরগী প্রতিপালন, পুকুরে মাছের ....

ডাক্তার ঃ তাতে করেই আপনাকে পাগল বলে সাব্যস্ত করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন আপনার ওই চাচা?

খসরু ঃ জ্বি। আর আমার প্রতি স্নেহের প্রাবল্যে আম্মাও তা-ই বিশ্বাস করলেন।

ডাক্তার ঃ আর বদ্ধ পাগল হওয়ার জন্যে আপনাকে পাঠালেন এই ঢাকায়?

খসরু ঃ ঢাকায় আসতে না চাইলে চাচা আমাকে পাগল সাব্যস্ত করেই ছাড়তেন। এখন তো উল্টো আমি ওদের পাগলামী সারাবার একটা সুযোগ পেলাম।

ডাক্তার ঃ যতটুকু শুনলাম আর দেখলাম, তাতে তো আপনার চিকিৎসার কোন প্রয়োজন দেখছি না।

www.pathagar.com

(বেয়ারা খবরের কাগজ এনে দেয়)

এই যে এতক্ষণে খবরের কাগজ দিয়ে গেল। রোজ এত দেরী কর–

(পত্রিকায় একটা ছবি দেখে)

এ্যাঁ!!

খসরু : কি হল ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার : আবার একটা মেয়ে হারিয়ে গেল! এই দেখুন, পত্রিকার খবর। হালকা-পাতলা গড়ন, পরনে সবুজ ফ্রক আর লাল রঙের জাংগিয়া .... আহ্‌। শয়তানে ছেয়ে গেছে দেশটা।

খসরু : শিগগীরই হয়তো পাওয়া যাবে মেয়েটাকে।

ডাক্তার : আর পাওয়া যাবে! মেয়েটার যে কি অবস্থা হবে, কে জানে! হয়তো হাত-পা ভেংগে খোঁড়া করে দেবে। কত কান্নাকাটি করবে .... তার আব্বা-আম্মাকে ডাকবে। কিন্তু কেউই তো তার এই মিনতি শুনবে না!

খসরু : (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) এ খবরটায় এত ভেঙে পড়লেন ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার : আপনি আসুন, আমি একটু একলা থাকব।

খসরু : (আপন মনে) ডাক্তারও দেখি পাগল!

(চলে যায়)

ডাক্তার : কে জানে, সে আজও বেঁচে আছে কি না!

(উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সহসাই বুক উজাড় করে বলে ওঠেন–)

মা! মা রে!!

(খক্ খক্ শব্দ করে প্রথমে একটি, সংগে সংগে অনেকগুলো পাখী উড়তে থাকে। .... রাস্তায় মানুষের জীবন-ধারা বয়ে চলেছে। .... আউট-হাউসের সামনে কলিম হাত ও মাথা নেড়ে মীনাকে জানাচ্ছে যে খসরুর আসতে দেরী হবে। .... একা একা পথ চলতে খসরু দেখছে ঢাকা নগরীর নানা দৃশ্য। .... শিরীন বেগম জানালা দিয়ে দেখে– রাতে খসরু ফিরে এসে পা বাড়িয়েছে আউট হাউসের দিকে)

www.pathagar.com

(আউট হাউসের কোঠায় ঢুকেই খসরু দেখে– মীনা সেখানে বসে বই পড়ছে)

মীনা ঃ ও, এতক্ষণে আসা হল?

খসরু ঃ পাগলের রুমে বসে বই পড়ছেন– কতক্ষণ?

মীনা ঃ যতক্ষণই হোক– রুম তো খোলা রেখে গিয়েছিলেন।

খসরু ঃ রুম অবিশ্যি খোলাই থাকে। তবু .... মানে .... রুম খোলা ছিল নাকি?

মীনা ঃ আমি কি আপনার একান্ত কোন আপনার জন যে খোলা রুম বসে বসে পাহারা দেব?

খসরু ঃ না না, তা কেন দেবেন? তবু কেন যে দিলেন, তা–ই ভাবছি।

মীনা ঃ কোন কিছু খোয়া গেলে তো বদনাম হবে আমাদেরই। নইলে কার সাধ হয়– মিছিমিছি এরকম করে রাত জাগতে?

খসরু ঃ ঠিকই তো, সাধ করে কি এমন করে রাত জাগে কেউ?

মীনা ঃ আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আবার নিজে প্রশ্ন করছেন কেন?

খসরু ঃ উত্তর দিচ্ছি। উত্তর কখনও প্রশ্নের মতই মনে হয় কি না, তাই ....

(মীনার দৃষ্টির কঠোরতা দেখে)

যাক। ইয়ে .... মানে আমার চাচা কোথায় যান, কার সংগে কোন্ কাজের ফন্দী আঁটেন– তার খোঁজ-খবর নিতেই অনেক দেরী হয়ে গেল। এক জায়গায় খেয়ে নিলাম। তারপর আবার ঘুরাফেরা। এই ক'টা জিনিষের জন্য কত দোকান যে ঘুরঘুর করতে হয়েছে।

(হাতে তার কাগজে মোড়া কিছু চুড়ি)

মীনা ঃ কি এগুলো?

খসরু ঃ কয়েকটা কাঁচের চুড়ি — আপনার জন্য।

মীনা ঃ আমার জন্য কাঁচের চুড়ি আনার উদ্দেশ্য?

খসরু ঃ খারাপ কিছু নয়। মনে হল, নিয়ে এলাম। রোজ রোজ খালি হাতে ফিরি। .... ভাবলাম– এটা ভাল দেখাচ্ছে না .... মানে আমার দিক থেকে .... ইয়ে .... শেষে চুড়িই নিয়ে এলাম।

মীনা ঃ ভাবলেন মানে ইয়ে শেষে চুড়িই নিয়ে এলেন?

খসরু ঃ তার জন্য কত ঘুরতে হয়েছে। গায়ের রঙের সংগে চুড়ির রঙ মিলিয়ে আনতে হয় তো।

www.pathagar.com

মীনা	ঃ	পাগলামীটা দিন দিন বাড়ছে না কমছে?
খসরু	ঃ	এখানকার কাউকে বেশ কয়েকবার দেখেছি বলে স্বপ্নের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী প্রথমে বেড়ে পরে কমতে আরম্ভ করেছে।
মীনা	ঃ	তার মানে আমি পাগল, আমাকে বেশ কয়েকবার দেখেছেন, তাই স্বপ্ন অনুযায়ী পাগলামীটা কমে গেছে? কিন্তু প্রথমে বেড়েছিল কেন?
খসরু	ঃ	সব প্রশ্নের উত্তরই দিতে হবে, এমন তো কোন কথা নয়। যাক, কথাগুলো আপনার একটু ঝাল-ঝাল হলেও গায়ের রঙটা হচ্ছে গিয়ে দুধে-আলতা। তাই নীল চুড়ি আনতে হল খুঁজে খুঁজে।
মীনা	ঃ	আমাকে দেখে পাগলামী কমানোর চাইতে ঘরে বসে আয়নায় নিজের মুখ বার বার দেখলেই তো স্বপ্নের প্রেসক্রিপশান মিলে যায়!
খসরু	ঃ	সত্যিই তো। কথাটা কেন যে আমার আগে মনে পড়ে নি। আচ্ছা, আপনি আমি মিলে কয়েকবার আয়নায় নিজেদের দেখলেই তো কম সময়ে দু'জনেই ভাল হয়ে যাই!
মীনা	ঃ	পাগল হলেও সাধ আছে ষোল আনাই!
খসরু	ঃ	কখনো চাঁদের আলো কারুর সাধ বাড়িয়ে দেয় বই কি!
মীনা	ঃ	এই ক'দিন তো অমাবস্যার অন্ধকার যাচ্ছে, চাঁদের আলো পেলেন কোথায়?
খসরু	ঃ	কেন, চাঁদের অভাবে চাঁদমুখ!

(মীনা কৃত্রিম রাগে চলতে উদ্যত হয়)

এ কি! চুড়ি? চুড়ি ক'টা না নিয়েই চলে যাচ্ছেন? পাগলের এই সাধটুকু ....

মীনা	ঃ	(ফিরে তাকিয়ে) কাঁচের চুড়ি এত পাগলামোতে ভেংগে যাবে যে!
খসরু	ঃ	(কাছে এসে চুড়িগুলো দিয়ে) তবু স্মরণে বাজবে তার রিনিঝিনি সুর!

(মীনার চোখে নামে স্বপ্ন। খসরু তার হাতে গুঁজে দেয় চুড়ির বান্ডেল)

www.pathagar.com

(কোন এক কক্ষের বারান্দায় আলাপ করছে শিরীন বেগম ও মকসুদ)

শিরীন : মীনার ব্যাপারে আপনার চিন্তা-ভাবনার আধিক্যটা একটু বেশি মনে হচ্ছে মকসুদ সাহেব?

মকসুদ : শিরীন বেগমের এমনটি মনে হওয়ার কারণ?

শিরীন : আমার এ ধারণাও বেশ বদ্ধমূল যে মীনার সংগে রহমান সাহেবের সব সম্পত্তি আপনি হস্তগত করতে চান।

মকসুদ : খুব বেশি স্পষ্ট করে বলছেন মিসেস রহমান।

শিরীন : আমার পাগলামী সম্পর্কেও তো আপনি স্পষ্ট করে বলেছেন আমার স্বামীর কাছে।

মকসুদ : শুধু এটুকু বলি নি যে গোপনে রহমান সাহেবের প্রচুর টাকা হস্তগত করে শিরীন বেগম সরিয়ে রেখেছেন বিশ্বস্ত স্থানে।

শিরীন : নিজের ভবিষৎ চিন্তা আমি করব না?

মকসুদ : আপনার ভবিষৎ তো রহমান সাহেবের ভবিষ্যতের সংগে যুক্ত। আলাদা ভবিষ্যতের চিন্তা আপনার নিছক এক পাগলামী। এই পাগলামী থেকে আপনাকে বাঁচানোর লক্ষ্যেই রহমান সাহেবের কাছে ছিল আমার ওই উপদেশ।

শিরীন : (প্রায় চীৎকারে ভেংগে পড়ে) মকসুদ সাহেব!

মকসুদ : আর পাগলামী করবেন না মিসেস রহমান। যাবার আগে বলে যাই- রহমান সাহেবের সর্বস্ব আর সবকিছু রক্ষার জন্য অচিরেই প্রয়োজন হবে আমাকে।

(গট গট করে চলে যায়। আসে রহমান সাহেব)

রহমান : এই যে শিরীন, পার্টির সময় হয়ে গেল। এখনো তৈরী হও নি?

শিরীন : আমি যেতে পারব না, শরীর খারাপ।

রহমান : কিন্তু ওরা কি মনে করবেন?

শিরীন : মনে করলেও উপায় নেই। তুমি, মকসুদ, মীনা- তোমরা যাও।

রহমান : তাহলে তুমি যাচ্ছ না?

শিরীন : (হঠাৎ রাগে ভেংগে পড়ে) না!!

www.pathagar.com

(রহমান সাহেব অবাক)

(সন্ধ্যা হয়েছে মাত্র। খুব বেগে হেঁটে আসছিলেন ডাক্তার সাহেব, চোখের দৃষ্টি কিছুটা অস্বাভাবিক। তখনই অদূরে বাসের ব্রেক কসার শব্দ এবং লোকজনের হৈ চৈ। থেমে যান ডাক্তার সাহেব)

ডাক্তার : (পাশের লোককে) কি হল? মরেছে?

একজন : না, না, অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। কিন্তু এভাবে মানুষ রাস্তা পার হয়? মরবার ভয় নেই?

ডাক্তার : (উত্তেজিত কণ্ঠে) না, নেই। সবাই পাগল হয়ে যাচ্ছে। ছুটে চলেছে রিকশা- গাড়ী- বাস- ট্রাক। মানুষও যাচ্ছে তারই মধ্য দিয়ে। দেখে ঠিক মনে হবে- পাগলদের ছুটে চলার এক প্রতিযোগিতা! (হঠাৎ অল্প দূরে দেখে নিয়ে) আরে, আরে। এ কি!

(বাসের ড্রাইভারকে ধরে পথচারীরা মারছে। তখনই সেখানে হাজির হয় এসে পাগলা ভিখারী)

ভীড়ের লোক : মার, মার- শালায় মানুষ মারতে চায়।

পাগলা : থাউক থাউক, আর মাইরেন না। শেষে কিন্তু মইরাই যাইব। শালায় চায় মানুষ মারতে, আর আপনেরা চান শালারে মারতে। এইডা বুঝি মানুষ না? মানুষ না? একটা ডেরাইভার? হাঃ হাঃ হাঃ ....

(পাগলামী করে জিকির করে-)

দম্‌সে মাদার, দম্‌সে দিদার, দম্‌সে এলাহী।
অধমে ডাকে গো আল্লা, ছায়া দিবাই নি।।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ্‌!

(জিকিরের সংগে টাকার জন্য হাত পাতে)

(এসব দেখছিল ডাক্তার, কাছে আসে খসরু)

খসরু : ডাক্তার সাহেব, আপনি কি করছেন এখানে?

ডাক্তার : কিছুই করছি না, শুধু দেখছি।

www.pathagar.com

খসরু ঃ (কি ভেবে নিয়ে) আসুন আমার সংগে ওই পার্কে, আসুন- প্লিয।

(খসরুর সংগে যান ডাক্তার)

ওই নির্মম দৃশ্য দেখে দেখে আপনি উত্তেজিত হচ্ছিলেন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিল -

ডাক্তার ঃ কি মনে হচ্ছিল? পাগলের ডাক্তার নিজেই পাগল হয়ে যাচ্ছে?

খসরু ঃ না, ঠিক তা নয়। মনে হচ্ছিল — রাত-নামা এই আলো-আঁধারিতে আপনার পাশাপাশি হেঁটে যাওয়ার প্রয়োজন আছে আমার।

ডাক্তার ঃ (মৃদু হেসে) ঠিকমত কথা যোগাচ্ছে না? তার চাইতে দেখ- রাত নামছে এই মহানগরীর বুকে। চারদিকে জ্বলে উঠছে যান্ত্রিক সভ্যতার আলো। এর মধ্যে মানুষেরা হারিয়ে ফেলছে তাদের গন্তব্যের ঠিকানা। তাই সবাই ছুটাছুটি করছে শুধু। সমানে হচ্ছে এ্যাকসিডেন্ট। (ক্রম-উত্তেজিত কণ্ঠে আপন মনে) এ্যাকসিডেন্ট, ছিনতাই, রাহাজানি, সন্ত্রাস ....

খসরু ঃ ডাক্তার সা'ব।

ডাক্তার ঃ (হঠাৎ নিজেকে দমন করে) আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। ফিরে চলি আমরা—আমি আমার চেম্বারে, আর তুমি মিষ্টার রহমানের পাগলা গারদে।

খসরু ঃ পাগলা গারদে?

ডাক্তার ঃ ও বাড়ীতে যাই নি কোনদিন। তবু দূর থেকে বাড়ীটাকে দেখে মনে হয়- ওটা রহস্যভরা এক পাগলা গারদ!

(দু'জন চুপচাপ এগোয়। শুধু শোনা যায়- দু'জনের চলার শব্দ- খট্ খট্ খট্ খট্- যেন মানুষের হার্টবিট। এর মধ্যে খসরুর কানে ভেসে আসে নিজেরই নেপথ্যে কণ্ঠ-)

নেপথ্য কণ্ঠে

খসরু ঃ কলিমের কথায়ও ছিল একটা আভাস। এখন ডাক্তারও বললেন মিষ্টার রহমানের পাগলা গারদ। ব্যাপারটা কি?

(কখন ডাক্তার চলে গেছে অন্য দিকে—তা লক্ষ্যই করেনি খসরু)

www.pathagar.com

(আউট হাউসে ফিরে আসে খসরু। কলিম এসে একটা এনভেলাপ দেয় খসরুকে)

কলিম : বিকালের ডাকে আইছে।

(কলিম চলে যায়। খসরু এনভেলাপ খুলে চিঠি পড়ে। চিঠিতে ভাসে মায়ের মুখ)

আম্মা : ওরে খসরু। আমি যে আর পারছি না বাবা। তোকে ছেড়ে একা আমার দিনগুলো কিছুতেই কাটছে না রে!

(তখনই মীনা আসে)

মীনা : কার চিঠি পড়ছেন?

খসরু : আম্মার। আমাকে না দেখে আম্মা নাকি এবার সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

মীনা : একমাত্র আদুরে ছেলে যে!

খসরু : পেছনে হাত দিয়ে কি লুকোচ্ছেন?

মীনা : কিছু না।

(কিন্তু একরকম জোর করেই খসরু মীনার হাত থেকে কেড়ে নেয় একটা কাপড়ের অংশ)

খসরু : সুন্দর কাজ করা কাপড়ের ঢাকনি। নিজের হাতে করা বুঝি?

মীনা : হ্যাঁ, আপনার পানির জগটা ঢেকে রাখবেন। তাছাড়া আমার মা শিরীন বেগম আর মকসুদ সাহেব সম্পর্কে সাবধান।

(খসরুর চোখে জিজ্ঞাসা, মীনা চলে যায়)

(মীনা নিজের ঘরে যাচ্ছিল, মকসুদ এসে ডাকে–)

মকসুদ : দাঁড়াও।

মীনা : কে?

মকসুদ : আমি মকসুদ, চিনতে অসুবিধা হচ্ছে?

মীনা : পথ ছাড়ুন।

মকসুদ : মীনা, তুমি ছিলে বরফের মত শান্ত মেয়ে। কিন্তু হঠাৎ করেই দেখছি ....

মীনা : কি দেখছেন?

মকসুদ : বরফের বুকেও এসেছে চাঞ্চল্য।

www.pathagar.com

মীনা : সূর্যের আলোয় ঘুমন্ত বরফও জেগে ওঠে।

মকসুদ : তা ওঠে। কিন্তু যখন সে কূল ভাসাতে চায়, সাবধান হতে হয় তখনই।

মীনা : সাবধান হলেই কি তার প্রবাহকে ঠেকানো যায়?

মকসুদ : ঠেকাতে হলে আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যাক, অনেক কথা শিখেছ এর মধ্যে?

মীনা : অনেক দিন পর বলতে আরম্ভ করেছি তো। .... ওই যে আব্বা আসছেন, আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।

(চলে যায় মীনা। আসে রহমান সাহেব)

রহমান : এই যে মকসুদ, ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে ফেঁসেই যাব মনে হচ্ছে।

মকসুদ : আপনিই তো লোক চিনতে ভুল করে নিজেকে ফাঁসিয়ে দিলেন! এখন আর মুক্তির উপায় কি?

রহমান : একটা উপায় বের করার জন্যেই তো তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।

মকসুদ : অনেক চেষ্টা করেছি, এ ব্যাপারে আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। আমি বরং মীনার বিয়ের ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলাম।

রহমান : আচ্ছা, সেদিন কথায় কথায় শিরীন বলছিল খসরুর কথা। তুমি কি ভেবেছ কিছু?

মকসুদ : না, তেমন কিছুই ভাবি নি। তবে এটুকু বলতে পারি যে খসরু শিগগীরই বিত্তহীন হয়ে পড়ছে। ওর যথাসর্বস্ব গ্রাস করতে যাচ্ছে ওর চাচা কাজেম আলী। আচ্ছা, আমি আসি।

(চলে যায়। আসে শিরীন বেগম)

শিরীন, মীনার বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করছিলাম। মকসুদ বলল– খসরু শিগগীরই টাকাপয়সা সয়-সম্পত্তি সব কিছু হারাতে বসেছে।

শিরীন : মীনার বিয়ে তুমি খসরুর সাথে মকসুদের সাথে যার সাথে ইচ্ছা দাও। আমি বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছি। এ সময়ে বিয়ে-টিয়ের কথা তুলে আমাকে উত্যক্ত করো না। চললাম।

www.pathagar.com

(গটগট করে চলে যায়)

রহমান : আচ্ছা পাগল দেখি।

(রাত। মীনা তার কক্ষের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে– বাইরের আকাশে মেঘের আড়ালে দ্বিতীয়বার চাঁদ ঢাকা পড়ছে, আবার দৃশ্যমান হচ্ছে।.... আউট হাউসে বিছানায় শুয়ে জেগে আছে খসরু। বারান্দায় একজন মানুষের শব্দ)

খসরু : কে? বারান্দায় হাঁটছে কে?

(বারান্দায় আসে খসরু)

কলিম : আমি, কলিম।

খসরু : এত রাতে তুমি?

কলিম : ঘুমাইতেছিলেন বুঝি? কারুর কান্দন শোনেন নাই?

খসরু : কার কান্না?

কলিম : মীনা আপার।

খসরু : মীনার কান্না? ব্যাপারটা খুলে বল।

কলিম : আপা মাঝে মধ্যে কিসের স্বপ্ন দেইখ্যা কাইন্দা ওঠে। তারপর জাইগা কান্দে অনেকক্ষণ। আমার তো পাতলা ঘুম, জাইগা উঠি। লক্ষ্য করি, মীনা আপা জানলার পাশে দাঁড়াইয়া বাইরের দিকে চাইয়া থাকে।

খসরু : মাঝে মধ্যেই এমন হয়? চিকিৎসা করায় না কেন?

কলিম : কার চিকিৎসা কে করায়। এ বাড়ীতে সবাই তো রোগী। একেক জনের একেক রোগ।

(খসরু কি ভাবতে থাকে)

শুনলাম, আপনেরও পাগলামীর রোগ। তয় এত ঘুমান ক্যামনে?

খসরু : পুরোপুরি পাগল হই নি হয় তো। আচ্ছা, ঘরে যাও। বাকী রাতটা আমার জেগেই কাটবে। তারপর তো বেড়াতেই যাব।

কলিম : যাইয়েন। তয় আসমানে মেঘ, বিষ্টি হয়তো আইসা যাইব।

(চলে যায়। ভাবতে থাকে খসরু। ....আসমানে মেঘের গুড়ু গুড়ু শব্দ)

www.pathagar.com

(জোরে বাতাস বইছে। সংগে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। এর মধ্যেই পাখী ডাকে। খসরু বেড়াতে বেরিয়েছে)

খসরু : কী সুন্দর এই সকাল। মেঘলা আকাশ, গুড়ি গুড়ি বিষ্টি– তবু সুন্দর। মানুষের জীবনও যদি এমনি হত। (কাকে দেখে) কে? (কাছে গিয়ে) ডাক্তার সাহেব! ভোরে বেড়াতে এসে এখানে বসে আছেন?

ডাক্তার : হুঁম্।

খসরু : এ কি! আপনার চোখে পানি?

ডাক্তার : (কিছুটা রেগে উঠে) Who says? কে বলে আমার চোখে পানি? দেখছ না – বৃষ্টি হচ্ছে? ওই বৃষ্টির পানিই হয়তো আমার চোখে লেগেছে।

খসরু : কিন্তু আপনার গলার আওয়াজে তো আর বৃষ্টির পানি লাগে নি!

ডাক্তার : বলি, এত খবরে তোমার কি প্রয়োজন?

খসরু : ডাক্তার সাহেব, আমাকে এত পর ভাবেন কেন?

ডাক্তার : নয় তো কি আপন ভাববো? তুমি আমার একদিনের পেশেন্ট বলেই কি আপন জন হয়ে গেছ? এই দুনিয়ায় আমি একা। আমার আপন বলতে কেউ নেই। তুমি যেতে পার।

খসরু : ঠিক আছে, যাচ্ছি। (এগোয়)

ডাক্তার : শোন! .... কি মনে হয় তোমার? মনে হয়– পাগলের ডাক্তার নিজেই পাগল?

খসরু : মনে হয় .... মমতাভরা ওই বুকটিতে অগ্নিগিরির জ্বালা এমনিতেই সৃষ্টি হয় নি। কোন এক হারানো জনের উজ্জ্বল স্মৃতি ....

(ডাক্তার আহমেদ মুহূর্তে অন্য মানুষ)

ডাক্তার : ওই যে দূরের ছোট্ট বাড়ীটার সামনে একটি বাগান– অমনি এক বাগানে আমার একমাত্র মেয়ে আরা খেলে বেড়াতো। ডাক্তার এম. আহমেদের ছোট্ট মেয়ে আরা!

(ডাক্তারের চোখে ভাসে দৃশ্যঃ এক–দেড় বছরের আরা বাপকে আসতে দেখে বাপের দিকে এগিয়ে আসছে। বাপ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে)

www.pathagar.com

ডাক্তার : বাইরে থেকে এসে আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতাম। .... তারপর, মানসিক রোগ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নেবার জন্য একদিন চলে গেলাম বিদেশে। .... কিছুদিন পর খবর পেলাম .... আমার আরা হারিয়ে গেছে! আহ্, সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা! অনেক দূরের দেশ, ছুটে তো আসতে পারি না! তবু যথাশীঘ্র ফিরে এসে জানলাম– আমার স্ত্রীও মারা গেছে। আমি যা সহ্য করেছি, সে তা করতে পারে নি।

(উভয়েই চুপচাপ। শুধু শোনা যায় বাতাসের হাহাকার)

খসরু : ডাক্তার সাহেব!

ডাক্তার : তার পর থেকে এ সব চিকিৎসাই করে বেড়াচ্ছি।

খসরু : আরাকে খুঁজে পাওয়ার কোন চেষ্টাই করা হল না?

ডাক্তার : (ক্রম-উত্তেজিত কণ্ঠে) তোমরা, উন্নত আধুনিক দুনিয়ার সুসভ্য মানুষ। তোমরা চাঁদে গিয়ে হাজির হয়েছ। গ্রহ থেকে উপগ্রহে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু আমার সে-চাঁদমুখের কোন সন্ধান তোমরা পেলে না কেন? বড় তো উন্নতি করেছ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের! আমার আরা হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়ার পথ আজও বেরোয় নি কেন?

(শেষ কথাগুলো কান্নায় ডুবে ডুবে যায়)

খসরু : ডাক্তার সাহেব, ফিরে চলুন। (অন্তরংগ ভাবে ডাক্তারের হাত ধরে)

ডাক্তার : (আপন মনে) বেঁচে থাকলেও কি অবস্থায় আছে, কে জানে!

(এদিকে রহমান সাহেব কথা বলছে মীনার সংগে)

রহমান : শুনলাম, গত রাতেও তুমি কান্নাকাটি করেছ?

মীনা : আমার অত খেয়াল নেই। .... আব্বা, আমার লকেটটা আপনার কাছে ছিল, ওটা আজ পরবো।

রহমান : নেকলেসের বদলে ওই লকেটওয়ালা চেইনটা পরবে কেন?

মীনা : সব সময় নেকলেস পরতে ভাল লাগে না। আমার বান্ধবী রাণীদের বাসায় বেড়াতে যাব। তাছাড়া আম্মার দেয়া ওই লকেটটা সব সময় আপনার ড্রয়ারে না রেখে আমার কাছে

www.pathagar.com

রাখতে দেন না কেন? পরতে চাইলে বারবার আপনাকে বিরক্ত করতে হয়।

রহমান : একটা স্মৃতিজড়িত জিনিস .... মনের ভুলে কোথায় হারিয়ে ফেল, তাই দিই না আর কি।

(ড্রয়ার খুলে চেইনটা বের করে)

এই নাও।

মীনা : লকেটে আমার নামের আদ্যক্ষর হিসেবে 'আ' লিখিয়েছিলেন কেন? লেখানো উচিত ছিল 'মী'।

রহমান : (থতমত খেয়ে) এসব তোমার সেই আম্মার কান্ড। প্রথম থেকেই তিনি তোমার নাম দেন 'আমিনা'। ওই পুরনো ধরনের নাম আমিই বদলে দিই। নাম বদলাবার আগেই লকেট বানিয়ে ছিলেন তো! তাই ওতে 'আমিনা'র 'আ' লেখা রয়েছে। আচ্ছা, যেখানে যাচ্ছিলে যাও। হিসাবপত্র নিয়ে আমার পাগল হয়ে যাবার অবস্থা। আমি আমার কাজে যাই।

(চলে যায় রহমান সাহেব, তার দিকে তাকিয়ে থাকে মীনা)

(বাড়ীর বাইরে কথা বলছে কাজেম আলী ও মকসুদ)

কাজেম : (চাপা কণ্ঠে) কই যাইতাছেন মকসুদ সায়েব?

মকসুদ : নিজের চিন্তায় বড় ব্যস্ত আছি।

কাজেম : আমার চিন্তাডাও করবেন কইছিলেন।

মকসুদ : আপনার ব্যাপারে উকিলের সংগে কথাবার্তা বলে রেখেছি। কিন্তু আমার ব্যাপারটা আরও জরুরী। ওটা হয়ে গেলেই আপনার কাজে হাত দেব।

কাজেম : কইতে চাই কি– আমার কাজে হাত আগেই দিছেন তো! কিছু হাতাইয়া বেশিদিন রাইখ্যা দিলে পরে আবার ....

মকসুদ : পরেও সব ঠিক থাকবে। কথা দিলাম, খসরুর সব সম্পত্তি আপনিই পাবেন। ব্যস।

(চলে যায় মকসুদ। অবাক হয়ে ভাবতে থাকে কাজেম আলী। আসে কলিম)

www.pathagar.com

কলিম : কি অইলো চাচামিয়া? ঢাকার শহরে আইসা হালে পানি পাইতাছেন না?

কাজেম : না। কইতে পার– শুকনায় পইড়া কাব্যাইতাছি।

কলিম : কইছেন ঠিকই। শহরের ওস্তাদ গো দেইখ্যা কি মনে অয় চাচা?

কাজেম : সবেরে তো অখনও দেখি নাই, তয় মকসুদ সায়বের মত যাগো যাগো দেখতাছি– মনে অয়, মায়ের পেটের মধ্যে থনে অখনও জন্মাই নেই নাই।

কলিম : জন্ম না নিয়াই যা দেখাইতাছেন চাচা, জন্ম নিলে তো আর উপায় আছিল না।

কাজেম : কথা যা কও কলিম .... আও নাই, ভাও নাই। হেঁহ্ ....

(রাগ করে চলে যায়। খসরু আসে)

খসরু : এই যে কলিম, আসমানটা হঠাৎ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল যে!

কলিম : তুফান আইবো মনে অয়। কিন্তু সায়েব, আমার মনে অইতাছে– তুফান নাকি এই বাসার মধ্যেও আইসা গেল।

খসরু : এই বাসার মধ্যেও তুফান?

(দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে)

(আস্তে আস্তে বাতাস হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে তা জোরদার হয় প্রায়। বিধ্বস্ত অবস্থায় রহমান সাহেব মীনার রুমে এসে বলে–)

রহমান : (ভগ্নকণ্ঠে) মীনা।

মীনা : এ কি আব্বা, কি হয়েছে আপনার? চোখমুখ .... চেহারা ....

রহমান : উকিলের কাছ থেকে জানা গেছে .... আমার সর্বস্ব যেতে বসেছে। এমন কি, এ বাড়ীটাও।

মীনা : কেন আব্বা, বাড়ীটার আবার কি হল?

রহমান : তুমি বড় হছে মীনা, তোমাকে বলতে বাধা নেই। বাড়ীটা অল্প টাকায় উনসত্তরে কিনেছিলাম। এখন ধরা পড়েছে– মালিক নাম জাল করে সেই দলিল করেছিল।

মীনা : তাই নাকি? তাহলে?

www.pathagar.com

রহমান ঃ শুধু তা–ই নয়। অন্যের কাছে এ বাড়ী বিক্রী করে সে এদেশ থেকে কেটে পড়েছে। মোকদ্দমা চলছিল, কোর্টে আমার বিপক্ষ দলই ডিক্রী পাচ্ছে। মীনা, এক মিনিট। ওই মকসুদ এসেছে, আমি কিছু কথা বলে আসি।

(চলে যায় রহমান সাহেব। নির্বাক মীনাও কতক্ষণ পর পা বাড়ায়)

(বাড়ীর অন্যত্র কথা বলছে রহমান সাহেব ও মকসুদ)

রহমান ঃ মকসুদ। বাড়ীটার খবরও শুনেছ নিশ্চয়?

মকসুদ ঃ শুনেছি। কিন্তু তার চাইতেও খারাপ খবর আছে।

রহমান ঃ তাই চাইতেও খারাপ খবর?

মকসুদ ঃ আপনার স্ত্রী শিরীন বেগম চলে গেছেন।

(পাশের কোঠায় কান পেতে শোনে মীনা)

রহমান ঃ কি বলছ পাগলের মত?

মকসুদ ঃ আপনাকে সব খবর জানাবার জন্য আমার কাছে এই চিঠি দিয়ে গেছেন। (চিঠিটা বের করে) আরও লিখেছেন– বাসায় টাকাকড়ি গয়নাগাটি যা ছিল, উনিই নিয়ে গেছেন। আপনি যেন এ নিয়ে কোর্ট–কাছারি না করেন।

রহমান ঃ মকসুদ!!

মকসুদ ঃ এই বিপদে যা কিছু করতে চান, মাথা ঠিক রেখে করুন। দ্বিতীয়বার বিয়ে করাটাই আপনার ঠিক হয় নি। যাক, ওই কাজেম আলীকে আমার কিছু পরামর্শ দেবার আছে। একটু পরে আবার আসব।

(চলে যায় মকসুদ। রহমান সাহেব ভেবে পায় না– কি করবে। বাইরে ঝড়ো বাতাস। রহমান সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকে–)

রহমান ঃ মীনা! মীনা!

(মীনা আসে)

এই যে মীনা, ঝড় আসছে। আর ঝড় আসছে আমার জীবনেও। এ অবস্থায় তুই শুধু পারিস মা আমাকে বাঁচাতে।

www.pathagar.com

মীনা : আমি বাঁচাতে পারি?

রহমান : মকসুদকে তুই বিয়ে কর্।

মীনা : আব্বা!

রহমান : আমার এ সংসারের সব কিছুর পেছনে হয়তো রয়েছে ওই মকসুদ! আর এখনো মকসুদই আমাকে বাঁচাতে পারে এই চরম বিপদ থেকে। .... এ কি, উত্তর না দিয়ে কোথায় চললি? মীনা।

মীনা : (যেতে গিয়ে) আমিও একটি মানুষ আব্বা, পণ্যদ্রব্য নই!

(দ্রুত বেরিয়ে যায়)

(ঝড় আরও বাড়ে। বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ গর্জন হয়। .... মীনা এসে দাঁড়ায় আউট হাউসে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে খসরু)

খসরু : এই দুর্যোগে তুমি এখানে মীনা?

মীনা : আমাকে নিয়ে চলুন কোথাও – এখ্খুনি।

খসরু : কিন্তু কোন বন্দোবস্ত না করে কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব?

(মীনার চোখে ভাসে মকসুদের দানবীয় চেহারা, আবার তা মিলিয়ে যায়)

মীনা : আপনি তাহলে বন্দোবস্ত করতে থাকুন, আমার সময় নেই।

(ঝড়ের মধ্যেই চলে যায়)

খসরু : মীনা! মীনা!

(খসরুও বেরোয়। তখনই আসে কলিম)

কলিম : আপনে শুধু লক্ষ্য রাখেন ওই মকসুদ সায়বেরে। মীনা আপার লাইগ্যা আমি আছি।

(দ্রুত চলে যায়। রহমান সাহেবের বাড়ীর এক জায়গায় কাজেম আলীকে বলছে মকসুদ, আর কাজেম আলী অবাক বিস্ময়ে শুনছে। তাছাড়া আড়ালে লক্ষ্য করছে খসরুও)

মকসুদ : (হেসে হেসে) মিষ্টার রহমান, শিরীন বেগম আর মীনা। সত্যি করে বলতে কি– কাউকে আমি চাই না আমার জীবনে। চাই

www.pathagar.com

শুধু এই বাড়ীটা। মিষ্টার রহমানের বাড়ী আর ব্যবসাগুলোর পুরো মালিকানা, আর শিরীন বেগমের জমানো টাকা গুলো।

কাজেম : ইয়ে .... মানে .... (কিছুতেই বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে পারছে না)

মকসুদ : শিরীন বেগম পালিয়ে গেলেও আছে আমারই নিয়ন্ত্রণে। আর ওই মীনা বেচারী তো এক অবোধ শিশু মাত্র। ভয়ে পালিয়েছে। ব্যস, আমার দিক থেকে আর কিছু বলার নেই। আপনি কি যেন বলতে চেষ্টা করছেন?

কাজেম : চেষ্টা করতাছি, তয় পারতাছি না। কয়েকদিন ধইরা আপনাগো দেখতাছি— আপনেরে, রহমান সায়বেরে, বেগম সায়বেরে, আর .... ওই শিশুরে। কলিমরেও। বেশিদিন দেখলে কেরমে কেরমে মানুষ মাইনষেরে চিনে। আমাগো বেলায় হইছে উল্টা। আপনাগো কাউরে চিনতে পারতাছি না!

মকসুদ : আমাদের চরিত্রগুলোর রীতি হল– এর কোন শেষ কথা নেই! আর কথায় ও কাজে সংগতিও নেই। আমাদের যাকে যখন যে ভাবে দেখবেন– আমরা তা–ই। খুবই ব্যস্ত আছি। আসি তাহলে, গুড বাই!

(চলে যায় মকসুদ। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কাজেম আলী)

(ডাক্তারের চেম্বারে মীনা ও ডাক্তার)

ডাক্তার : যত সব ঝামেলা এসে জুটবে আমার কপালে!

মীনা : আমি কি করব এখন?

ডাক্তার : তার সমাধান কি আমাকে করতে হবে? বাপের কাছে যেতে চাও না– জোর করে বিয়ে দেবে। রাস্তায় বেরুলে গুন্ডায় ধরবে। সুতরাং আমার ঘাড়েই চাপ। কিন্তু মনে রেখো, এজন্য আমার কোন বিপদ ঘটলে, তখন কিন্তু .... হ্যাঁ। এবার শুয়ে পড়ে গে'। এই ক'দিন আর ডানে বামে তাকাবে না, শুধু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করবে! তারপর মনটা ঠিক করে আমাকে বলবে– ছেলেটিকে কোথায় পাওয়া যাবে। তারপর যথাস্থানে পথের আপদ আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব। এখন ওই রুমে যাও।

www.pathagar.com

(মীনা পাশের কোঠায় যায়)

(কলিম রহমান সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকছে মাত্র, তখনই খসরু আসে ব্যস্ত হয়ে)

খসরু : কলিম, যেখানেই গেছে মীনা, নিরাপদ আছে তো?

কলিম : পুরাপুরি নিরাপদ।

খসরু : কিন্তু এদিকে রহমান সাহেব অজ্ঞান হয়ে গেছেন! তুমি গিয়ে কোন ডাক্তার নিয়ে এস। এখ্‌খুনি। ডাক্তার আনতেই আমি যাচ্ছিলাম।

কলিম : আপনে কোন্ ডাক্তার আনতে কোন্ ডাক্তার নিয়া আইবেন। আমিই যাই।

(কলিম বাইরে চলে যায়, খসরু ভেতরে)

(যে রুমে মীনা ঢুকেছে তাতে ডাক্তার ঢুকেই বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন-)

ডাক্তার : এই মেয়ে, ওই ফটোটাকে কি করছ? কোথায় পেলে এটা?

মীনা : আপনার অগোছালো জিনিসপত্র কিছুটা গোছাতে গিয়ে এটা পেলাম। চেহারা দেখে মনে হয়—আমারই ছোট বোন!

ডাক্তার : থাক থাক, আর জড়াতে হবে না আমাকে। ফটোটা যথাস্থানে রেখে দাও। সাবধান- যেন নষ্ট না হয়!

মীনা : ওর গলায় চেনটার লকেটে দেখছি 'আ' খোদাই করা! ঠিক আমার এই লকেটটার মত। এই দেখুন!

(নিজেই লকেটটা বাড়িয়ে দেয় ডাক্তারের হাতে। দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকান ডাক্তার সাহেব)

ডাক্তার : হুঁম্, এক রকমই বটে!

(বাইরে কলিমের গলা শোনা যায়)

নেপথ্যে

কলিম : ডাক্তার সায়েব।

ডাক্তার : কে? এই ভোর রাতে কে ডাকে?

www.pathagar.com

(ডাক্তার সাহেব রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখেন–
কলিম দাঁড়িয়ে)

কি ব্যাপার?

কলিম : আমার সায়েব .... ওই রহমান সায়েব অজ্ঞান অইয়া গেছেন। দয়া কইরা একটু চলেন ডাক্তার সায়েব।

ডাক্তার : সবার ঝামেলা মেটাতে ডাক পড়বে শুধু আমার? আমার কি কোন সমস্যা নেই?

কলিম : আসেন ডাক্তার সায়েব!

ডাক্তার : আসেন না, বল যান। এখানে মীনা নামে একটি মেয়ে আছে, আমি ফিরে না–আসা পর্যন্ত বসে বসে পাহারা দেবে– হ্যাঁ!

(ব্যাগে কিছু যন্ত্রপাতি ভরতে থাকেন, তারপর বেরিয়ে যান।
কলিম ছটফট করছে)

কলিম : আমি পড়লাম এক মহা বিপদে। এইন্দ্যা মীনা আপা পাগল ডাক্তারের রুমে আটকা, হেইন্দ্যা রহমান সায়েব অজ্ঞান! এইখানেও থাকনের দরকার, হেইখানেও যাওনের দরকার। দুইডা কাম এক সংগে করি ক্যামনে?!

(রহমান সাহেবের রুমের বারান্দা। অপেক্ষা করছে খসরু।
ঢোকেন ডাক্তার সাহেব)

খসরু : ডাক্তার সায়েব এলেন? বাঁচলাম। বাড়ীতে আর কেউ নেই, রহমান সায়েব অজ্ঞানের মত পড়ে আছেন।

ডাক্তার : এক পাগলকে একলা ফেলে অন্য পাগলেরা পালিয়েছে? রহমান সায়েব কেমন এখন?

খসরু : একটা নাটকের শেষ দৃশ্য উন্মোচন করে এখন হয়তো একটু ঘুমুচ্ছেন।

ডাক্তার : শেষ দৃশ্যের বক্তব্য?

www.pathagar.com

খসরু ঃ মীনা রহমান সায়েবের নিজের মেয়ে নয়, এক কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে।

ডাক্তার ঃ (কণ্ঠে ঔৎসুক্য) কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে?

খসরু ঃ আরা নামের একটি বাচ্চা মেয়েকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করেন রহমান সায়বের প্রথমা স্ত্রী।

(পকেট থেকে লকেটটা বের করে দেখেন ডাক্তার)

ডাক্তার ঃ মেয়েটির নাম ছিল আরা? তুমিও পাগল হয়ে যাও নি তো খসরু?

(ডাক্তারের কণ্ঠে এক বিচিত্র হাসি, হাতে লকেট, চোখে অশ্রু। অশ্রুভরা চোখে লকেটটার দিকে তাকিয়ে আছে ডাক্তার)

(খসরুদের গাঁয়ের বাড়ীতে বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছে খসরুর আম্মা)

আম্মা ঃ আর পারছি না বাবা, খসরুর জন্যে আমার মন খুবই বেচইন!

বৃদ্ধ ঃ তবু মনটাকে শান্ত করতে হবে মা খবর পেয়েছি, ওরা ভাল আছে। তাছাড়া .... জান মা, আজ ফজরের নামাজের পর কালামে পাক তেলাওয়াত করছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে– শিগগীরই পাবে খসরুর শুভ সংবাদ। (মিষ্টি করে হাসেন) মনটাকে শান্ত করে কিছুটা অপেক্ষা কর মা। সব পাগলামী সেরে যাবে।

(রহমান সাহেবের রুমে ডাক্তার ও খসরু। বিছানায় শায়িত রহমান সাহেব। ডাক্তার যেন আবেগে আত্মহারা)

ডাক্তার ঃ এই মুহূর্তে আমি যে ভেসে চললাম দুই বিপরীত স্রোতের সর্বগ্রাসী টানে! এক স্রোত প্রবল প্রতিশোধ বাসনার, অন্য স্রোত বুক উজাড় করা আনন্দের!

www.pathagar.com

খসরু : এসব কি বলছেন ডাক্তার সায়েব?

ডাক্তার : খসরু, ওই মীনাই যে আমার হারানো মেয়ে আরা!

খসরু : আপনার হারানো মেয়ে ওই মীনা?

ডাক্তার : পাগলদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আমারই আশ্রয়ে ঠাঁই নিয়েছে। বিশ্রাম নিচ্ছে এখন এই পাগলের ডাক্তার যে পাগল– তারই বাসায়! হাঃ হাঃ হাঃ .... খসরু, খসরু, যদি অন্তরের নির্দেশ পাও, তাহলে নিজে গিয়ে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস আমার আরাকে । ..... এখনও শান্ত ভোর। পাগলের ডাক্তার এখনও পাগল হতে আরম্ভ করে নি! যাও, দেরী করো না। এর পরেই জেগে উঠবে পাগলের এই মহানগরী! আবার জোরে বইতে আরম্ভ করবে এক অশান্ত বায়ু! উনপঞ্চাশ বায়ু!

(খসরু বেরিয়ে যায়। দেখতে থাকেন আবেগোদ্বেলিত ডাক্তার, মুখে হাসি। তাঁর দৃষ্টিতে ভাসে মীনা ও খসরুর আনন্দঘন সাক্ষাতের দৃশ্য)

www.pathagar.com

নদীতে নাইয়রী নাও

চরিত্র-লিপি

রাশেদ সিন্‌হা
বেগম সাহেবা
ডাক্তার মৃধা
আতাহার আলী
নঈম সিন্‌হা
সীমা
আবু লায়েস সিদ্দিকী
পাগলাটে বৃদ্ধ
করিম
মিনুর মা
মিনু
সহচর
তানবীর
আবিদ
হান্না
লিসা
রুবি

www.pathagar.com

(বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক রাশেদ সিনহার বাড়ীর একতলার ড্রইংরুম। সুসজ্জিত ড্রইংরুমের পেছনের দেয়ালের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে সিঁড়ি। — তখন সকাল। চাকর–বাকরেরা নীরবে এটা–ওটা ঠিকঠাক করে রাখছে, আবার কেউ ওপরেও চলে যাচ্ছে। মিনু নামের একটি ছেলে ফুল সাজিয়ে রাখছে এখানে–ওখানে। তখনই দ্রুতপায় নীচে নেমে আসছে ভার্সিটির ছাত্র নঈম, দুরন্ত স্বভাবের আজকের সাধারণ পরিচ্ছদ পরিহিত তরুণ। নামবার সময় সিঁড়ির বাঁকে রাখা পিতলের টব নঈমের পায়ে লেগে ছিটকে পড়ে, শব্দ হয়। নঈমের পেছনে পেছনে আসে পৌঢ় আতাহার খান)

আতাহার : আহা, একটু দেখে শুনে চলতে হয় নঈম। আরেকটু ধীরে সুস্থে চললে ....

(এর মধ্যে চাকর টবটা যথাস্থানে সাজাতে থাকে। মিনু গিয়ে ফুলগুলো সাজিয়ে রাখতে থাকে)

নঈম : হোয়াট? ধীরে সুস্থে চলব আমি? এ কথা ভাবতে পারলে কি করে মাই ডিয়ার আতাহার ভাই? ফাস্ট লাইফ, বুঝলে, আই ওয়ান্ট ফাস্ট লাইফ। দুরন্তগতি জীবন চাই। চলতে গিয়ে হাত–পায়ের ধাক্কা লেগে কোথায় কি পড়ে গেল, সেটা দেখবে তুমি– এ বাড়ীর ম্যানেজার–কাম–গার্ডিয়ান আতাহার আলী খান! আমি চললাম।

(যেতে পা বাড়ায়)

আতাহার : শোন নঈম, সাহেব গত রাতেই বিদেশ ঘুরে ফিরলেন। হয়তো তোমার সঙ্গে আলাপ করে জানতে চাইবেন– অনার্স পরীক্ষার প্রিপ্যারেশন কেমন চলছে!

নঈম : আমার এ্যাবসেন্সে উত্তরটা ম্যানেজ করবে তুমি। বলবে জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছে নঈম। গেছে .... ইয়ে .... মানে প্রফেস্যরের কাছে।

আতাহার : এই সামান্য ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলতে বলছ?

নঈম : তাহলে মিথ্যা কি শুধু অসামান্য ব্যাপারেই বলবে? যাক, ডিপার্টমেন্টেও এক-বার যেতে পারি। তাই তোমাকে ডাহা মিথ্যা বলতে হবে না। .... খান সাহেব, আজকাল কমবেশি মিথ্যা বলছে না কে?

www.pathagar.com

আতাহার : ওসব কথা রাখ। বলছি– দেখা করে গেলে এমন কি ক্ষতি হত?

নঈম : এমন ক্ষতিও আছে যা এই বয়সে তুমি আর বুঝতে পারবে না। শোন মিস্টার আতাহার ভাই– মাই ফাদার, দ্যাট গ্রেট ম্যান রাশেদ সিনহা মানে রাশেদ সিংহ– একেবারেই সিংহপুরুষ। অবিশ্যি আমার বয়সে ছিলেন খুবই সাধারণ– বাট টুডে? এ গ্রেট পারসোন্যালিটি। তাঁর সামনে পড়তে আমি কিছুটা আন–ইযি ফিল করি। এ কথাটাও তুমি তাঁকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলো। ব্যস, হয়ে গেল!

আতাহার : সত্যিই তুমি দুরন্ত হয়ে পড়ছ নঈম।

নঈম : হাঃ হাঃ হাঃ ... ফাদার রাশেদ সিনহা জেট সওয়ারী হয়ে প্রায় শব্দের গতিতে চষে বেড়ান সারাটা বিশ্ব। আন্তর্জাতিক বিজ্‌নেস্‌ম্যান। অবিশ্যি দুষ্ট লোকেরা বলে চোরাচালানী চক্রের শক্তিশালী সদস্য অর্থাৎ এ গ্রেট চিট!

আতাহার : সম্মানের সঙ্গে কথা বল নঈম। তিনি তোমার গুরুজন!

নঈম : (পরিহাসের কণ্ঠে) গুরুজন! আজকের দিনে ওই ব্যাকডেটেড কথাটা ভুলে যাও মিস্টার আতাহার ভাই। তাছাড়া, গুরুজনেরও গুরুজন হয়ে চলতে হয়, তার গুরুত্বটা বুঝতে হয়। যাক, জেট সওয়ারীর ছেলে হয়ে আমি হব না সাইমুম ঝড়? সিংহশাবক তো আর মিউ মিউ বেড়াল হতে পারে না! জেনে রাখ, আজকের এই নঈম সিনহাই ভবিষ্যতের বিখ্যাত এক আন্তর্জাতিক মানি–মেকার এ্যান্ড্‌ ....

আতাহার : ঠিক আছে, তা না হয় হলে। কিন্তু আজ বাড়ী থেকে বেরুবার আগে অসুস্থ মা–কে একবার দেখে গেছ?

নঈম : (অবাক হয়ে) তুমি বলছ এ কথা? .... না, দেখে যাই নি। মাই ফাদার চান না– সংসারের ওসব ঝামেলায় জড়িয়ে আমার কেরিয়ার নষ্ট করি। অসুস্থ মাম্মির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এক পৃথক বাসস্থান– এই প্যালেসের এক প্রান্তে। আমি নাম দিয়েছি মাতৃ–মহল। (পরিহাসের কণ্ঠে) বেরুবার সময় দূর থেকে দেখলাম– ওই পিকিউলিয়ার ডাক্তার মৃধা মাম্মির চিকিৎসার জন্য সে মহলে ঢুকছেন!

www.pathagar.com

(নঈমের চোখে ভাসে একটা সাধারণ বাস-কক্ষ। সেখানে বিছানায় অর্ধশায়িতা বেগম সাহেবা- চল্লিশোর্ধ বয়সের এক ভগ্নস্বাস্থ্য মা। পাশে মাঝ বয়সী পরিচারিকা মিনুর মা। পৌঢ় ডাক্তার মৃধা ইনজেকশন দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। কিন্তু বেগম সাহেবার চোখে ইনজেকশনের সিরিঞ্জটাকে প্রাণঘাতী এক সূক্ষ্ম অস্ত্র বলে ধরা পড়ছে। তাই দৃষ্টিতে সকরুণ মিনতি এনে বলছেন-)

বেগম সাহেবা : না ডাক্তার, না! ওটা দিয়ে আমাকে মেরে ফেলবেন না!

(ডাক্তারের মুখে মৃদু স্নিগ্ধ হাসি, দৃষ্টিতে অপার মমতা)

ডাক্তার : বেগম সাহেবা, এতে ভয়ের কিছু নেই। আপনার কোন ক্ষতি করতে আমি এখানে আসি না! (আরও নিম্ন কণ্ঠে) আমি এখানে আসি আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে।

বেগম সাহেবা : সত্যি ডাক্তার, সত্যি?

ডাক্তার : আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা : আপনি কে?

ডাক্তার : (নিম্ন কণ্ঠে) আপনার একান্ত হিতাকাঙ্খী এক ডাক্তার।

(দু'জন দু'জনের দৃষ্টিতে কি যেন খোঁজে)

বেগম সাহেবা : আমার ছেলে নঈমের চিকিৎসাও করেন আপনি?

(ডাক্তার নীরব। তার চোখে ভাসে নঈমের মুখ)

নঈম : জানি না কি চিকিৎসা চলছে সেখানে- জীবনের না মৃত্যুর! কিন্তু মাম্মির কথা তুলে তুমি আমার সকালের মূডটাই নষ্ট করে দিলে আতাহার ভাই!

আতাহার : কিসে যে তোমার মুড নষ্ট হয়, আর কিসে হয় তুষ্ট, তা-ই বুঝা মুস্কিল!

নঈম : মাই ফাদার দু'নম্বর ব্যবসায়ের ধান্ধায় বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মাম্মি কেন জানি না স্মৃতি-সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথক বাসস্থানে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন, বিচিত্র ধরণের তোমরা কিছু লোক এ পরিবারের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে। (হঠাৎ নাটকীয় কণ্ঠে) এ বাড়ীর গোলকধাঁধায় না ঢুকে মুক্তপক্ষ আমি নঈম সিনহা ফ্রি লাইফ লিড্ করে সশব্দে স্বেচ্ছাজীবনে বেঁচে থাকতে চাই! বেঁচে থাকতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই! তারই জন্যে হতে চাই ডেসপ্যারেট, বেপরোয়া,

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাচারী। কেউ কেউ বলে– রুথ্‌লেস। হয়তো রুট্‌লেস বলেই! সুতরাং টা টা ....

(দ্রুতপায় বেরিয়ে যায়। আতাহার যায় পেছনে পেছনে)

(গাড়ী বারান্দায় একজন ভগ্নস্বাস্থ্য পাগলাটে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। নঈম তাকে একবার দেখে নিয়ে গাড়ীতে বসে গাড়ী চালিয়ে চলে যায়। আতাহার এসে বৃদ্ধের কাছে দাঁড়াতেই বৃদ্ধটি নীরবে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয়। তার দিকে তাকিয়েই আতাহার চমকে ওঠে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে বৃদ্ধের হাতে দেয়)

আতাহার ঃ মনে হয় আপনাকে আমি চিনি। এখানে–সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখেছি। হয়তো কোন অজানা উদ্দেশ্য নিয়েই ঘোরেন। যাক, কিছু বেশি করে টাকা দিলাম। এ বাড়ীতে আর আসবেন না। যান, এখ্‌খুনি কেটে পড়ুন।

পাগলাটে বৃদ্ধ ঃ পেটে ক্ষিধা, মনে জ্বালা। বাড়ীর সায়বের সাথে দেখা হইলে বোধ হয় আরও বেশি পাইতাম?

আতাহার ঃ না, কঠিন বিপদে পড়তেন। যান, চলে যান।

(আতাহারের দৃঢ়কণ্ঠ নির্দেশে বৃদ্ধটি চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। তখনও আতাহার তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আছে। চলে যায় বৃদ্ধ। এতক্ষণ আতাহারের কানে ভেসে আসে নানা তারযন্ত্রের এলামেলো সুর। ভেতরে যায় আতাহার)

(বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক জায়গায় জমায়েত হয়ে হাসাহাসি করছে তানবীর, আবিদ ও হান্না। হঠাৎই সেখানে দ্রুত টার্ন নিয়ে দাঁড়ায় এসে নঈমের গাড়ী। হৈ চৈ করে ওঠে তিনজনই। গাড়ী থেকে নেমে আসে নঈম)

তিনজন ঃ হাই নঈম!!

নঈম ঃ হাই ফ্রেন্ডস্‌!

(নঈম তিনজনের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে অদূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে লিসা ও রুবী, আর আড় চোখে তাকাচ্ছে এদের দিকে)

www.pathagar.com

নঈম : এখানে দাঁড়িয়ে চেনাজানাদের সঙ্গে কি অর্থহীন ফিল্‌ডিং করছিস! শুধু সময় নষ্ট।

তানবীর : সময় কিছুটা নষ্ট হলেও জেনে নিচ্ছি– আর কারও সঙ্গে wrong আছে কিনা!

নঈম : Wrong করা কি তোদের সঙ্গেই রিজার্ভ করে রেখেছে নাকি? নিয়ে চল্‌, পার্কে কোথাও গিয়ে বসি।

(নঈমের হাতের ইশারায় লিসা–রুবী এগিয়ে আসে)

তানবীর : শোন লিসা, এতক্ষণ দু'জন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে, অথচ আমরা এখানে তোমাদের মিস্‌ করছি সিরিয়াসলি!

হান্না : কান ছিল খাড়া, অথচ ভেসে এল না কোন ললিত লাস্যের লহরী!

লিসা : বেঙ্গলি উপন্যাস থেকে খুঁজে পেয়েছ বুঝি ওসব শব্দ–গুচ্ছ?

রুবি : আর তা–ই আওড়াচ্ছ নিজের করে? সিলি!

নঈম : চল, পার্কে যাওয়া যাক।

(নঈমের গাড়ীতে গিয়ে বসে সবাই। গাড়ী ছুটে চলে। .... মিনু পার্কের কাছে ফুল নিয়ে পথ চলতে দেখে সেই পাগলাটে বৃদ্ধটিও আনমনে পার্কের এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। .... পার্কের এক নির্জনে এসে দাঁড়ায় ও বসে ওরা পাঁচজন)

তানবীর : প্রেমের কথা উঠলই যখন, তখন আমাকে বলতেই হচ্ছেঃ নিখাদ সোনার মত নিখাদ প্রেমও কোন কাজে আসে না লিসা!

লিসা : কিন্তু জান তো তানবীর, খাদ বেশি মেশালে সোনা আর সোনা থাকে না, হয়ে যায় গিল্‌টি? আবিদ সাহেব কি বল?

আবিদ : তত্ত্বকথায় আমার ব্রেন তেমন খোলে না। প্রেমের কথা শুনলেই মনে হয়– গায়ে যেন কে কাতুকুতু দিচ্ছে!

(সবাই হেসে ওঠে)

তার চাইতে এই তো বেশ আছি! কোকিল যদি কোথাও ডেকে ওঠেই, আরও কিছুটা অন্তরঙ্গ হতে বাধা কোথায়?

রুবি : বাধা কোথাও নেই। দিলকে দরিয়া করলে তাতে অনায়াসেই ভাসানো যায় সপ্তডিঙা মধুকর। তবে বিপদ শুধু অথৈ সাগরে ঝড় উঠলে!

(আবার সবাই হেসে ওঠে)

www.pathagar.com

নঈম : তোমরা কথাবার্তা বল, আমি ওদিকটায় যাচ্ছি।

(নঈম চলে যায়)

হান্না : অর্থাৎ ভার্সিটির সঙ্গীত-শিল্পী সীমা এসে গেছে ওখানে।

(আবার সকলের অকারণ হাসি। .... পার্কের অন্যত্র সীমার কাছে নঈম এসে দাঁড়ায়)

সীমা : ওরা এত হাসাহাসি করছে কেন?

নঈম : কথা বলছে আর অকারণেই হাসছে। কথা তো নয়, অর্থহীন কিছু কথার ফানুস উড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। যা উচ্চারণ করছে, তাকে সত্য বলে জানেও না, মানেও না।

সীমা : তাই নাকি? সব কিছু অকারণে?

নঈম : ওদের জীবনের জিজ্ঞাসা বলতে কিছু নেই। তাই ওরা কাব্য করে কথা বলে, অকারণে হাসে। লিসা-রুবিদের শ্যাম্পু-করা চুল অকারণেই বুকের প্রান্তে এসে ভেঙে ভেঙে পড়ে। ঠিক এখন যেমন পড়েছে তোমার চুল!

সীমা : (নিম্ন অর্থপূর্ণ কণ্ঠে) তোমার এ কথাও কি অকারণে?

(মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে যায় নঈম)

কি হল নঈম?

নঈম : এখানে আসতে আসতে দেখলাম- তোমার হাসিমুখে লেগে আছে যেন মেঘের ছোঁয়া! এখন দেখছি রোদের ঝিলিক। অকারণে?

সীমা : তোমার মত আমারও মনে চলছে মেঘরৌদ্রের খেলা। চোখে মুখে তারই প্রকাশ! আসবার সময় শুনে এলাম সংসারের অভাব-অনটনের কথা। আমার মায়ের কত যে দুশ্চিন্তা!

নঈম : (বিষণ্ন কণ্ঠে) মা! আসবার সময় আতাহারও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল মাম্মির কথা! (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) চল আমার সঙ্গে।

(সীমার হাত ধরে চলতে থাকে নঈম)

(রাশেদ সিনহার ড্রইং রুমে কথা বলছে আতাহার ও ডাক্তার মৃধা)

আতাহার : নঈমটা একেবারেই বেসামাল হয়ে উঠেছে। মুস্কিলে পড়েছি আমি। একদিকে মালিকের বারমেসে রুগ্না স্ত্রী, অন্যদিকে এই

www.pathagar.com

নঈম। এদের দেখাশুনার নামে গোটা পরিবারের তাবেদারি করাই আমার দায়িত্ব– ম্যানেজার–কাম–গার্ডিয়ান। (চাপা উত্তেজনায়) আমি আর পারি না ডাক্তার, আমি চাই মুক্তি! কিন্তু আমাকে যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে এক সর্বগ্রাসী অক্টোপাসের বন্ধন!

ডাক্তার : বন্ধনটা কি খুবই অসনীয় লাগছে আতাহার খান?

আতাহার : ডাক্তার মৃধা, এতদিন ধরে এ বাড়ীতে একসঙ্গেই দায়িত্ব পালন করছি যখন, তখন আমার এই বন্ধন সম্পর্কে তুমি কিছু কিছু জান আর বোঝ নিশ্চয়ই!

ডাক্তার : ততটুকু, যতটুকু আমার বন্ধন সম্পর্কে জান আর বোঝ তুমি।

আতাহার : তাতে আমার সম্পর্কে কি মনে হয় তোমার?

ডাক্তার : মনে হয় – এ পরিবারের এমন কিছু কাজের সঙ্গে এতটা জড়িয়ে আছ যার পরিণামে মুক্তি চাইলেও তা তুমি কিছুতেই পাবে না।

(আতাহারের চোখে ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ের ঝিলিক। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে দেখে– ডাক্তারের মুখে মৃদু হাসির রেখা। আতাহার দৃষ্টি ফেরায়। তার সামনে ভেসে ওঠে এক অস্পষ্ট দৃশ্যঃ আলো–আঁধারির অস্পষ্টতায় আতাহারের মতই একটি লোক একটি মৃতদেহ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে যাচ্ছে আর একটি পুরুষ, কিন্তু কাউকেই চেনা যায় না। ক্ষণপরেই সে–দৃশ্য মিলিয়ে যায়। ...... আতাহার আবার তাকায় ডাক্তারের দিকে। ডাক্তারের মুখে আগের মতই মৃদু হাসি)

ডাক্তার : আতাহার খান আজ নিরুপায়!

আতাহার : আমার এ অবস্থা নিয়ে হাসতে চেষ্টা করো না ডাক্তার। তুমিও কি পার পারিবারিক চিকিৎসকের এই রহস্যময় চাকরিটা ইচ্ছামতই ছেড়ে দিতে?

(এবার ডাক্তারেরও ভাবান্তর হয়)

ডাক্তার : না, পারি না। আমিও যে অনেক জড়িয়ে গেছি! তবে আতাহার খানের সঙ্গে এই ডাক্তারটির বন্দী হওয়ার প্রক্রিয়ায় একটা পার্থক্য আছে।

আতাহার : আছে নাকি ডাক্তার?

www.pathagar.com

ডাক্তার ঃ বিষবৃক্ষ রোপিত হয় যখন, তখন থেকেই রাশেদ সিনহার পাশে ছায়ার মত ছিলেন আতাহার খান!

আতাহার ঃ ছিলেন, অনিচ্ছায়, বাধ্য হয়ে। অতঃপর?

ডাক্তার ঃ অতঃপর সিনহার বেষ্টনী মঞ্চে এই ডাক্তারের আবির্ভাব বেশ কিছুদিন পরে- মোকদ্দমাটা যখন চরম বিপদের সঙ্কেত দিচ্ছে!

আতাহার ঃ থামলে কেন, বলে যাও।

ডাক্তার ঃ রোজগার ভাল ছিল না। তোমাকে দিয়ে একদিন রাশেদ সিনহা ডেকে পাঠালেন। বেগম সাহেবার জন্য একজন রেগুলার চিকিৎসক তাঁর চাই। টাকার পরিমাণ শুনে আর কি মনে করে যেন রাজী হয়ে গেলাম। সে-টাকায় আমার পরিবার ভালই চলছে।

(ডাক্তারের চোখে ভাসে বিছানায় বসে থাকা কয়েক বছর আগেকার বেগম সাহেবাকে। পাশে মিনুর মা। সেদিনকার আরও কম বয়সের ডাক্তার কথা বলছে বেগম সাহেবার সঙ্গে)

ডাক্তার ঃ আমাকে আপনার চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?

(ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকান বেগম সাহেবা। মাথা নাড়েন। ডাক্তার মিনুর মা'র কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে-)

বেশ কিছু ওষুধ খাওয়ানোর পর বেগম সাহেবার স্মরণ-শক্তির অবনতি হয়েছে?

(এদিক ওদিক দেখে নিয়ে নীরবে সায় দেয় মিনুর মা)

\- আমিই এখন থেকে বেগম সাহেবার চিকিৎসা করব। তোমার নাম কি?

মিনুর মা ঃ মিনুর মা কইয়াই ডাইকেন।

(ডাক্তারের দৃষ্টি থেকে সে-দৃশ্য মিলিয়ে যায়। বর্তমানে ফিরে এসে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডাক্তার বলে-)

ডাক্তার ঃ বলা যায়- শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায়ই বন্দী হয়েছি খাঁচায়! অদ্ভুত এক দায়িত্বে নিয়োজিত হলাম। বিকৃত মস্তিষ্ক রুগীর চিকিৎসা চলবে দিনের পর দিন। সুস্থও হবেন না রুগী,

www.pathagar.com

ঢলেও পড়বেন না মৃত্যুর কোলে। অদ্ভুত এক চিকিৎসা! আগের ডাক্তারের হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় সে-দায়িত্ব পেলাম আমি।

আতাহার : দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হলে যখন, তখনও খাঁচার দুয়ার পুরোপুরি বন্ধ হয় নি! থেকে গেলে কেন?

ডাক্তার : হয়তো রাশেদ সিনহার ভয়ে, হয়তো অন্য কোন কারণে।

আতাহার : বেগম সাহেবা আজ কেমন আছেন?

ডাক্তার : মিনুর মা বলল- হঠাৎ করেই কথা বলছেন একটু বেশি। এলোমেলো খাপছাড়া সব কথা।

আতাহার : (হঠাৎ সিরিয়াস কণ্ঠে) ডাক্তার, যেসব বিশেষ ওষুধ সাহেব কাল রাতেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন —

ডাক্তার : এ খবরটাও তুমি পেয়ে গেছ আতাহার?

আতাহার : আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা যথেষ্ট অস্পষ্ট। যাক, তা ব্যবহার করার আগে আমাকে অবশ্যই জানাবে।

(ডাক্তারের দৃষ্টিতে বিস্ময়। তখনই ফোন বেজে ওঠে)

ডাক্তার : ফোন ধর।

আতাহার : (ফোন উঠিয়ে) হ্যালো। .... জ্বি স্যার। ডাক্তার মৃধা এখানেই আছেন। .... জ্বি, বেগম সাহেবাকে দেখেই এসেছেন এখানে। .... আচ্ছা স্যার, আমি তাকে অপেক্ষা করতে বলছি।

(ফোন রেখে দেয়)

সাহেব আসছেন। তোমাকে অপেক্ষা করতে বললেন।

ডাক্তার : সাহেবের মনের অবস্থাটা কেমন বুঝলে? মানে আগের চেয়ে সদয় হয়েছেন অথবা ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন?

আতাহার : মনটাকে সান্ত্বনা দিতে চাও? দু'টোই বেড়েছে।

ডাক্তার : দু'টোই বেড়েছে মানে?

আতাহার : ভয়ঙ্কর রূপটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই সদয় ব্যবহারের প্রয়োজন।

(সিঁড়িতে পদক্ষেপের শব্দ)

আসছেন। কথা বলো খুব সাবধানে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন রাশেদ সিনহা। বয়স আতাহার ও ডাক্তারের চাইতে কিছুটা কম। রাশভারী লোক-কখনো ইচ্ছে করেই খুব সদয়ভাবে কথা বলেন, কখনো হয়ে যান খুবই শীতল কণ্ঠ)

www.pathagar.com

রাশেদ : ওপরের স্পেশ্যাল টেলিফোনটা ডিসটার্ব করছে আতাহার।

আতাহার : এক্সচেঞ্জে আমি এখ্খুনি ফোন করছি স্যার।

(আতাহার ওপরে চলে যায়। রাশেদ সিনহাকে ফোনে ডায়াল ঘোরাতে দেখে ডাক্তারও বাইরে যায়)

রাশেদ : হ্যালো! আবু লায়েস সিদ্দিকী আছেন? .... বেরিয়ে গেছেন? আমি রাশেদ সিনহা বলছি। .... আচ্ছা, ফিরে এলে বলবেন– আমি ফোন করেছিলাম।

(ফোন রাখেন। তখনই রুমে ঢোকে আবু লায়েস সিদ্দিকী। মধ্যবয়সী, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন রাশেদ সিনহা)

এই যে সিদ্দিকী সাহেব! আমি এইমাত্র আপনাকে ফোন করেছিলাম।

(দু'জনই সোফায় বসেন)

সিদ্দিকী : সকালেই জেনেছি– আপনি এসে গেছেন।

রাশেদ : তারপর? 'মজলিস–এ–মাহবুব–এ–এলাহী' প্রোজেক্টটা কেমন চলছে?

সিদ্দিকী : ভালই। তবে ধর্মপ্রাণ মানুষদের নিয়ে এই প্রোজেক্ট– খুবই ডেলিকেট ব্যাপার। ভয় আছে– প্রোজেক্টটাকে কখন না মানুষে সন্দেহ করে বসে!

রাশেদ : হ্যাঁ, স্ত্রী–পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে বিদেশের মাজারে পাঠাতে হয়– ভুল বোঝার ভয় তো আছেই!

সিদ্দিকী : আপনি কি দুবাই হয়ে ফিরেছেন?

রাশেদ : জ্বি। ওই ডিলটা সম্পর্কে সব কিছু প্রায় ফাইনেলাইয্ করে এসেছি। শুধু ফরম্যালিটি বাকি। ওই পক্ষ থেকে লোকও এসেছে। একই প্লেনে এলাম। হোটেল রাহ্গীরে উঠেছে।

সিদ্দিকী : আমাদের পার্সেন্টেজ?

রাশেদ : আগের মতই।

সিদ্দিকী : ফাইন। তাহলে স্যার ...

রাশেদ : বিদেশী মেহমান, একটা কালচারাল ইভনিং–এর মাধ্যমে আমরা তাঁকে রিসিভ করতে চাই। তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকেই!

সিদ্দিকী : করব স্যার!

www.pathagar.com

রাশেদ ঃ মেহমানের খুশী হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। দেখবেন, ফাংশানটা যেন সর্বরকমে সাকসেসফুল হয়।

সিদ্দিকী ঃ আমার খেয়াল থাকবে স্যার।

(দু'জন উঠে দাঁড়ায়। সালাম জানিয়ে চলে যায় সিদ্দিকী। গম্ভীর হয়ে ওঠেন রাশেদ সিনহা। দু'দিক থেকে আসে আতাহার ও ডাক্তার)

আতাহার ঃ টেলিফোনের লাইনম্যান আসবে স্যার।

(বলে আবার চলে যায় বাইরে)

রাশেদ ঃ আপনার রুগীর অবস্থা কি ডাক্তার?

ডাক্তার ঃ আজ হঠাৎ কিছুটা এ্যাগ্রাভেট করেছে।

রাশেদ ঃ (ভ্রূ কুঁচকে ওঠে) কারণ? বেশি কথা বলছেন?

ডাক্তার ঃ কিছুটা। খাপছাড়া সব কথা।

(চোখের দৃষ্টিতে তীব্রতা বাড়ে। জানালার কাছে গিয়ে বলতে থাকেন—)

রাশেদ ঃ খাপছাড়া কথাই স্বভাবিক হয়ে আসতে পারে। আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ নিয়ে বিদেশেও আমি আলোচনা করে জেনেছি– বিকৃতির যে স্তরে রোগটা ছিল, সেই স্তরে থাকলেই সব দিক থেকে সেইফ। আরও কিছুদিনের জন্য বেগম সাহেবার এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাই আমার কাম্য।

(হঠাৎ ডাক্তারের মখোমুখি দাঁড়ান এসে রাশেদ সিনহা)

আমি য্যা চাই, বুঝতে পেরেছেন?

ডাক্তার ঃ (কোন রকমে সাহস সঞ্চয়ের ভাব দেখিয়ে) পেরেছি স্যার।

রাশেদ ঃ যখনই বুঝবেন অবস্থা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখনই এ্যাপ্লাই করবেন ওই নতুন ওষুধটা। এতে আপনার কোন বিপদ আসবে না। বিপদ আসবে, যদি ....

ডাক্তার ঃ (ভীতির ভাব দেখিয়ে) বিপদ বুঝেই আমি নির্দেশমত কাজ করব স্যার!

(রাশেদ সিনহা সহজ হয়ে যান)

রাশেদ ঃ আতাহার খান!

(আতাহার এসে কাছে দাঁড়ায়। ডাক্তার চলে যায়)

www.pathagar.com

সামনের কিছুটা সময় আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। হঠাৎই দেশের পরিস্থিতি বদলে গেল তো।

(আতাহারের চোখে মুখে ভীতির ছায়া নামে)

সেই ঘটনাটা .... মানে ওই পক্ষ কেসটাকে এদ্দিন পর রিভাইভ্ করছে।

(আতাহারের মুখোমুখি দাঁড়ান)

কে কে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তা তোমার খুবই জানা আছে!

আতাহার : (যন্ত্রচালিতের মত) জানা আছে স্যার। কিন্তু এদ্দিন পর?

রাশেদ : (অর্থপূর্ণ কণ্ঠে) গ্যাংগ্রীণ একটা রোগের নাম। দেহের অংশবিশেষের পচন অর্থাৎ পচনশীল ক্ষত। চিকিৎসার একটা পর্যায়ে দেহের সেই অংশ বিশেষকে কেটে ফেলে দিতে হয়। তাতে দেহের বাকি অংশ নিরাময় থাকতে পারে।

(আতাহারকে একটা ছোট্ট ওষুধের ফাইল দেন)

ডাক্তারকে যা বলার, বলেছি। এই ওষুধটা রাখবে তোমার কাছে। চরম সময়টা তোমাকে বুঝে নিতে হবে। নির্দেশ অমান্য করে যদি ডাক্তার, তুমি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবে শেষ কর্তব্য।

আতাহার : (খুবই ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে) কিন্তু স্যার ....

রাশেদ : আতাহার খান। নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয়তর কিছু নেই। দুর্বলতা দেখাবার অবকাশও আমাদের নেই!

(আবার নিজেকে বদলে ফেলে সহজ কণ্ঠে ডাকেন-)

ডাক্তার সাহেব!

(ডাক্তার এসে অদূরে দাঁড়ায়)

আপনারা দু'জনই রয়েছেন। আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ।

ডাক্তার : অনুরোধ কেন স্যার, হুকুম করুন।

রাশেদ : অনুরোধ বা হুকুম যা-ই বলুন, তা আমার ছেলে ওই নঈম সম্পর্কে।

(ডাক্তার ও আতাহার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নেয়)

শত ব্যস্ততার মাঝেও জানতে পেরেছি, নঈমের মন-মেজাজটা কিছু বিগড়েই গেছে।

ডাক্তার : গোটা সমাজটাই বিষিয়ে উঠেছে তো!

www.pathagar.com

রাশেদ ঃ অনার্সটা হয়ে গেলেই ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দেব। তার আগে পর্যন্ত ওকে আপনারা চোখে চোখে রাখবেন। ড্রাগও নিচ্ছে কি না, কে জানে! নিলেও তাকে সুস্থ করে তুলবেন আপনারা। প্রচুর টাকার ব্যবস্থা এখানে করা আছে।

আতাহার ঃ আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব স্যার!

রাশেদ ঃ আমি বেরুচ্ছি এখন। কখন ফিরব, তার ঠিক নেই।

(বেরিয়ে যান রাশেদ সিনহা। দু'জনে নীরবে দাঁড়িয়ে দেখে রাশেদ সিনহার গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে)

আতাহার ঃ আচ্ছা ডাক্তার, ব্যাঙের সর্দি হলে সারায় কি করে?

ডাক্তার ঃ ব্যাঙদের মধ্যেও ডাক্তার আছে তো! সেই ডাক্তারের ওষুধে সর্দি সেরে যায়।

আতাহার ঃ তাহলে আর কি! নতুন করে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের কাজে লেগে যাই।

ডাক্তার ঃ ওই নঈম সিন্‌হাকে পূত–পবিত্র রাখার দায়িত্ব?

(বাইরে গাড়ী এসে থামে। দু'জনই উদ্‌গ্রীব)

এ যে দেখছি নঈম ফিরে এসেছে! সঙ্গে এক তরুণী!

আতাহার ঃ মেঘ না চাইতেই জল! নাও, দায়িত্ব পালন আরম্ভ কর ডাক্তার।

(ড্রইংরুমে এসে ঢোকে নঈম ও সীমা)

নঈম ঃ ভার্সিটিতে কোন কাজ হল না আতাহার ভাই। ইনি আমার ক্লাসফ্রেন্ড সীমা। তাই সীমাকে নিয়ে এখানেই এসে পড়লাম।

(নঈমের কথা শুনে সীমা কিছুটা অবাক হয়)

আমাদের জন্য কাউকে কিস্যু ভাবতে হবে না। ওপরে আমার রুমে আমরা পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকব। বাই দি বাই, দ্যাট গ্রেট ম্যান– মাই ফাদার– এর মধ্যে নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছেন?

আতাহার ঃ তা গেছেন, এই কিছুক্ষণ আগেই।

নঈম ঃ আমার সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন?

আতাহার ঃ না। তাঁকে খুব ব্যস্ত মনে হল।

(নঈমের মুখে মেঘের ছায়া নেমে আষে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র)

নঈম ঃ যাক। তুমি–আমি দু'জনই বেঁচে গেলাম!

(ওপরে যেতে পা বাড়ায়)

আতাহার ঃ একটা কথা শোন নঈম।

www.pathagar.com

(নঈমকে নিয়ে কিছুটা দূরে যায়)

ওপরে তোমার রুমের সামনে হঠাৎ এসেই বসে আছেন বেগম সাহেবা। সুতরাং ওই পথে যাত্রা নাস্তি।

নঈম : ও. কে. ! তাহেল এখানেই আমাদের দু'জনকে নিরিবিলিতে রেখে তোমরা কেটে পড়!

আতাহার : অগত্যা তোমার হুকুমই শিরোধার্য। .... চল হে ডাক্তার।

(ওরা দু'জন চলে যায়। সীমাকে নিয়ে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে নঈম। সীমা বেশ অস্বস্তি বোধ করে)

সীমা : এখানে এভাবে আমাকে নিয়ে আসা তোমার ঠিক হয় নি।

নঈম : এত আন-ইযি ফিল করছ কেন?

সীমা : মনে হয় জীবনের বাস্তব আঙিনায় কখনো পা' রাখ নি।

নঈম : তুমিই কি রেখেছ সীমা? অথবা রাখার ভান করে সেজেছ এক নির্মম সমালোচক?

সীমা : নিম্নবিত্তের আধমরা মনের গভীরে সর্বদাই হয়তো লুকিয়ে থাকে এক নির্মম সমালোচক!

নঈম : জীবনটাকে ডাল ড্রাই এ্যান্ড ড্রিয়ারী করে তোলাই যার কাজ!

সীমা : হযতো তা-ই। কিন্তু প্রাচুর্য আর সুযোগে ভরা এমন মনোহর তোমার জীবনটাকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমি কেন ডাল ড্রাই এ্যান্ড ড্রিয়ারী করে তুলব?

নঈম : সীমা, আমার দুরন্তপনার মাঝেও তোমাকে যতটা কাছের বলে ভাবছিলাম, মনে হচ্ছে ততটা কাছের তুমি নও।

সীমা : আমার পরিচয় তুমি জান। আর এ-ও জান— নোট প্রিপ্যারেশনের নামে কেন আমি ....

নঈম : চুপ কর সীমা। নির্মম সত্যের এতটা স্পষ্টতায় এস না।

সীমা : কিন্তু যারা তোমার সঙ্গে আমাকে এমনভাবে দেখছে- তাদের তো বুঝতে দেওয়া উচিত যে আমি তোমার প্রচলিত অর্থের নায়িকা নই!

নঈম : (স্বাভাবিক সহজ কন্ঠে) তুমি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চাও?

সীমা : আমার মা-বাবা জানে .... আমি একটা পার্ট-টাইম চাকরিও করি। সপ্তাহান্তে মাইনে পাই। আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে বাসার কতগুলো মানুষ- বলা যায় প্রাণী!

নঈম : ঠিক আছে, তুমি বাসায়ই ফিরে যাবে।

www.pathagar.com

সীমা : তোমার অশান্ত মনটাকে আরও খারাপ করে দিলাম?

নঈম : (ম্লান হেসে) নাহ্। অভাবের হলেও তুমি সে-বাসায় ফিরে যাবে একটা নিরেট কর্তব্যের তাগিদে। কিন্তু আমি? আমি বাসা থেকে কোথায় যাব? কার কাছে যাব?

সীমা : শুনেছি তোমার মা অসুস্থ। তাঁর কাছে গিয়ে বসতে পার না?

নঈম : না সীমা, না!

সীমা : অন্তত নিজেকে সংযত করে পার না একটা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে? কোন কিছুর অভাব তো তোমার নেই!

(ছটফট করে ওঠে নঈম)

নঈম : আছে শুধু একটা অভাব! .... ইউ নো, আমার মাম্মি .... ওই যে তাঁর আগেকার একটা ছবি .... বড় মহিমময়!

(দু'জনই ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়)

কতদিন আগেকার এ ছবি, আমি তখন স্কুলে পড়ি! (উদাস কণ্ঠে) সেই দিনগুলো হারিয়ে গেছে! .... যাক, তুমি যাবে। জাস্ট এ মিনিট। আমার মানিব্যাগটা পড়ে রয়েছে গাড়ীতে।

সীমা : আমিও তোমার সঙ্গে বেরোই। গাড়ীর পাশে আমি দাঁড়াব। দিয়ো, যা দিতে চাও। আমি হাত পেতে নেব। না নিয়ে আমার উপায় নেই যে!

নঈম : সীমা, থামাও তোমার এসব অপ্রিয় সত্যের উচ্চারণ। চল, আমি তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।

সীমা : যাব। কিন্তু একটা অনুরোধ – আমি তোমার মাম্মিকে একবার দেখতে চাই। একদিন নিয়ে যাবে না?

(নঈম নীরবে সায় দেয়, তারপর চলে যায় দু'জন।
আসে ডাক্তার ও আতাহার খান)

ডাক্তার : ব্যাপার কি হে ম্যানেজার? কেনই বা এমন করে এল, আর কেনই বা ঝটপট চলে গেল!

আতাহার : কাঁঠাল গাছে আম ফলে না ডাক্তার!

ডাক্তার : আমরা কি তাহলে নঈমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের আর এক ভয়ঙ্কর রাশেদ সিনহাকে?

(পাশের দরজা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে আসে মিনুর মা)

মিনুর মা : ডাক্তার সায়েব, শিগগীর আসেন। বেগম সা'ব খুব অস্থির অইয়া গেছেন!

www.pathagar.com

(ডাক্তার ব্যাগ নিয়ে দ্রুত পায় মিনুর মা'র সঙ্গে চলে যায়। পায়চারি করতে থাকে আতাহার খান। তখনই বাইরে থেকে ধীরপায় ড্রইংরুমে এসে দাঁড়ায় সেই পাগলাটে বৃদ্ধ)

আতাহার : একি! মানা করা সত্ত্বেও আবার আপনি এসেছেন? তা-ও এই ড্রইংরুমে?

পাগলাটে বৃদ্ধ : টাকা চাই না। পেটের ক্ষিধা এখন আর নাই। কিন্তু বাইরে খাঁ খাঁ রইদ। মনের জ্বালার সাথে শরীরেও বড় জ্বালা। এই ঘরটা দেখি খুবই ঠান্ডা!

আতাহার : করিম! এই করিম!

(চাকর করিম আসে)

এই টাকা নে। এই বুড়া মিয়াকে নিয়ে যা ওই রেষ্টুরেন্টে। কোল্ড ড্রিংকসহ আর যা যা খেতে চায়, খাওয়াবি। (বৃদ্ধকে) আর কোন কথা নয়। এখখুনি আপনি এর সাথে চলে যান।

পাগলাটে বৃদ্ধ : যাইতে কইতেছেন, যাই। কিন্তু কিছু খাওয়ানি লাগব না। আমারে এইখান থাইকা যত দূরে রাইখা আইলে আপনাগো সুবিধা হয়, এই করিম মিয়া বরং তত দূরেই আমারে রাইখা আসুক!

(করিম বৃদ্ধকে নিয়ে চলে যায়)

(সাধারণভাবে সজ্জিত সিদ্দিকীর অফিস রুম। সেখানে রয়েছে সিদ্দিকী এবং তার এক মাস্তান জাতীয় সহচর। আর রয়েছেন রাশেদ সিনহা। কথা বলছে সহচর ও সিদ্দিকী। গম্ভীর রাশেদ সিনহা শুনেই যাচ্ছেন)

সহচর : জায়গায় জায়গায় আমার লোকজন ডিউটিতে আছে সা'ব। কিন্তু চিন্তার কারণ হইল- সায়বের কেসটা যে আবার মাথা চাড়া দিছে, তার লাইগা পুলিশের ভয়। বেশি ভয় সায়বের লাইগা আর আপনের লাইগা।

সিদ্দিকী : খবরটা তুমি ঠিক শুনেছ?

সহচর : অনেক বড় বড় সায়বের কাজকাম কইরা দিনপাত চালাই। ভুল খবর শুনলে আমাগোর আর দাম কি? এইদিকে ফাংশানের সকল বেবস্থা শেষ। যারে যারে চাই, ঠিকমত

www.pathagar.com

আইসা যাইব। সঙ্গে থাকব আমার লোক। সেরেফ এক জায়গায় আপনেরে লইয়া যামু আমি নিজে। খবর কইলাম, অখন আপনাগো হুকুমে বাকি কাজ চলব।

সিদ্দিকী : স্যার! আজকের ফাংশানটা তাহলে ·...

রাশেদ : হবে। শুধু স্থানটা বদলে যাবে। হোটেল রাহ্গীরে নয়।

সিদ্দিকী : তাহলে কোথায়?

রাশেদ : চৌধুরী একটা বাগান বাড়ীর মত করেছে- ওই মীরপুর ছাড়িয়ে ....

সিদ্দিকী : চিনি।

রাশেদ : সেখানে। টাইম যা ছিল, তা-ই থাকবে। এবার কয়েক জায়গায় আমি ফোন করব।

(সিদ্দিকী ও সহচর চলে যায়। ফোন তোলেন রাশেদ সিনহা)

(একটা হোটেলে রাতের নাচ-গানের আসর জমে উঠেছে। হল রুমের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় নঈম, সঙ্গে আসে তানবীর)

তানবীর : কি হল নঈম? হঠাৎ করে উঠে এলে যে?

নঈম : ভাল লাগছে না তানবীর।

তানবীর : এই নাচ-গানও ভাল লাগছে না? তাহলে কি ভাল লাগবে বল্, তার ব্যবস্থা করি!

নঈম : এই নে টাকা। (টাকা দেয়) তোরা এন্‌জয় কর্। চলি।

(চলে যায় নঈম। তাকিয়ে দেখে তানবীর)

(বেগম সাহেবার কোঠা। অবসাদভরা শ্রান্ত কণ্ঠে কথা বলছেন বেগম সাহেবা, শুনছে মিনুর মা। অল্প দূরে একটু আড়ালে বসে চুপচাপ শুনছে ডাক্তার)

বেগম সাহেবা : রুমের সামনে বসে ছিলাম যখন, তখন তন্দ্রাঘোরে মনে হল- আমি যেন বাপের বাড়ীতে নাইয়র গেছি! সেখানে সবুজ মাঠ, মাথার ওপরে নীলাকাশ! আকাশটা ওই দূর গাঁয়ের পেছনে মাটিতে লেগেছে। বাপের বাড়ীর পাশ দিয়ে বড় খালের মত একটা নদী। নদীতে ছই-দেওয়া নাও। বকের ডানার মত শাদা পাল তোলা আরও যে কত নাও সবটা নদীতে! পানিতে ডুব দিয়ে ভেসে ওঠে পাখী- পানকৌড়ী,

www.pathagar.com

আরও যেন কি কি নাম! গাঁয়ের গাছ-গাছালীতে কত পাখী, বন-ঝুপড়িতে কত ফুল! আমাদের বাড়ীর পেছনে সজনে গাছ। গাঁয়ের মেয়েরা সজনে পাড়ত কুটা দিয়ে। বউঝিরা মায়েরা মেয়েরা চিড়া কুটত- শালি ধানের চিড়া!

(বর্ণনানুযায়ী গাঁয়ের দৃশ্যাবলীও কল্পনায় দেখছিলেন বেগম সাহেবা। মিনুর মা'র গোপন নীরব জিজ্ঞাসার উত্তরে চুপ করে শুনে যাওয়ার নীরব ইঙ্গিত দিয়ে যায় ডাক্তার। বেগম সাহেবার কানে ভেসে আসতে থাকে ঢেঁকির পাড়ের শব্দ)

বেগম সাহেবা ঃ ওই গাঁয়ের বাড়ীতেই তো বিয়ে হল আমাদের! তারও আগে অন্য এক জায়গায় বিয়ের কথা হয়েছিল। যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা, তিনি ডাক্তারি পড়তেন!

(মিনুর মা নীরবে তাকায় ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মাথা নীচু করে)

কিন্তু সে-বিয়ে কেন জানি হল না। আমি তার ফটো দেখেছিলাম। কি সুন্দর না দেখতে! .... তারপর যার সঙ্গে বিয়ে হল, তা তো জানই। বিয়ের পর এলাম শহরে। ছোটমত একটা চাকরি করতেন তোমাদের সাহেব। থাকতাম সাধারণ একটা বাসায়। সুন্দর সাজানো আমার সংসার!

মিনুর মা ঃ আম্মা! ডাক্তার সায়েব আপনেরে বেশি কথা কইতে মানা করছেন!

বেগম সাহেবা ঃ (সে কথায় কান না দিয়ে) এক সময় চাকরির ফাঁকে ফাঁকে কিসের যেন ব্যবসা করতে লাগলেন। লাগলেন তো লাগলেনই! সেটা অন্য এক আমলে। তারপর দেশে কত গোলমাল, কত বিশৃঙ্খলা! আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল গাঁয়ের বাড়ীতে। বিশৃঙ্খলা থেমে গেলে আবার ফিরে এলাম এ শহরে। সঙ্গে আমার এক গরীব আত্মীয়ের সুন্দরী মেয়ে রাণু- কলেজেপড়বে।

(হঠাৎ কি ভেবে যেন অস্থির হয়ে ওঠেন)

কিন্তু দিনের পর দিন কি করে যে বদলে গেল সব!

(প্রায় চিৎকার করে কি দেখাতে গিয়ে বলেন-)

মিনুর মা! ওই যে, ওই...

www.pathagar.com

(ডাক্তার চিন্তিত হয়ে পড়ে। উঠে দাঁড়ায়। .... বেগম সাহেবার চোখে ভাসে একটা অস্পষ্ট দৃশ্য। সে-দৃশ্যের আলো-আঁধারিতে কারও চেহারা তেমন স্পষ্ট হয় না। কিন্তু বোঝা যায়- একটি পুরুষ এগিয়ে যাচ্ছে একটি মেয়ের দিকে। শোনা যায় মেয়েটির বুকফাটা আর্তনাদ। অন্য একটি পুরুষও তখন এগিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেবাও আর্ত চিৎকার করে ওঠেন। দৃশ্যটি মিলিয়ে যায়)

বেগম সাহেবা ঃ (আর্ত-চিৎকার) আহ্! .... সে কি ভয়ানক এক দৃশ্য! ঝকঝকে ছোরা, রক্ত, মেয়েটির লাশ!

(আবার এক দৃশ্যঃ আলো-আঁধারিতে বারবার দূর থেকে কাছে আসছে একের পর এক রাশেদ সিনহা ও আতাহারের অস্পষ্ট ছবি। আবার মিলিয়ে যায় সে-দৃশ্য)

আমি নিজের চোখে দেখলাম। দেখার কথা ছিল না। তবু দেখলাম!

(কয়েক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকেন বেগম সাহেবা। তারপর আপন মনে বলে যান-)

তারপর কত থানা পুলিশ, কত লোকের আনাগোনা। আমার ওপর সাহেবের কড়া নির্দেশ- আমি গুরুতর রকমে অসুস্থ, কথা বলা নিষেধ। চিকিৎসা চলতে লাগল আমার। ভুলে যেতে লাগলাম সব কিছু, সবাইকে। শুধু কখনো বুঝতে পারতাম- কত রকম ব্যবসা, কত রকম মেয়ের চাকরি .... দেশ-বিদেশে যাতায়াত .... অনেক টাকা, অনেক, অনেক!

(শ্রান্ত হয়ে পড়েন বেগম সাহেবা, অবসাদে ঝিমিয়ে পড়েন। অশ্রু ছলছল চোখ ডাক্তারের। এগিয়ে আসে বেগম সাহেবার কাছে। সকরুণ দৃষ্টিতে বেগম সাহেবা তাকান ডাক্তারের দিকে)

আপনার চোখ ছলছল করছে ডাক্তার!!

ডাক্তার ঃ আপনি সুস্থ হয়ে উঠছেন বেগম সাহেবা! কোন ভয় নেই। ....আমি মনে করছি, আমার ডাক্তারি বিদ্যা এতদিন সার্থক হল!

বেগম সাহেবা ঃ আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না ডাক্তার?

ডাক্তার ঃ এর চাইতে বুঝে আজ আর কোন লাভ নেই বেগম সাহেবা!

www.pathagar.com

(ডাক্তারেরর চোখে কারুণ্যের ছায়া)

(রাস্তার কোন এক ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধ)

পাগলাটে বৃদ্ধ : দিনের গা-জ্বালা রইদের পর এই রাজধানীতে নামল রাইত! এখন এইখানে চলব কত রহস্যের লীলা-খেলা! কিন্তু আমি আর কত দিন, কত রাইত এই রহস্যভরা রাজধানীর পথে পথে ঘুরব? আমি তো শুধু একটা কথাই জানতে চাই! শুধু একটা কথা!

(বুকের কাছ থেকে একটা ফটো বের করে দেখে- একটা মেয়ের ফটো)

(রাশেদ সিনহার ড্রইংরুমে আলো বিতরণ ব্যবস্থায় অতি-আধুনিকতা প্রবর্তনের ফলে সেখানে আলো-আঁধারের রহস্য। রুমে কথা বলছে ডাক্তার ও আতাহার খান)

ডাক্তার : বেগম সাহেবা অনেক কথা বলে এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আগেকার কথা বললেনও বেশ গুছিয়ে।

আতাহার : (চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া) তাহলে কি এসে গেল সেই চরম সময়?

(ডাক্তার ইচ্ছা করেই যেন আতঙ্কটাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়)

ডাক্তার : গা-ছমছম একটা ফিলিং হচ্ছে আমার। আবার কি মাথা তুলছে সেদিনকার ভয়ঙ্কর সব অপরাধের সেই ....

আতাহার : চুপ কর ডাক্তার! এমন করে অতীতকে জীবন্ত করতে চেয়ো না।

(তখনই বাইরে একটা গাড়ী এসে থামে। ডাক্তার ও আতাহার উৎকণ্ঠিত-উদ্‌গ্রীব। রুমে এসে ঢোকে নঈম- বিপর্যস্ত রুক্ষ উদ্ধত চেহারা, হাতে পিস্তল)

উভয়ে : নঈম!!

নঈম : হ্যাঁ, জানাতে এসেছি এক চরম হুঁশিয়ারি।

ডাক্তার : চরম হুঁশিয়ারি! কাকে?

নঈম : আতাহারের মাধ্যমে মিস্টার রাশেদ সিনহাকে।

আতাহার : নঈম!!

www.pathagar.com

নঈম : আমার ফাদার রাশেদ সিনহার বিজ্‌নেস্ পার্টনার ওই আবু লায়েস সিদ্দিকী কালচার‍্যাল ইভনিং–এর আসরে গানের জন্য আনতে গিয়েছিল ওই সীমাকে। এমনি আসরে কালচার‍্যাল কার্যকলাপ কি কি হয়, তা আতাহার খানের জানা আছে। বেশ মোটা টাকার অফার দেওয়া হল সীমাকে– একান্তে ডেকে নিয়ে। সব শুনে সীমার পড়বার কোঠা থেকে আমি বেরিয়ে আসি এই পিস্তল হাতে। ভয় পাওয়া কুকুরের মত পালিয়ে যায় আবু লায়েস সিদ্দিকী আর তার সহচর! (হঠাৎ চিৎকার করে) আমি প্রস্তুত। এবার পিতা–পুত্র মুখোমুখি।

(মাথা নোয়ায় ডাক্তার ও আতাহার)

কিছুদিন ধরে যতই নীচে নামতে চেষ্টা করছি, ততই গুরুজন ওই রাশেদ সিনহার কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হতে আরম্ভ করেছি আতাহার সাহেব! আই উইল হিট হিম ব্যাক। তাই আমার এই প্রথম ও শেষ হুঁশিয়ারি তুমি পৌছে দেবে আমার ফাদারের কাছে।

(মাথা তুলে আতাহার দেখে নঈমকে– ফাঁক করা পা' থেকে মাথা পর্যন্ত। আতাহারের মনে হয়– এক দীর্ঘকায় তরুণ দৈত্য তার সামনে দাঁড়িয়ে)

আতাহার : সিদ্দিকী সাহেবকে জানাতে অনুরোধ করি?

নঈম : না। তুমি নিজে বলবেঃ সশস্ত্র নঈম সিনহা স্বকণ্ঠে জানিয়ে গেছে এই হুঁশিয়ারি।

(চলে যায় নঈম)

ডাক্তার : বিষবৃক্ষ ফল ধরতে আরম্ভ করেছে আতাহার। আর সেই ফল হচ্ছে বিষফল।

(ফোন বেজে উঠলে আতাহার গিয়ে ধরে)

আতাহার : হ্যালো! কে বলছেন?

(আতাহারের পাশাপাশি দূর থেকে কাছে ভেসে আসে ফোন–ধরা সিদ্দিকীর চেহারা। কথা বলছে সিদ্দিকী)

সিদ্দিকী : আমি সিদ্দিকী বলছি। মিস্টার সিনহার একটা ম্যাসেজ আছে।

আতাহার : (কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে) ম্যাসেজ? বলুন স্যার।

www.pathagar.com

সিদ্দিকী : ম্যাসেজ মানে .... ইয়ে .... মানে এখানকার পরিস্থিতি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মিস্টার সিনহা আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে বলেছেন।

আতাহার : সাহেবের ছেলে নঈম এসেছিল এইমাত্র। আপনাদের ওপর সে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে!

সিদ্দিকী : আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু বিপদ আসছে পুলিশের দিক থেকে। ছাড়ি।

(ফোন ছেড়ে দেয় সিদ্দিকী। নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে আতাহার। ডাক্তার এসে তার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে রেখে দেয়)

ডাক্তার : বুঝতে পারছি- খুবই এলার্মিং ম্যাসেজ?

আতাহার : ঘনিয়ে আসছে সেই চরম মুহূর্ত! .... আমি জানি- আরও একটা ফোন আসবে!

(সিদ্দিকীর আধো আলো আধো ছায়া অফিস-রুম। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ভীত-সন্ত্রস্ত সিদ্দিকী ও সহচর। অন্য কোণ থেকে ধীরপায় রাশেদ সিনহা এগিয়ে এসে ফোনে হাত রাখেন। তখনই বিড়ালের তীব্র ঝগড়ার শব্দ শোনা যায়। চমকে উঠে রাশেদ সিনহা দরজার দিকে তাকান। দেখেন- বিড়ালের একজোড়া জ্বলজ্বল চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। সহচর এসে বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দেয়। আতঙ্কগ্রস্ত রাশেদ সিনহা ফোন তোলেন)

(রাশেদ সিনহার ড্রইংরুমে ফোন বেজে ওঠে। তাড়াতাড়ি। ফোন ধরে আতাহার খান- চোখেমুখে যার ভীতির ছায়া)

আতাহার : হ্যালো! .... জ্বি স্যার, আমি আতাহার!

(ওদিকে রাশেদ সিনহা বলছেন-)

রাশেদ : এতটা ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? হ্যাভ্ কারেজ।

(এদিকে বলছে আতাহার খান-)

আতাহার : এখানে একবার আসবেন না স্যার?

(ওদিকে রাশেদ সিনহা-)

রাশেদ : না। সেটা আর সেইফ নয়।

(এদিকে আতাহার)

www.pathagar.com

আতাহার : আমরা এখন কি করব স্যার?

(ওদিকে রাশেদ সিনহা–)

রাশেদ : যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে। কেসের এক সাক্ষী তো তুমি, অন্যজন ....

(এদিকে আতাহার–)

আতাহার : বেগম সাহেবা। তিনি আবার সব কিছু গুছিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন!

(ওদিকে রাশেদ সিনহা–)

রাশেদ : সেই ওষুধের কথাটা মনে আছে তো? ঠিক সময়ে এ্যাপ্লাই করবে। .... তোমাদের ওপর আমার নিষেধ-নির্দেশ যে-ই অমান্য করবে, কেউ রেহাই পাবে না। .... মনে রেখো, আমাদের গায়ে কাঁটা সাধারণত বিঁধে না। স্থান পরিবর্তন করেও আমরা একই রকম ড্যাঞ্জারাসলি এ্যাকটিভ থাকি।

(এদিকে আতাহার–)

আতাহার : শত বিপদেও আমি বিশ্বস্ত থাকব স্যার!

(ওদিকে রাশেদ সিনহা–)

রাশেদ : না থাকলেই আসবে চরম বিপদ। যাক, এখানকার টাকাপয়সা বাড়ীঘর যার নামে যেমন ছিল, তেমনি থাকবে।

(এদিকে আতাহার–)

আতাহার : আগের মতই যে যা চায়, দিয়ে দেব স্যার?

(ওদিকে রাশেদ সিনহা–)

রাশেদ : ঠিক আগের মতই দেবে। তার ওপর প্রয়োজন মত খরচ করার অধিকার রইল তোমার। এবার কথা শেষ করতে হচ্ছে। গুডবাই!

(ফোন রাখেন। সহচর কাছে এসে বলে–)

সহচর : আমার সব লোকজন আর গাড়ী তৈয়ার স্যার।

সিদ্দিকী : তোমার লোকজনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় তো?

সহচর : সক্কলেই পাক্কা ঈমানদার। তার ওপ্‌রেও নজর রাখুম। গড়বড় দেখলে গাড়ীর ইস্পিড বাইড়া যাইব!

(ব্যাগটা হাতে নেন রাশেদ সিনহা)

www.pathagar.com

(রাশেদ সিনহার আলো-আঁধারময় ড্রইংরুমে
আতাহার ও ডাক্তার)

আতাহার : সবই তো শুনলে ডাক্তার। কি করব এখন?

ডাক্তার : কড়া নির্দেশের পরেও যখন কি করবে জিজ্ঞেস করছ, তখন ধরে নিতে পারি- তোমার এতদিনকার অবদমিত বিবেকটা জাগ্রত হচ্ছে! তুমি এখন উভয় সঙ্কটে।

আতাহার : তা-ই না হয় হল। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

ডাক্তার : তার আগে- যাই, বেগম সাহেবার শেষ চিকিৎসা করে আসি।

আতাহার : শেষ চিকিৎসা?

ডাক্তার : সাহেবের বিদেশ থেকে আনা ওষুধ! বলেছিলে, তা প্রয়োগ করার আগে তোমাকে জানাতে। জানালাম।

(ডাক্তার ব্যাগটা হাতে নেয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে অস্থির আতাহার ব্যগ্রভাবে ডাক্তারের ব্যাগটা শক্ত হাতে ধরে রাখে)

আতাহার : না ডাক্তার, না। এমন কাজটি কখ্‌খনো করবে না। আমিই করতে দেব না তোমাকে।

ডাক্তার : তার অর্থ?

আতাহার : এই যে বললে না 'বিবেক'? তার অর্থ ওই বিবেকের নির্দেশ। জান ডাক্তার, তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পেরে রাশেদ সিনহা আমার হাতেও দিয়ে গেছেন ওই ওষুধ! দাও, ওসব ওষুধ আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। মনের আগুন তাতেও কিছুটা নিভবে।

(ডাক্তারের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে)

ডাক্তার, তোমার মুখে উজ্জ্বল প্রশান্ত হাসি?

(ব্যাগটা ছেড়ে দেয়)

ডাক্তার : এতদিনে আমি সাফল্যের মুখ দেখলাম- এখনো আমার কথায় কাজে আর চোখে মুখে থাকবে অভিনয়ের ছলাকলা?

(দু'জন দু'জনকে দেখছে নীরবে। আতাহার যেন আবিষ্কার করছে এক নতুন ডাক্তারকে)

আতাহার : আমি কি এক নতুন ডাক্তারকে দেখছি না?

www.pathagar.com

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ, যার যুবক বয়সের একটা ফটো একদিন দেখেছিলেন তরুণী ওই বেগম সাহেবা।

আতাহার ঃ তারপর?

ডাক্তার ঃ তারপর আর কিছু নেই। আছে শুধু এক কল্পিত পরিচয়ের মাধুর্য। কিন্তু দৈবক্রমে আমাকেই আনা হল তাকে ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু তা-ও কি কখনো হয়!

(আতাহারের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। তখনই বাইরে এক করুণ কণ্ঠ-)

(বাড়ীর গেটে-)

পাগলাটে বৃদ্ধ ঃ মা রে! মা!!

(করিম এসে পাগলাটে বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ায়)

করিম ঃ আপনে এত রাইতে আবার এইখানে আইসা চিৎকার করতাছেন ক্যান্? তখন থাইকাই মানা করা হইতাছে —

পাগলাটে বৃদ্ধ ঃ (শান্ত কণ্ঠে) কলেজে পড়তে আইছিল আমার মাইয়া রাণু, দেখতে বেশ সুশ্রী- তার যে কি অইলো, তা জানতে আসি ঢাকায়, এইখানে। বছরের পর বছর গেল, কেউ কিছু কইতে পারে না। আপনে যদি জানেন, ক'ন। আর আসব না।

(করিমের চোখ ছলছল করে ওঠে)

করিম ঃ শোনেন, আমি কিছু কিছু জানি। এই বাড়ীতে বেগম সা'বরে সেবা যত্ন করে আমার বিধবা মাইয়া মিনুর মা। আমিও বহুদিন এই বাড়ীর দেখাশুনার কাম করি। মিনুর মা আর মিনুরে লইয়া থাকি ওইখানে। এই কয় বছরে অনেক কিছুই দেখছি। .... রাণুরা বাঁইচা থাকে না! রাণুরা বাঁইচ্যা নাই!

পাগলাটে বৃদ্ধ ঃ বাঁইচ্যা নাই? .... যাউক, তবু তো জানলাম! মইরা গিয়া রক্ষা পাইছে আমার রাণু! অপমান, নির্যাতন আর লাঞ্ছনার হাত থাইকা বাঁইচ্যা গেছে!

(কল্পনায় রাণুর মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়)

আল্লাহ্ তোমারে শান্তিতে রাখুক মা! শান্তিতে রাখুক!

(তারপর হাসতে হাসতে বলে-)

আচ্ছা ভাই- জানলাম যখন, তখন যাই! যাই রে মা রাণু, যাই!

(চলে যায়, চোখে অশ্রুধারা। করিমের চোখেও পানি)

www.pathagar.com

(নির্জন রাস্তায় গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে
নঈম ও সীমা)

নঈম : ওই তো তোমাদের বাসা। একাই যেতে পারবে। ভয় নেই, সিনহা আর সিদ্দিকীরা পালিয়েছেন।

সীমা : আবার তো আসতে পারেন!

নঈম : পারেন বলেই তো এই ড্রাগ এডিক্ট নঈমকে যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকতে হবে! .... যাক, তোমাকে তখন কিছু টাকা দিয়েছি। বছর খানেক স্বাধীনভাবে চলবার মত আরও টাকা রেগুলারলি পেতে থাকবে। অবিশ্যি আমার সঙ্গে আর দেখা না হওয়ারই কথা। তাতেও টাকা পাওয়ার অসুবিধা হবে না।

(সীমা অবাক হয়ে শুনছে)

এতে সঙ্কোচের কিছু নেই। ... নতুন কোন জীবনের জন্য সাধ জাগে যদি, এই টাকা তোমাকে দেবে ইচ্ছেমত জীবন রচনার সুযোগ!

সীমা : কিন্তু ড্রাগ এডিক্ট হয়ে তুমি বাঁচব কি করে? এর পরিণাম তুমি জান না?

নঈম : জানি বলেই বলছি– বাঁচতে আমাকে হবেই! .... মাম্মির কাছে যাব। অনেক দিন পর আজ যাব। বাঁচাতে হবে তাঁকেও! আসি।

সীমা : তোমার মাম্মিকে আমি দেখতে চেয়েছিলাম। তুমি সায় দিয়েছিলে। আজ আমি তোমার সঙ্গে যাবই।

(নঈমের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে বসে। গাড়ী ছুটে যাচ্ছে)

(বেগম সাহেবার কোঠার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে করিম ও মিনু। মিনুর মা বেগম সাহেবার পেছনে দাঁড়িয়ে। বেগম সাহেবা কথা বলছেন ডাক্তারের সঙ্গে। তিনি এখন বেশ হাসিখুশী)

বেগম সাহেবা : আমি কালই গাঁয়ে যাব ডাক্তার সায়েব! এই দোযখে আর নয়। যাব বাপের বাড়ীতে! এই মিনুর মা, মিনু– ওরা আমাকে নিয়ে যাবে।

ডাক্তার : বেশ তো যাবেন, কিন্তু আগের বাড়ীঘর কি আর আছে?

www.pathagar.com

বেগম সাহেবা : যা-ই আছে, দেখে আসব। দেখে আসব সেই গাছ-গাছালী, সেই নদীটা। নদীতে কত না নাইয়রী নাও! সেই ছোটকালের বাপের বাড়ীর নাইয়রী নাও ....

ডাক্তার : সেই নদী তো আজ অনেকটাই শুকিয়ে গেছে!

বেগম সাহেবা : তবুও যাব। ঝির ঝির করেও পানি বয় যদি, তবুও দেখে আসব। জানেন ডাক্তার, একটু আগে ঘুম ভেঙে গেল ভোরের পাখীর কাকলীতে। ঘরটা ভরে গেল ফুলের সুবাসে! কি ফুল রে মিনুর মা?

মিনুর মা : নিশারাণী।

বেগম সাহেবা : হ্যাঁ, নিশারাণী। আর কি আশ্চর্য! কিছুদিন আগে চারাগাছটা লাগিয়েছিল মিনুর মা'র মিনু। কই রে মিনু, এদিকে আয়।

(মিনু বেগম সাহেবার কাছে এসে দাঁড়ায়। করিমও দাঁড়ায় এসে অদূরে)

আচ্ছা করিম মিয়া, মিনু কি করে এখন?

করিম : একটা নার্সারীতে চাকরী নিছে। ইস্কুলের পড়া সাইরা নার্সারীতে যায়। ফুলের গাছে পানি দেয়, যত্ন করে। আমরা যে ঘরটায় থাকি, তার পাশের খালি জায়গাতেও লাগাইছে আইন্যা কত ফুলের গাছ!

(ডাক্তার লক্ষ্য করে- বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা শুনছে নঈম; তার পাশে সীমা)

বেগম সাহেবা : (মিনুকে আদর করে) আমি তোকে একটা বাগান করে দেব রে মিনু! তাতে লাগাবি তুই অনেক গাছ। ফুলের গাছ, ফলের গাছ! সাধ্যমত রোজগার করবি আর যত্ন করবি বাগানের। ক্রমে বেড়ে উঠবে সেসব গাছ! ফল দেবে, ফুল দেবে! তোর মাকে নিয়ে তুই সংসার পাতবি, শান্তি সুখের সংসার! .....কে? বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে?

ডাক্তার : আপনার ছেলে নঈম, সঙ্গে ওর এক বান্ধবী- নাম সীমা।

বেগম সাহেব : এস, কাছে এস মা।

(সীমা বেগম সাহেবার কাছে এসে সালাম করে। ততক্ষণে ডাক্তার গিয়ে দাঁড়িয়েছে নঈমের কাছে)

ডাক্তার : বেগম সাহেবা ভাল হয়ে উঠছেন।

(নঈম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় ডাক্তারের দিকে)

www.pathagar.com

নঈম	ঃ	আপনি বলছেন ....
ডাক্তার	ঃ	এতদিন অভিনয় করে আমি এতটুকুই করতে পেরেছি। অল্পদিনেই উনি পুরোপুরি সেরে উঠবেন।
নঈম	ঃ	ডাক্তার সাহেব! আমি আপনার সম্পর্কে জেনেছি।
ডাক্তার	ঃ	থাক, এ নিয়ে আর কোন কথা নয়। .... তুমিও সুস্থ জীবন চাও?
নঈম	ঃ	কিন্তু ....
ডাক্তার	ঃ	আমি তোমার হাতটা শক্ত করে ধরতে পারি নঈম?
নঈম	ঃ	(আবেগভরে) পারবেন ডাক্তার সায়েব আমাকে একটা মিনু বানিয়ে দিতে? মিনুর মা'র মিনুর মত আমার আম্মার এক নঈম।

(নঈমের হাত ধরে ডাক্তার আসে বেগম সাহেবার কাছে)

ডাক্তার	ঃ	আপনার নঈম। নঈমই আপনাকে গাঁয়ে পৌছে দিয়ে ফিরে আসবে আমার কাছে। সুস্থ হয়ে এই শহরের কোথাও গড়ে তুলবে একটা সাজানো বাগান।
বেগম সাহেবা	ঃ	নঈম! আমার নঈম!! মিনুর মত তুইও থাকবি আমার সেই হারিয়ে যাওয়া নাইয়রী নায়ে? আর এই মেয়েটি? এই সীমা — যাবে না আমাদের সঙ্গে?
নঈম	:	(লজ্জা মেশানো কণ্ঠে) তুমি যদি চাও, যাবে। নিশ্চয়ই যাবে।
বেগম সাহেব	ঃ	তোদের সবাইকে নিয়ে আমি না'য়ে গিয়ে উঠব। আহ্ ডাক্তার! আমি দেখছি– আমাদের সেই ছোট্ট ঝিরঝির নদীতে আবার কত ছোট ছোট ঢেউ।

(বেগম সাহেবার চোখে ভাসে ঃ নদীতে একটার পর একটা নাইয়রী নাও ভেসে যাচ্ছে .....

www.pathagar.com

শেষ রাতের ডাকগাড়ী

চরিত্র-লিপি

হেলু ডাক্তার
মীর সাহেব
মীর-বেগম
সাজ্জাদ
সুরাইয়া
খুকুমণি
আমজাদ
মাজেদা
ফাতেমা
আসাদ
সোমা
করিমের মা
মুয়ায্যিন
আনুর বাপ
১ম যুবক
২য় যুবক
৩য় যুবক
এবং
অন্যান্য

www.pathagar.com

(একটা গ্রাম্য কুটিরের পাশ দিয়ে হেলু ডাক্তার বেরিয়ে এসে হাতের ডাক্তারী ব্যাগটা সাইকেলের যথাস্থানে রাখে)

(কথা বলতে বলতে ৩ জন যুবক রাস্তায় গাছের নীচে এসে দাঁড়ায়)

১ম যুবক : বেপারী বাড়ীর ডাকাতি মামলার তদবীর চলছে খুব জোরে শোরে। ডাকাতদের চিনেছে নাকি বাড়ীর লোকেরা!

(হেলু ডাক্তার সাইকেলের বেল বাজিয়ে ওদের পাশ দিয়ে চলে যায়)

২য় যুবক : হেলু ডাক্তার রুগী দেখে ফিরে যাচ্ছে। (পরিহাসের কণ্ঠে) সমাজসেবী ডাক্তার! একটা ভন্ড!

৩য় যুবক : আমজাদের আব্বাকে 'মীরচাচা' ডেকে ডেকে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার তালে আছে।

১ম যুবক : আমাদের সঙ্গে আমজাদ দেশের জন্য কাজ করে বলে মীরসায়েব আমজাদের উপর নাকি খুশী নন!

২য় যুবক : ওই ডাক্তারই তো নানা কথা লাগিয়ে মীর সায়বের মনটা বিষিয়েছে!

(ওরা পথ চলে)

(সন্ধ্যা নামছে। মসজিদের প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মীর সাহেব ও মুয়ায্যিন। হেলু ডাক্তার সাইকেলটা এক স্থানে রেখে কাছে আসে)

মীর সাহেব : আজকের মত রুগী দেখা শেষ হল হেলুমিয়া?

হেলু ডাক্তার : জ্বি মীরচাচা। রাত্রে কোন রুগী না এলে আজকের মত শেষ।

মীর সাহেব : এই টানা-হিঁচড়ার দিনে রুগীরা ওষুধ-পথ্য কিনতে পারে তো?

হেলু ডাক্তার : যারা পারে না, তাদের জন্য মীরবাড়ীর কল্যাণ-তহবিল তো আছেই, কি বলেন মুয়ায্যিন সায়েব?

মুয়ায্যিন : জ্বি, কথাটা চাইরদিকের লোকজনেরা জানে।

মীর সাহেব : মীরবাড়ীর এসব রীতি-নীতি শেষ হয়ে আসছে মুয়ায্যিন সায়েব! আমাদের পর এ কল্যাণ-তহবিল কি আর থাকছে?

মুয়ায্যিন : আল্লা' চাহে তো ছেলেরা বাপদাদার এইসব রীতি-নীতি তো বজায় রাখতেও পারে মীরসায়েব!

www.pathagar.com

মীর সাহেব : বড় ছেলে সাজ্জাদ তো চাকরী নিয়েই ব্যস্ত। আর ছোটটি– ওই আমজাদ — কোথায় থাকে, কি করে আল্লা'ই জানেন!

(শহরে পার্কের এক স্থান থেকে বেড়াতে বেড়াতে অন্য স্থানে এসে দাঁড়ায় সোমা ও আমজাদ)

সোমা : আমজাদ! আমার ব্যবসায়ী বাবার প্রধান উপদেষ্টা হচ্ছেন আমার সৎমা। পাশাপাশি গাঁয়ে আমাদের বাড়ী হলেও তোমার মত একজন ছন্নছাড়ার সঙ্গে আমার এতটা ঘনিষ্ঠতা তাঁরা না–ও চাইতে পারেন।

আমজাদ : মীরবাড়ীর সঙ্গে তোমার বাবার সুসম্পর্ক নেই তা জানি। কিন্তু মীরদের ছেলে হয়েও আমি তো তোমার বাবার সঙ্গেই দেশের জন্য কাজ করছি। তবুও এ ছন্নছাড়াটির ওপর তাঁদের এ বিরূপতার কারণ?

সোমা : কারণটা সময়ে নিজেই বুঝতে পারবে।

আমজাদ : সোমা, আমজাদ ভীরু কাপুরুষ নয়। আমি তোমার মতামতটা জানতে চাই।

সোমা : দেশের জন্য স্বপ্ন যদি দেখতেই হয়, নিজের চোখেই সে–স্বপ্ন দেখ। অন্যের চোখে দেখা স্বপ্ন যদি ভেঙ্গে যায়, তাহলে সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

(দু'জন দু'জনকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে। সোমা আমজাদের হাতে নিজের হাত রাখে)

(রাত। মীর–বেগম বিছানায় বসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মেয়ে ফাতেমাকে বলেন–)

মীর–বেগম : শহর থেকে আমজাদের ফিরে আসতে দেরী হচ্ছে কেন রে ফাতেমা?

ফাতেমা : কাজকাম সেরে আসতে সময় লাগছে হয়তো! আপনি এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবেন না আম্মা। আপনার আমজাদ এখনো সেই ছোট খোকাটি আছে নাকি? অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ুন।

(বিছানায় মা–কে শু'তে সাহায্য করে ফাতেমা। তখনই বারান্দায় এসে আসাদ ডাকে–)

www.pathagar.com

আসাদ : আম্মা, আম্মা কি জেগে আছেন?

ফাতেমা : এস, ঘরে এস।

(আসাদ গম্ভীর মুখে ঘরে আসে)

কি, কি হয়েছে?

আসাদ : বেপারী বাড়ীর ডাকাতি কেসে আমজাদকেও আসামী করা হয়েছে। বডি ওয়ারেন্ট। পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে।

(নির্বাক স্তব্ধ মীর-বেগম, নির্বাক ফাতেমা-আসাদ)

(বিকাল। বারান্দায় বসে আছেন ভগ্নস্বাস্থ্য মীর সাহেব, পাশে দাঁড়িয়ে হেলু ডাক্তার)

মীর সাহেব : সাজ্জাদ বিদেশে ট্রেনিং-এ। আমজাদ পলাতক। আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। স্থির করেছি, জায়গা-জমি সম্পর্কে একটা উইল করব। তার ব্যবস্থা কর হেলুমিয়া।

(হেলু ডাক্তার অবাক হয়)

(সাইকেলে যাচ্ছে হেলু ডাক্তার। প্রথমে সাইকেলের চলন্ত চাকা দেখা যাবে, তারপর হেলু ডাক্তারের মুখ, আবার চলন্ত চাকা দেখা যাবে। এর ওপরই নাটকের টাইটেল যাবে। টাইটেলের শেষ দিকে আবার দেখা যাবে চলন্ত সাইকেলের চাকা ও শোনা যাবে মুয়াযৃযিনের কণ্ঠ। ....দিন। মসজিদের প্রাঙ্গনে কথা বলছে মুয়াযৃযিন ও আনুর বাপ)

মুয়াযৃযিন : দেখতে দেখতে কত সময় চইলা গেল আনুর বাপ। এর মধ্যে খালি হইয়া গেল মীরবাড়ীটা। এই মীরবাড়ী আর তার জায়গা-জমির দায়িত্ব নিয়া মহামুস্কিলে পড়ছেন হেলুমিয়া সায়েব!

আনুর বাপ : উইল করার পরেই মারা গেলেন মীর সায়েব। মাথাডা খারাপের মত হইয়া গেল মীর-বেগমের। বিদেশ থনে আইসা সাজ্জাদ মিয়া সেই মায়েরে নিয়া গেল ঢাকায়।

(সাইকেলসহ হেলু ডাক্তার এসে তাদের কাছে বসে)

মীরবাড়ীতে ফুট-ফরমাইশ কইরা দিনপাত চালাইতাম। অখন তো দুই চউখে অন্ধকার!

www.pathagar.com

হেলু ডাক্তার : কেমন করে হঠাৎই সেই সুখের দিনগুলো পলাতক হয়ে গেল। — মিথ্যা করে আমজাদকে আসামী করা হল ডাকাতি কেসে।

মুয়ায্যিন : ডাক্তার সায়েব, বেপারী বাড়ীর লোকেরা আপনারে মানে-গণে, সম্মান করে। আপনে যদি তাগো বুঝাইয়া ক'ন —

হেলু ডাক্তার : আমাকে তা বলে দিতে হবে না মুয়ায্যিন সায়েব। কিন্তু মানুষও তো কখনো শয়তানের স্বভাব নিয়ে মানুষেরই মধ্যে চলাফেরা করে। তাছাড়া কেস করা হয়েছে অনেকদিন আগে!

(মুয়ায্যিন ও আনুর বাপ কথাটা মেনে নেয়)

(বিকাল। গলুই দেওয়া নৌকায় যাচ্ছে আমজাদ ও সেই তিনজন যুবক। বোঝা যায়, ওরা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য সচেষ্ট। প্রথমেই দেখা যাবে– পানি ভেঙ্গে ভেঙ্গে নৌকার দাড় এগিয়ে যাচ্ছে। পরে কথাবার্তা বলে তারা)

আমজাদ : সব কিছু যেন কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

১ম যুবক : এ দুনিয়াতে মানুষের ভেতরটা জানা আর নদীর তলদেশকে জানা একই রকম কঠিন।

২য় যুবক : আমাদের বস্ বেশ জেনেশুনেই সেদিন বললেন– আমজাদকে ডাকাতি কেসে জড়ানো আর মীরদের সব সম্পতি উইল মারফত দখল করা সবই হচ্ছে ওই হেলু ডাক্তারের চক্রান্তে!

৩য় যুবক : বস্ তো বললেন– এই চক্রান্ত থেকে আমজাদকে তিনি মুক্ত করবেনই!

(আমজাদের চোখে ভাসে সোমার মুখ)

আমজাদ : সোমার সঙ্গে তোমরা যোগাযোগের চেষ্টা কর। সঙ্গে সঙ্গে আম্মার খবরটাও জানবে।

(পানি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দাড় এগিয়ে চলে)

(ঢাকায় সাজ্জাদের বাসা। একটা রুমে মীর-বেগম বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর মাথার কাছে ও পায়ের কাছে রয়েছে সাজ্জাদ ও সুরাইয়া। তখন রাত)

www.pathagar.com

সাজ্জাদ ঃ এমন সব দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের কারুরই ছিল না আম্মা। এখন বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখি না! জায়গা-জমি নিয়ে ...

(সুরাইয়া চোখের ইশারায় সাজ্জাদকে থামিয়ে দেয়)

সুরাইয়া ঃ আপনাকে নিয়েই আমাদের যত চিন্তা। কিন্তু ডাক্তার সব কিছু পরীক্ষা করে বললেন- চিন্তার কোন কারণ নেই। হঠাৎ করে মনে এতটা ধাক্কা লেগেছে বলেই স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙ্গে পড়েছে। কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই তা সেরে যাবে।

সাজ্জাদ ঃ (সুরাইয়াকে) অফিসের কাজ নিয়ে আমাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। আম্মাকে দেখাশুনার পুরো দায়িত্বই কিন্তু তোমার!

মীর-বেগম ঃ আমার মেয়েরা কাছে নেই। কিন্তু বউমা এখানে তাদের অভাব পূরণ করতে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে রে সাজ্জাদ। এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। বউমার নিজের মেয়েকে তো সারাক্ষণ সামলাচ্ছে করিমের মা! শুনলাম- হেলুমিয়ার চিঠিপত্র আসে। তুইও উত্তরে তার কাছে চিঠি লিখিস!

(কথা বলতে গিয়ে কিছুটা হাঁপিয়ে ওঠেন। সুরাইয়া শ্বাশুড়ীর কপালে হাত বুলাতে থাকে)

(আমজাদের নৌকা এসে পারে লেগেছে। ১ম যুবক আমজাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে)

১ম যুবক ঃ আমি তাহলে এখানেই নেমে থাকলাম আমজাদ। ঢাকা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। মনের সাহস হারিয়ো না।

আমজাদ ঃ (নিঃশব্দে হাসে) আমাদের এসব যোগাযোগের ব্যাপার যেন ফাঁস না হয়-. সেদিকে খেয়াল রেখো। আমার দুলাভাই ওই আসাদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হলে প্রয়োজনীয় কথা তাকে বলতে পার।

(১ম যুবক নৌকা থেকে নেমে আমজাদদের কাছ থেকে বিদায় নেয়)

www.pathagar.com

(সাজ্জাদের বাসা। তখন দিন। মীর-বেগমের পাশে রয়েছে সুরাইয়া। বাসার গেটে কে বেল বাজায়)

সুরাইয়া ঃ করিমের মা! দেখ, দরজায় কে বেল বাজায়। ... কে এল, আমি দেখে আসি আম্মা!

(বেরিয়ে যায় সুরাইয়া। অধীর আগ্রহ নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন মীর-বেগম)

(সাজ্জাদের ড্রইং রুমে ঢুকে সুরাইয়া দেখে- সোমা সালাম জানিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে)

সোমা ঃ আপনি তো সুরাইয়া ভাবী? আমি সোমা।

(মৃদু হেসে সুরাইয়া সোমাকে বসতে বলে)

সুরাইয়া ঃ নামে তোমাকে আগে থেকেই জানি। আজ দেখলাম। বড় মিষ্টি মেয়ে।

সোমা ঃ (লজ্জা কাটিয়ে নিয়ে) আপনার দেবরকে এই মিথ্যার হাত থেকে বাঁচানোর অনুরোধ নিয়ে আপনি ছাড়া আর কারও কাছে আমি যেতে পারি না। জানি, আপনারা এমনিতেই সে চেষ্টা করবেন। তবুও ....

সুরাইয়া ঃ মুস্কিল হল কি জান - মামলাটা এমনই বিশ্রী ধরণের যে একজন আসামী সারেন্ডার করলেই কেসটা কোর্টে উঠবে না। আগে ধরা পড়তে হবে সকল আসামীকেই!

সোমা ঃ কিন্তু পলাতক হয়ে থাকতে ওর যে খুবই কষ্ট হচ্ছে ভাবী!

(বলেই লজ্জায় চোখ নত করে। সুরাইয়ার মুখে হাসি। তখনই দরজায় বেল বাজে। সুরাইয়া হাতের ঘড়ি দেখে নিজেই ড্রইংরুমের দরজা খুলে দেয়। রুমে ঢোকে অফিস-ফেরত সাজ্জাদ)

সুরাইয়া ঃ এই-ই হচ্ছে সোমা যার কথা তোমাকে আগেই বলেছি।

(সোমা দাঁড়িয়ে সাজ্জাদকে সালাম জানায়)

সোমা ঃ সাজ্জাদ ভাইকে আমি আগে থেকেই চিনি ভাবী!

সাজ্জাদ ঃ আমরা তো একই এলাকার লোক। তারপর, তোমরা সব ভাল আছ তো সোমা?

সোমা ঃ জ্বি, ভাল।

www.pathagar.com

সাজ্জাদ ঃ বস, আমি আসছি। সুরাইয়া, একই এলাকার লোক হলেও সোমা এ বাসায় এই প্রথম এল।

সুরাইয়া ঃ তুমি কাপড়চোপড় ছেড়ে এস। সোমার আদর-যত্ন নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

(সাজ্জাদ চলে যায়। সুরাইয়া ও সোমা আবার বসে)

(রাত। নদীর ধারে একটা গাছের নীচে কথা বলছে আমজাদ ও আসাদ। পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেমা)

আমজাদ ঃ তাহলে এই কথাই থাকল দুলাভাই!

আসাদ ঃ কিন্তু খুব সাবধান। আমাদের শত্রুর অভাব নেই!

(আসাদ চলে যেতে পা বাড়ায়)

ফাতেমা ঃ আমজাদ!

আমজাদ ঃ ছোট বু'!

(দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে)

যাই রে ছোট বু'!

(চলে যায় আমজাদ। ফাতেমা একটু এগিয়ে যায়, মনে মনে আল্লা'র কাছে প্রার্থনা করে)

(দিন। পার্কে বসে কথা বলছে সোমা ও ১ম যুবক। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে ২য় যুবক)

সোমা ঃ দেশের অবস্থা তো এখন দ্রুত বদলাচ্ছে। এই পরিবর্তনের দিনে আপনাদের নতুন কার্যক্রম কি?

১ম যুবক ঃ কার্যক্রম এখনও স্থির করা হয় নি। তবে ভাবনা-চিন্তা চলছে।

(২য় যুবক এগিয়ে আসে)

২য় যুবক ঃ আমাদের এলাকায় লোকজন আবার মিইয়ে পড়েছে। আপনার বাবা .... মানে আমাদের বস্ সেদিন বললেন- এই মিইয়ে যাওয়ার পেছনে মীর সায়বের উইল আর হেলু ডাক্তারের কার্যকলাপ অনেকাংশে কাজ করছে।

সোমা ঃ বসের বরাত দিয়ে বক্তব্য থেকে নিজেদের আড়াল করছেন কেন? নিজেরা স্বাধীনভাবে ভাবতে পারেন না? আমজাদ মীর তো আপনাদের হয়েই কাজ করছেন!

www.pathagar.com

৩য় যুবক ঃ মনে হচ্ছে, মীরদের জন্য ম্যাডামের মনে একটা সফ্‌ট্‌ কর্ণার রয়েছে?

সোমা ঃ (কিছুটা রেগে) বড় দেরীতে বুঝলেন মনে হয়? যাক, এবার আমাকে উঠতে হচ্ছে।

(বলেই উঠে চলে যায় সোমা)

১ম যুবক ঃ ঠিকমত রসিকতাটাও করতে জান না। দিলে তো বিগড়ে! যাই, বাকী কিছু কথা সেরে আসি।

(সেও চলে যায়। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ২য় যুবক)

(সন্ধ্যা হয়-হয়। মীরদের ঘরের আঙিনা। বারান্দায় বসে দাঁড়িয়ে কথা বলছে মাজেদা, ফাতেমা ও আসাদ)

মাজেদা ঃ এই খালি বাড়ীটা কেন যে দেখতে এলাম!

ফাতেমা ঃ না এলেও তো মন মানে না মাজেদা বু'!

মাজেদা ঃ আমজাদ এখন কোথায় কেমন আছে তা জানা গেল আসাদ?

আসাদ ঃ জ্বি, সে এক গোপন আশ্রয়ে ভালই আছে।

ফাতেমা ঃ মুখলেস সায়বের মেয়ে সোমা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছে- সে সাজ্জাদ ভাইয়ার বাসায় গিয়ে সুরাইয়া ভাবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। ভাইয়া-ভাবীর কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্যের আশ্বাস না পেলেও তার বিশ্বাস- আমজাদ আসামীর চার্জ থেকে মুক্তি পাবেই!

মাজেদা ঃ মুখলেস সায়েবও নাকি আমজাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে!

আসাদ ঃ কিন্তু আমি তো শুনতে পেলাম- দেশের বর্তমান অবস্থায় সম্ভাব্য বিপদ-আপদ এড়ানোর জন্য তিনি সপরিবারে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন!

ফাতেমা ঃ কিন্তু সোমা যাচ্ছে না। সে হলে থেকেই পড়াশুনা করবে এখানে।

মাজেদা ঃ সোমা কিন্তু এক অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে!

ফাতেমা ঃ হ্যাঁ, সোমারা আজকাল নতুন রূপেই দেখা দিচ্ছে।

(মাজেদার স্বামী আসে)

মাজেদা ঃ আমার এখন যেতে হয় রে ফাতেমা!

ফাতেমা ঃ আমরা কিছুক্ষণ পরে যাব।

(স্বামীর সঙ্গে মাজেদা চলে যায়)

www.pathagar.com

(রুগী দেখে সাইকেলে চড়ে বাড়ী ফিরছে হেলু ডাক্তার। রাস্তায় দাঁড়ানো কয়েকজন চাষীকে দেখে সাইকেল থেকে নামে)

১ম চাষী : মীর সায়বের সব কয়টা ক্ষেতেই এইবার ভাল ধান হইছে ডাক্তর সায়েব।

২য় চাষী : কার্তিক শাইল ধান, কাটবার সময় হইয়া গেছে।

৩য় চাষী : ধান কাটার মওসুমে মীর-বেগমরে বাড়ীতে নিয়া আইবেন কইছিলেন!

হেলু ডাক্তার : ভাবছি- দু'একদিনের মধ্যেই ঢাকায় যাব। যাক, সন্ধ্যা হয়ে গেল, চলি। তোমরা ধান কাটার আয়োজন কর।

(সন্ধ্যা। মীরদের ঘরের বারান্দায় কথা বলছে ফাতেমা ও আসাদ)

ফাতেমা : এই ঘরটায় আমরা সবাই থাকতাম। এ বাড়ীতে তখন কারুরই বিয়ে হয় নি। সাজ্জাদ ভাইয়া, মাজেদা বু', আমি, আমজাদ- আমরা সবাই থাকতাম ওই ঘরটার আলাদা আলাদা কোঠায়।

আসাদ : (মুখে মৃদু হাসি) অতীতের স্মৃতিচারণ করতে খুব ভাল লাগে- না?

ফাতেমা : স্মৃতিই তো এখন একমাত্র অবলম্বন। কী যে হাসিখুশী আনন্দ তখন এ বাড়িটা ঘিরে! ভাইয়াকে নিয়ে আব্বার কত আশা! আশা আমাদের সবাইকে নিয়েই! দু'চার গাঁয়ের লোকজন কেউ না কেউ নানা প্রয়োজনে আসছেই আব্বার কাছে। বিকালে পাড়াপড়শী মহিলারা আসছে আম্মার কাছে। আসছে তাদের সুখ-দঃখের কথা নিয়ে!

আসাদ : বুঝতে পারি ফাতেমা, তোমার স্মৃতিভরা দিনগুলো আমার কাছেও পরিচিত। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, পাড়াপড়শীর সুখ-দুঃখ ....

ফাতেমা : এখনও সেই ক্ষেতের মত ক্ষেত আছে, পুকুর আছে, সব কিছুই তো আছে! কিন্তু সব যে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল! ওই যে দেউড়ীর ওদিকে আমগাছটা- কাঁচামিঠা আম। আর

www.pathagar.com

ওই যে ওখানে বরই গাছ .... তার বরই যে কী মিষ্টি! .... একি, তুমি হাসছ যে?

আসাদ : বাংলাদেশের মেয়ের কথা, গাঁয়ের এক বউয়ের কথা শুনছি। হাসিটা পরিহাসের নয়, হৃদয়ের অনুভবজাত খুশীর।

ফাতেমা : জান, আমাদের না একটা কাজলী গাই ছিল। বিয়ের পর তোমাদের বাড়ী থেকে এখানে নাইয়র এলেও আমাকে চিনত। অজানা কেউ কাছে গেলে কি রকম শিং উঁচিয়ে মারতে আসত যে! নাইয়র এসে আমি কতদিন কাছে গেছি। কিচ্ছু করত না। গলায় হাত বুলিয়েছি। শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

(এ দৃশ্যটাও প্রায়–অস্পষ্টভাবে ফাতেমার চোখে ভাসবে)

তুমি আর কিছু ভাবছ যেন?

আসাদ : না না, কিছু ভাবছি না। তুমি বলে যাও।

ফাতেমা : (নিম্ন কণ্ঠে) কিন্তু সে আসতে এত দেরী করছে কেন?

আসাদ : (নিম্নকণ্ঠে) তার সুবিধামত আসতে হবে তো! .... হ্যাঁ, বলছিলে কাজলী গাইটার কথা।

ফাতেমা : (আগের মতই উৎফুল্ল কণ্ঠে) কাজলী গাইটার অনেক দুধ হত। আরও ছিল একটা গাই। এত দুধ আর খায় কে? আম্মা দই পাততেন। বড় টিনে। শেষ রাতে ওই ডাকগাড়ীটা যেত যখন, আম্মা উঠে পড়তেন। তাহাজ্জুদ পড়ে দই থেকে মাঠা করবেন। দইয়ের টিনে খাগড়াই ডুবিয়ে খাগড়াইয়ের অন্য মাথার দিকটায় বাঁধা দড়ি ধরে দুই হাতে আগা–পাছা করে টানতেন আম্মা। জোরে। শব্দ হত গড়্ড়্ .... গড়্ড়্ ....

(কল্পনায় সেই শব্দ ফাতেমার কানে ভেসে আসে যেন)

সকালে উঠে সেই মাঠা খেতে হত সবাইকে। গাঁয়ের লোকজনও এসে খেয়ে যেত। আর খেতে হত মাখন। ভাতের সঙ্গে। কিন্তু আমজাদ এসব কিছুই খাবে না। আম্মার কত সাধ্য–সাধনা .... কিন্তু আমজাদ বাগ মানতো না কিছুতেই। (হাসতে হাসতে) আম্মা গিয়ে হাত ধরতেন, আর আমজাদ আম্মার হাত ছাড়িয়ে পালাত– দৌড়াত .... আম্মাও পেছনে পেছনে ....

www.pathagar.com

(হাসতে থাকে ফাতেমা। হঠাৎ হাসি থামিয়ে দেখে- হেলু ডাক্তার এগিয়ে আসছে। মুহূর্তে শীতল কণ্ঠে বলে-)

ওই হেলু ডাক্তার!

হেলু ডাক্তার : ফাতেমা- আসাদ, তোমরা! আমি অবশ্য প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর বাড়ীটার খোঁজ-খবর নিতে আসি। আজ হঠাৎ শুনি- তোমরা কথা বলছ।

আসাদ : এমনিতে আসা তো হয়েই ওঠে না। আজ মাজেদা বু' আর একে নিয়ে ...

হেলু ডাক্তার : মাজেদা কই?

ফাতেমা : মাজেদা বু'রা চলে গেছেন! আমি ঘরের ভেতরটা একটু ঘুরে দেখে আসি। তোমরা কথা বল।

(ফাতেমা ঘরে যায়)

আসাদ : আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখ্খুনি বাইরে থেকে আসছি!

(আসাদও বাইরে যায়। হেলু ডাক্তার বেশ সন্দিগ্ধ। তখনই ঘরটার পাশের অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসে আমজাদ। অবাক হয়ে যায় হেলু ডাক্তার)

আমজাদ : (গম্ভীর নিম্নকণ্ঠে) ডাক্তার ভাই! আপনি এসময়ে .... এখানে?

হেলু ডাক্তার : আমাকে তো রোজই একবার করে আসতে হয় এখানে!

আমজাদ : ডিউটি করতে বুঝি?

(ডাক্তারের মুখ অন্ধকার। তবুও কিছুটা হাসি এনে কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে-)

হেলু ডাক্তার : আমজাদ! কোন যোগাযোগই রাখছ না আমার সঙ্গে .... এতদিন কোথায় ছিলে, কোথায় আছ?

আমজাদ : এদেশেরই আনাচে-কানাচে, বনে-জঙ্গলে।

হেলু ডাক্তার : (সন্দিগ্ধ কণ্ঠে) এখানে এসে রাতে বাড়ীঘর দেখতে রয়ে গেল আসাদ-ফাতেমা, তারপর এলে তুমি। মনে হয়, আগে থেকেই একটা যোগাযোগ ....

আমজাদ : ছিল। ফেরারী এক আসামীর পক্ষে এমনটি করা ছাড়া আর উপায় কি?

হেলু ডাক্তার : আমার সম্পর্কে কিছু কথা ছড়ানো হয়েছে জানি। তুমিও কি সেসব ....

www.pathagar.com

আমজাদ ঃ এসব কথা থাক। এক সময় যা ছিল আমাদের মীরবাড়ী, আজ সেই নীরব আর বোবা বাড়ীটাই দেখতে এলাম!

হেলু ডাক্তার ঃ (আহত কণ্ঠে) বাইরে গিয়ে আমি আসাদকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(চলে যায়। আমজাদ নির্বাক। ঘরের ভেতর থেকে আসে ফাতেমা)

আমজাদ ঃ ভাল আছিস ছোট বু'?

ফাতেমা ঃ (কান্নাভেজা কণ্ঠে) হ্যাঁ, ভাল।

(কয়েক মুহূর্তের নীরবতা)

কতদিন পর তোকে দেখলাম! কত দিন কত রাত .... অসহায় উদ্বিগ্ন আমার সারাটা মন। তারপর .... হ্যাঁ .... জানিস, সোমা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। মাধ্যম তোর দুলাভাই আর চিঠিপত্র।

আমজাদ ঃ জানি। .... ছোট বু', কাউকে আর বিশ্বাস করতে না পেরে আমি এক শূন্যতার রাজ্যে বাস করছি। রাতের আকাশের দিকে যখন তাকাই, অনেক মেঘের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে পড়া তারাগুলোকে পরিহাস করতে দেখি! আজও এখানে এলাম, হেলু ডাক্তারও এসে হাজির!

ফাতেমা ঃ মেঘগুলো শিগগীরই সরে যাবে রে আমজাদ! আমরা আবার দেখব– আকাশ ভরে তারার ফুল ফুটেছে!

আমজাদ ঃ আমার জন্য নাকি শ্বশুরবাড়ীতে তোদের অনেক কথা শুনতে হয়?

ফাতেমা ঃ সকলের ব্যতিক্রম তোর ওই দুলাভাই। তাই কোন কথাই আমার গায়ে লাগে না রে!

(ফাতেমা শাড়ীর ভাঁজ থেকে একটা কাগজের ছোট পোটলা বের করে। সেটা থেকে দু'টি নাড়ু বের করে ফাতেমা)

আমজাদ ঃ এ কি! তিলের নাড়ু বের করে আমাকে দিচ্ছিস ছোট বু'?! সেই ছেলেবেলার মত!

ফাতেমা ঃ নে, খা'। লোক জানাজানির ভয়ে আর তো কিছু আনতে পারি নি!

আমজাদ ঃ আমার হাত যে ময়লা ছোট বু'!

ফাতেমা ঃ আমি মুখে তুলে দিই, তুই খা'। বাকীগুলো সঙ্গে নিয়ে যা। খালি বাড়ীতে এসেছিলি– মনে করিস, আম্মা দিলেন!

www.pathagar.com

আমজাদ ঃ (আত্মগতভাবে) আম্মা!

(ততক্ষণে অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে আসাদ। নীরবে দেখছে–ফাতেমা তিলের নাড়ু আমজাদের মুখে তুলে দিচ্ছে)

(দিন। মস্‌জিদের প্রাঙ্গনে চাষীরা, মুয়াযযিন, আনুর বাপ সবাই আছে। হেলু ডাক্তার তাদের সামনে কথা বলছে)

হেলু ডাক্তার ঃ বেপারী বাড়ীর ডাকাতি কেস কোর্টে উঠছে। উঠুক, এটা আপনাদের কোন ব্যাপার নয়।

আনুর বাপ ঃ কিন্তু মীরবাড়ীর সকল বিপদের লাইগ্যা আপনেরে যে সন্দে করে মীরসায়বের মেয়ে–ছাওয়ালরা! মীর সায়বেরে দিয়া উইলও নাকি আপনে করাইছেন! এই অবস্থায় ধান কাটার সময় আইলো, তাই ভাবতাছি ....

হেলু ডাক্তার ঃ আপনারা ধান কাটার সব ব্যবস্থা করে রাখুন। আমি ঢাকায় যাব মীর–বেগমের কাছে।

মুয়াযযিন ঃ আল্লাহ্ য্যান্ আপনের মকসুদ পুরা করেন। আমার মনে অয়, মীর–বেগম সক্কলের ভুলডা বুঝতে পারবেন!

হেলু ডাক্তার ঃ আপনারা দোয়া করুন, আস্‌সালামু আলাইকুম।

সকলে ঃ ওয়ালাইকুমুস্ সালাম।

(ট্রেন ছুটে চলেছে)

(সাজ্জাদের সাজানো ড্রইংরুমে বসে আছে হেলু ডাক্তার। বাইরে বেরুবার জন্য শার্ট–টাই ঠিক করতে করতে সেখানে আসে সাজ্জাদ)

সাজ্জাদ ঃ এই যে হেলু ভাই! হঠাৎ এই রাজধানীতে?

হেলু ডাক্তার ঃ মাঝে মধ্যে রাজদর্শন করতে হয় তো, তাই রাজধানীতে।

সাজ্জাদ ঃ রাজদর্শনের জন্য রাজা তো চাই!

হেলু ডাক্তার ঃ রাজার অভাবে রাজপুরুষ। তোমার নতুন প্রমোশনের খবর রাখি হে সাজ্জাদ মীর!

সাজ্জাদ ঃ মেনি থ্যাঙ্কস্। তারপর? (বসে) গ্রামে তোমার ডাক্তারি কেমন চলছে?

হেলু ডাক্তার ঃ গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার, সাধ্যমত হাতুড়ী চালিয়ে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

সাজ্জাদ ঃ অর্থাৎ সেই আগের মত সদাব্যস্ত? যেখানেই মানুষের বিপদ, সেখানেই হেলু ডাক্তার?

হেলু ডাক্তার ঃ ঢেঁকি তো! যেখানেই থাকি, ধান ভানা ছাড়া উপায় কি বল!

সাজ্জাদ ঃ চেহারা বেশভূষায় তেমনি অগোছালো রয়ে গেছ দেখছি। এর মধ্যে আয়–উপার্জনও বেড়েছে নিশ্চয়?

হেলু ডাক্তার ঃ আয় খুব একটা না বাড়লেও দায় বেড়েছে। আর চেহারা–সুরতের কথা বলছ? জন্মে যেখানে জীবন কাটাচ্ছি, সেখানকার চেহারা–সুরত আরও অগোছালো। ... এই রাতে কোথাও যাচ্ছ নাকি?

সাজ্জাদ ঃ হ্যাঁ, শ্বশুরের বাসায় জরুরী তলব। শ্বশুর–কন্যাও সঙ্গে যাচ্ছেন।

(উঠে দাঁড়ায়)

ফিরে এসে কথাবার্তা বলব ডাক্তার। একটা কথা .... যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, তিনি এখ্খুনি আসছেন। মন–মেজাজের দিক দিয়ে আম্মা এখনও আগের মতই বিপর্যস্ত। তাই বাড়ীর কথাবার্তা বলার সময় আমরা সাবধান থাকি।

হেলু ডাক্তার ঃ আমজাদের ব্যাপারটাই বিশেষ করে বলছ তো? সাবধানই থাকব।

সাজ্জাদ ঃ আসি ডাক্তার।

(সাজ্জাদ চলে যায়)

(বরান্দায় কথা বলছে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরী সুরাইয়া ও সাজ্জাদ)

সুরাইয়া ঃ দেরী করে ফেললে তো!

সাজ্জাদ ঃ গাড়ীতে যেতে পুষিয়ে যাবে। খুকুমণি যাবে না?

সুরাইয়া ঃ না, সে আম্মার গলা জড়িয়ে আছে। কত সাধলাম, কিছুতেই আসবে না। এত দাদী–ঘেঁষা হয়েছে!

সাজ্জাদ ঃ এমনটি না হলে আম্মার সময় আরও অস্বস্তিতে ভরে উঠত। ওকে নিয়ে সময়টা কোন রকমে কাটছে আম্মার।

(চলে যায় দু'জন)

www.pathagar.com

(ড্রইংরুমে করিমের মা'র সাহায্যে মীর-বেগম এগিয়ে আসেন, সঙ্গে কুখুমণি। হেলু ডাক্তার দাঁড়িয়ে সালাম জানায়। মীর-বেগমের সঙ্গে সঙ্গে হেলু ডাক্তারও বসে। চলে যায় করিমের মা)

মীর-বেগম : তোমরা সবাই কেমন আছ হেলুমিয়া? আমাদের বাড়ীটা? ঘর-দুয়ার?

হেলু ডাক্তার : বাড়ীটা খালি পড়ে আছে তো! আনুর বাপ ঝাট দিয়ে রাখে। মীরচাচা নেই, আপনাকেও সাজ্জাদ নিয়ে এল এখানে। আমরা তাই বড় একা!

মীর-বেগম : (প্রায় আপন মনে) সবাই তো একা! মীর সায়েব সব কিছু ফেলে হঠাৎই চলে গেলেন একা! আমি এখানে পড়ে রইলাম একা! যার-যার শ্বশুর বাড়ীতে মেয়েরাও হয়তো একাই! ... জান হেলু মিয়া, আমার যে কি হয়েছে ঠিক বুঝতে পারি না। একে-তাকে-কতজনকে যে তন্দ্রাঘোরে স্বপ্নে দেখি! এক সময় স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আমি রাতভর জেগে থাকি— একা!

(মীর-বেগমের মনের কোমল তন্ত্রীতে স্পর্শ করার ইচ্ছা নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে হেলু ডাক্তার বলে-)

হেলু ডাক্তার : গাঁয়ের বাড়ীতে যেতে ইচ্ছা করে না চাচী?

মীর-বেগম : করে। এখন-তখন মনে হয়- গাঁয়ের বাড়ীতেই যেন বসে আছি! সেই যে শেষ রাতে ডাকগাড়ীটা যেত, কানে ভেসে আসে সেই গাড়ীটার শব্দ! তখন তোমার চাচা উঠে পড়তেন, তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য। উঠে পড়তাম আমিও! মনে হত, শুভ সংবাদ নিয়ে ডাকগাড়ীটা আসে! কিন্তু ....

(চা-নাশতা নিয়ে আসে করিমের মা। খুকুমণি দাদীর পাশে দাঁড়িয়ে হেলু ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে দেখছে)

খাও বাবা, নাশতা খাও।

(নাশতা খেতে খেতে কথা বলে ডাক্তার)

হেলু ডাক্তার : এই বাসাটাও চমৎকার চাচী। আপনার বউমার হাতে বেশ সাজানো-গোছানো।

মীর-বেগম : তোমার চাচা বলতেন- শহরে আমাদের একটা সুন্দর বাসা হবে। বেড়াতে আসব আমরা। কয়েকদিন থেকে আবার চলে যাব গাঁয়ের বাড়ীতে। ছুটি-ছাটায় ছেলেরা বউ-নাতিদের নিয়ে

www.pathagar.com

গাঁয়ের বাড়ীতে যাবে। মেয়ে–জামাইরাও আসবে বেড়াতে। পুকুর থেকে লোকজন নামিয়ে মাছ ধরবে, গাছ থেকে পাড়বে আয়ামী ফল— আম, কাঁঠাল! মীর সায়েব কত কি যে কল্পনা করতেন!

(আবার যেন অতীত স্বপ্নে ডুবে যেতে থাকেন মীর–বেগম)

(বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছেন মীর–বেগম। স্বপ্নে দেখছেন– মীর সাহেব গলা খাকারী দিয়ে বাড়ীর ভেতরে আসছেন। এসেই দেখেন—বড় মেয়ে মাজেদা ও বড় জামাই হাসিমুখে এসে তাঁকে সালাম করছে। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা থেকে এসে তাঁকে সালাম করছে ফাতেমা ও আসাদ। হাসিমুখে মীরসাহেব তাদের দোয়া করছেন। তখনই বাইরে লোকজনের হৈ চৈ–এর মধ্যে শোনা যায় আমজাদের উল্লসিত কন্ঠ–)

আমজাদ ঃ এসে গেছে! ভাবী–ভাইয়াও এসে গেছে!

(ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে আমজাদ, পেছনে সুরাইয়া–সাজ্জাদ)

আমাদের সুরাইয়া ভাবী .... ভাইয়া ....

(সাজ্জাদ–সুরাইয়া মীরসাহেবকে সালাম করে)

মীর সাহেব ঃ মীরবউ! বেরিয়ে দেখ, আমাদের সবাই আজ মীরবাড়ীতে।

(তন্ময় মীর–বেগমকে ডাকে হেলু ডাক্তার–)

হেলু ডাক্তার ঃ চাচী! মীরচাচী!

মীর–বেগম ঃ (ডাকে সাড়া না দিয়ে) নানা রকম স্বপ্ন দেখি। মীর সায়েব হেঁটে বেড়াচ্ছেন বাড়ীটা— সিঁদুরে আমগাছটার নীচে দিয়ে, পুকুরের দক্ষিণ পাড়টা দিয়ে মসজিদের কাছটায় ....

(মীর–বেগমের চোখে ভাসে প্রায়–অস্পষ্ট মীর সাহেবের ধীরপায় চলার দৃশ্য। তাঁর কন্ঠে নিম্নকন্ঠের প্রতিধ্বনিত দরুদ– "বালাগাল উলা বেকামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বেজামালিহি; হাসুনাত জামিউ খেসালিহি, সাল্লো আলাইহে ওয়ালিহি")

হেলু ডক্তার ঃ চাচী, কিছুদিন আগে স্বামীর সঙ্গে আপনার মেয়েরা এসেছিল খালি বাড়ীটায়। মাজেদারা চলে যাওয়ার পরও আসাদ– ফাতেমা থেকে যায়।

www.pathagar.com

মীর-বেগম ঃ (বাস্তবতায় ফিরে এসে কান্নাভরা কণ্ঠে) কেন, খালি বাড়ীতে ওরা এল কেন?

হেলু ডাক্তার ঃ একটু পরে আপনার আমজাদও এসেছিল!

মীর-বেগম ঃ আমজাদ! ওর নাম আর বলছ কেন? ওই নাম তো কেউ উচ্চারণ করে না! শুনেছি মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতে ওর জন্য কত গঞ্জনা সয়! সাজ্জাদও আর বলে না ওর কথা!

(দাদীর পাশে থেকে উঠে গিয়ে খুকুমণি এবার দাদীর গলা জড়িয়ে ধরে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে)

এই যে খুকুমণি, আমার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে কেন?

খুকুমণি ঃ আমি তোমার গলা জড়িয়ে রাখব দাদী!

মীর-বেগম ঃ বুঝলে হেলু মিয়া, এই নাতিটা হয়েছে আমার এক নতুন বাঁধন।

হেলু ডাক্তার ঃ চাচী, মৃত্যুর আগে মীরচাচা একটা উইল করে গেছেন, তা আপনার মনে পড়ে নিশ্চয়ই?

মীর-বেগম ঃ হ্যাঁ, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে একটা উইল।

হেলু ডাক্তার ঃ এই উইল নিয়ে সাজ্জাদ-আমজাদ আর আমার মধ্যে একটা বিশ্রী রকমের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। মুখলেস সাহেবের প্ররোচনায় এতদিন উইল নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। মাস চারেক আগে তা মিটে গেছে। আমাদের চাষীরা সম্পত্তিতে দখল পেয়েছে। জমি তারা চাষ করেছে। এখন আরম্ভ হবে ধানকাটা। সবাই আশা করছে আপনি বাড়ীতে যাবেন। তারা ফসল তুলে জমা করবে মীরবাড়ীর অঙ্গনে। আপনি দেখবেন। সকলের এই অনুরোধ নিয়ে আমি এসেছি আপনার কাছে।

(খুকুমণি ঘুমের ঘোরে দাদীর কাঁধে ঝুকে পড়ে)

মীর-বেগম ঃ এই যে খুকুমণি, তুই যে ঘুমাস!

খুকুমণি ঃ ঘুমাই না তো! কথা শুনছি।

(খুকুমণি দাদীকে আরও জড়িয়ে ধরে)

মীর-বেগম ঃ এই দেখ, কেমন করে জড়িয়ে ধরে আমাকে!

হেলু ডাক্তার ঃ (হাসিমুখে) আমজাদ যখন খুবই ছোট, তখন সে-ও আপনাকে এমনি জড়িয়ে ধরত চাচী! জড়িয়ে থাকত!

www.pathagar.com

মীর-বেগম : হ্যাঁ, জড়িয়ে থাকত। এখন আর থাকে না। বড় হয়ে এটাও থাকবে না। করিমের মা, খুকুমণিকে নিয়ে যাও।

খুকুমণি : না দাদী, আমি যাব না।

(করিমের মা এসে একরকম জোর করেই খুকুমণিকে কোলে নিয়ে চলে যেতে থাকে। তখনও খুকুমণি বলতে থাকে-)

দাদী, আমি যাব না।

(খুকুমণিকে নিয়ে করিমের মা চলে যায়)

মীর-বেগম : (অস্থিরকণ্ঠে) সেই কবে থেকে আমি জ্বলে মরছি! কিন্তু কেন, কেন এত জ্বলে মরব?

(এবার উচ্চ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠেন মীর-বেগম)

বনে-জঙ্গলে একা পালিয়ে বেড়াচ্ছে আমার আমজাদ! কেন, কেন??

(সোফার ওপরেই ভেঙ্গে পড়েন মীর-বেগম)

হেলু ডাক্তার : করিমের মা!

(করিমের মা আসে ব্যস্তভাবে)

মীরচাচীকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও গে'। আমি কাল আসব।

(করিমের মা মীর-বেগমকে ধরে নিয়ে যায়। ধীরপায় নতমুখে বেরিয়ে যেতে পা বাড়ায় হেলু ডাক্তার)

(সাজ্জাদের বাসার বারান্দা। সকাল। সেখানে কথা বলছে সুরাইয়া, সোমা ও সাজ্জাদ)

সুরাইয়া : কম বয়সের একটি মেয়ে হয়েও আমজাদের জন্য তুমি যা করছ, তার তুলনা হয় না সোমা।

সোমা : আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি বটে। কিন্তু তার সাফল্যের সবটুকু তো নির্ভর করছে আপনাদের উপর!

সাজ্জাদ : ওই কাজটার জন্যই আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। তুমি তোমার হলের গেটে অপেক্ষা করো আমাদের জন্য। শ্বশুরের বাসা থেকে ডিরেক্ট তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। মোকদ্দমার রায় সম্পর্কেও তখন কিছুটা ধারণা দিতে পারব। ও.কে.?

www.pathagar.com

সোমা : ও. কে. ভাইয়া।

(সালাম জানিয়ে চলে যায় সোমা)

সুরাইয়া : শোন, প্রোব্লেম তো একটা নয়, দু'টো। সেকেন্ড প্রোব্লেম মানে উইল সংক্রান্ত ব্যাপার। হেলু ডাক্তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবেন!

সাজ্জাদ : বড় বিপদেই পড়লাম আমি। একদিকে ফ্যামিলি ট্র্যাজেডির এসব ঝামেলা, অন্যদিকে অফিসের পাহাড় প্রমাণ দায়িত্ব।

(তখনই বেল বাজে দরজায়)

সুরাইয়া : নিশ্চয় ডাক্তার এসে গেছেন। করিমের মা, দরজা খুলে দাও। ডাক্তার সায়েব হলে ড্রইংরুমে বসিয়ে আম্মাকে খবর দাও। ... কি করবে এখন?

সাজ্জাদ : ডাক্তার হলে তার সঙ্গে দেখাটা করেই বেরুনো যাক।

(করিমের মা আসে)

করিমের মা : ডাক্তার সায়েব আইছেন।

সাজ্জাদ : আচ্ছা, তুমি আমাদের চা দাও।

(করিমের মা চলে যায়)

চা খেয়ে আমরা দেখা করতে যাব। এর মধ্যে আম্মার সঙ্গে ডাক্তারের আলাপ শেষ হোক।

(সাজ্জাদের ড্রইং রুম। দিন। কথা বলছেন মীর-বেগম ও হেলু ডাক্তার)

মীর-বেগম : আমার স্বাস্থ্যের দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখে সাজ্জাদ আর বউমা। কিন্তু এই বয়সে স্বাস্থ্য আর কত ভাল থাকবে বল।

হেলু ডাক্তার : আপনার চোখেমুখে এখনও একটা আতঙ্ক!

মীর-বেগম : হ্যাঁ, আতঙ্ক। সেই রাতটাতে তোমার চাচা আর আমি চুপচাপ বসে ছিলাম ঘরের বারান্দায়। চারদিকে অন্ধকারে একটা অমঙ্গলের ভাব। এমন সময় শোনা গেল গুলীর শব্দ। আমাদের বাড়ীর লাগোয়া গ্রাম থেকে। দু'জনই আমরা চমকে উঠলাম। পরে শুনলাম- বেপারী বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেছে। পরে আরও জানলাম- তাতে জড়িত আছে আমজাদও! আমার আমজাদ! .... শেষে ফেরারী আসামী হয়ে পালিয়ে গেল! আজ পর্যন্তও আমি তাকে আর দেখলাম না!

www.pathagar.com

হেলু ডাক্তার : তখন থেকে মাঝে মধ্যেই মীরচাচা বিড়বিড় করে বলতেন– মহানগরীর কোলাহলে কাজে নিমগ্ন আমার একজন, অন্যজন বন–জঙ্গরের গহীন নীরবতায় শঙ্কিত সন্ত্রস্ত! তারপর তৈরী করলেন সেই উইল। সেদিন রাতে উইলটা আমার হাতে তুলে দিতে গিয়ে কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না।

(হেলু ডাক্তারের চোখে ভেসে ওঠে সেই রাতের দৃশ্য। বিছানায় অর্ধশায়িত মীরসাহেব উইলটা হেলু ডাক্তারের হাতে তুলে দিচ্ছেন। মীর সাহেবের স্বাস্থ্য তখন খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। কিছু বলতে চাইছেন হেলু ডাক্তারকে, কিন্তু তাঁর ঠোঁট শুধু নড়ছে। চোখে এক আশ্চর্য দৃষ্টি– স্নেহমিশ্রিত দুঃখ আর মিনতিভরা এক দৃষ্টি)

মীর–বেগম : করিমের মা! আমি যাব। ধর আমাকে।

(করিমের মা এসে ধরে তোলে মীর–বেগমকে)

(দিন। সাজ্জাদের ড্রইংরুমে কথা বলছে সাজ্জাদ, সুরাইয়া ও হেলু ডাক্তার)

সাজ্জাদ : ইনট্রোডিউস করে দিলাম, এবার তোমরা কথা বল।

সুরাইয়া : বিয়ের সময় যে দেখা হয়েছিল তা ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল গাড়ীতে বসে সব আবার জেনে নিয়েছি। আপনি এসেছেন, আমরা খুবই আনন্দিত।

হেলু ডাক্তার : আমার কাছে আপনার পরিচয় আজও অম্লান। তবুও বলব– সাজ্জাদ মীর এই কয় বছরে আপনাদের নিয়ে বহুবার আমাদের দেখে আসতে পারতেন।

সুরাইয়া : আপনাদের এই মীর সাহেব তো সময়ই পান না।

হেলু ডাক্তার : যথাযথ হুকুম পেলে মীর সাহেব যে সময় করে তা পালন করতে বাধ্য হতেন না, তা–ই বা কি করে স্বীকার করে নেই?

সুরাইয়া : হুকুম করার সৌভাগ্য সবারই কি হয়?

হেলু ডাক্তার : আমাদের মীর যেদিন বিয়ের পাগড়ী শিরোধার্য করেছেন, সেদিন থেকেই তো এ সৌভাগ্য আপনার ললাটে শোভা পাচ্ছে!

www.pathagar.com

সাজ্জাদ ঃ তোমার মন্তব্যে রমণীকূলকে খুব উঁচুতে ঠাঁই দিলে কি না জানি না। তবে তোমার হাসির গায়ে যেন অনুশোচনার মেঘ লেগে রয়েছে ডাক্তার! নিজের অভিজ্ঞতার জন্যই কি?

হেলু ডাক্তার ঃ হয় তো তা-ই। অবিশ্যি তোমাদের দেখে বলতেই তো ইচ্ছে করে- স্ত্রী হচ্ছেন সেই ধন যার অভাবে সংসার হয় অচল।

সুরাইয়া ঃ আর নিজেদের বেলায়?

হেলু ডাক্তার ঃ যার উপস্থিতির ফলে সংসার হয় অভাবে অচল।

(হেসে ওঠে সাজ্জাদ ও সুরাইয়া)

সুরাইয়া ঃ এত সুন্দর কথা বলতে পারেন, আপনি নিশ্চয়ই কথাশিল্পী হতে পারতেন।

হেলু ডাক্তার ঃ কিন্তু স্থিরই করতে পারলাম না যে কথাশিল্পী হতে হলে শিল্পের গায়ে কথা লাগাতে হয়, না কথার গায়ে শিল্প লাগাতে হয়!

সাজ্জাদ ঃ (হাসতে হাসতে) ব্র্যাভো ডাক্তার, চমৎকার বলেছ। কথায় তুমিই জয়ী।

সুরাইয়া ঃ সুতরাং খুকুমণির কাছে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। আবার দেখা হবে।

(নীরবে হাত তুলে সালাম জানিয়ে চলে যায়)

সাজ্জাদ ঃ (গম্ভীরভাবে) ডাক্তার, তোমার চিঠিপত্রের উত্তর আমি দেই নি। কারণ, দেবার মত উত্তর আমার ছিল না।

হেলু ডাক্তার ঃ এর পেছনে মীরচাচার উইলের ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়াই তোমার ছিল না?

সাজ্জাদ ঃ অপ্রিয় প্রসঙ্গে আমি যেতে চাই না ডাক্তার।

হেলু ডাক্তার ঃ (কথাটা হজম করে নিয়ে) আমজাদের ব্যাপারেও কি ...

সাজ্জাদ ঃ ডাক্তার, এসব প্রশ্নের উত্তর জানতেই কি তোমার ঢাকায় আসা?

হেলু ডাক্তার ঃ ঠিক তা নয়। ফসল তোলার সময় হয়েছে। মীরচাচী যাতে বাড়ীতে গিয়ে মীরবাড়ীর অঙ্গনে নিজের চোখে ফসল তোলা দেখেন, গাঁয়ের সকলের হয়ে সে-অনুরোধটা জানাতেই আমার এখানে আসা। এটা সবারই একান্ত দাবী সাজ্জাদ!

www.pathagar.com

সাজ্জাদ ঃ অসুস্থ শরীরে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া এখন সম্ভব নয়।

হেলু ডাক্তার ঃ (চেষ্টা করে হেসে) এবার তাহলে উঠি হে সাজ্জাদ মীর! ট্রেন কিংবা বাস ধরতে হবে।

সাজ্জাদ ঃ আমার কথাগুলো তোমার ভাল লাগে নি জানি। কিন্তু আমার দিক থেকে এই-ই হল সত্যের নির্মম প্রকাশ।

(তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় হেলু ডাক্তার। তার চোখে ভেসে ওঠে কয়েক বছর আগেকার দৃশ্য-)

(পথ। দিনের বেলা। সাইকেলারোহী হেলু ডাক্তারকে থামায় আমজাদ)

আমজাদ ঃ আরে ডাক্তার ভাই, একটা সুখবর শুনে রুগী দেখতে যান।

হেলু ডাক্তার ঃ সুখবরটা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও। আমার সত্যিই তাড়া আছে।

আমজাদ ঃ (উত্তেজিত কণ্ঠে) ভাইয়ার বিয়েতে আব্বা-আম্মা রাজী!

হেলু ডাক্তার ঃ ভেরি গুড্! তারপর?

আমজাদ ঃ তারপর আপনিই বলুন- কেমন হল ব্যাপারটা? সংগ্রামী এক তরুণের বিয়ে। আর সে বিয়েও কার সঙ্গে? বলুন, বেশ কাব্য করে বলুন।

হেলু ডাক্তার ঃ ও, নিজেরই মনের প্রতিধ্বনি শুনতে চাইছ?

আমজাদ ঃ চাইছি, শুনতে চাইছি উত্তাল সেই দিনগুলোর কথা যখন আমার ভাইয়া ভার্সিটির ছাত্র, যখন আন্দোলনমুখর ঢাকার রাজপথ, যখন ঢাকার খবর শুনতে গ্রামের স্কুলে আমরা অধীর আগ্রহী!

হেলু ডাক্তার ঃ (অভিনয়ধর্মী উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) হ্যাঁ,তখন- তখন হঠাৎই আবার নিঃশঙ্ক উচ্চারণে মুখর হল দিন বদলের দিন। পথে পথে স্লোগান। দৃপ্ত মিছিলের পুরোভাগে আমাদের সাজ্জাদ মীর। আগুন ঝরা সেই দিনগুলোর একটি দিন। সাজ্জাদ মীরের অবাক দৃষ্টিতে মিছিলে-সামিল এক তরুণী- অগ্নিসম্ভবা, অপরূপা!

www.pathagar.com

(মিছিলের এক প্রান্তে ইন্টার–কাটে সাজ্জাদ মীর ও সুরাইয়ার দৃষ্টি বিনিময়। মিছিল চলছে। প্রায়–শব্দহীন মিছিলের ব্যাক গ্রাউন্ডে শোনা যাচ্ছে হেলু ডাক্তারের কণ্ঠ)

উচ্চপদাসীন সরকারী কর্মকর্তার স্নেহের দুলালী সুরাইয়া খান! দেখা হল, হল পরিচয়। তারপর গড়িয়ে চলে দিনের পর দিন। সেসব দিনে একান্তে কত কথা, কত কথার ফুলঝুরি! এবং সেই মধুর ঘনিষ্ঠতার সমাপ্তিতে এখন–

আমজাদ : আমার ভাবী হয়ে আসছেন নগরবাসিনী সেই অগ্নিসম্ভবা অপরূপা সুরাইয়া খান!

হেলু ডাক্তার : তবে সেই অপরূপা থাকবেন কিন্তু ওই রাজধানীতেই! শুনেছি– সেখানকার স্বপ্নচারীরা রঙিন ফানুস হয়েই উড়তে চান! উড়তে উড়তে নীচের দিকে তাকান যখন– দেশটা তখন এক সবুজ গালিচা! স্বপ্ন জন্ম দেয় আরও স্বপ্ন, আকাশের মিটিমিটি তারাগুলো নাকি আরও উপরে উড়ে যেতে হাতছানি দেয়, ডাকে!

(দু'জনই হাসতে থাকে .... সে–দৃশ্য মিলিয়ে যায়)

সাজ্জাদ : অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার অতি–পরিচিত সেদিনের সাজ্জাদ মীর তোমাকে হয়তো আহতই করলাম ডাক্তার ....

হেলু ডাক্তার : না, সত্য অনেক সময় নির্মমই হয় জানি। যেমন ভাষণে, তেমনি ভূষণে। তবে সত্য আর ভ্রান্তির সীমারেখাটা এতই সূক্ষ্ম যে তা নির্ধারণ করতে মানুষ অনেক সময় ভুলও করে। যাক, একটা অনুরোধ–

(ব্যাগ থেকে উইলের নকলটা বের করে)

এটা সেই উইলের নকল। সময় করে তোমরা উইলটা একবার পড়ে দেখো। অন্তত মীরচাচার কথা স্মরণ করে আমার এ অনুরোধটা রেখো।

(নকলটা সাজ্জাদের হাতে দিয়ে চলে যায় হেলু ডাক্তার। সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক)

(প্রায়ান্ধকার একটা সাধারণ কোঠায় কথা বলছে আমজাদ ও আসাদ। কোঠায় জ্বলছে একটা হ্যারিকেন। আসাদের হাত

www.pathagar.com

থেকে সোমার দেওয়া চিঠিটা খুলে ধরে আমজাদ। চিঠিতে ভেসে ওঠে সোমার মুখ)

সোমা : আমজাদ! আমার ব্যবসায়ী বাবাকে চিনতে তোমরা এতদিন ভুল করে এসেছ। দেশের সেবার কাজই বল, আর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই বল– তাঁদের ব্যবসায়ী স্বভাবটা খুবই জাগ্রত থাকে। বাবাকে আমি সৎমায়ের সঙ্গে আলাপ করতে শুনেছি। তাঁদের মতে– আমাদের বিয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু আমার উপর ভরসা করতে না পেরে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তোমাকে ডাকাতি কেসে আসামী করতে বেপারী সাহেবকে বাধ্য করেছেন। তোমাকে করেছেন ঘরছাড়া। তোমাদের কাছে হেলুভাইকে শত্রু হিসাবে তুলে ধরেছেন। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি মিথ্যার এ জাল ছিন্ন করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস– শিগগীরই মুক্ত জীবনে ফিরে আসবে তুমি।

(চিঠি পড়ে আমজাদ বিস্মিত; আনমনা হয়ে যায় সে। মুখে শুধু কোন রকমে উচ্চারণ করে–)

আমজাদ : ইতি।–সোমা।

আসাদ : কি হল হে মীর সাহেব?

আমজাদ : ভাবছি সোমা আর তার বাবার কথা!

আসাদ : ভিন্নমুখী দু'টি চরিত্রই অবাক করে দেওয়ার মত– তাই না? কিন্তু আজকের এই–

(নিজের কোঠায় মীর–বেগম বিছানা থেকে উঠে বসেন। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। করিমের মা শুয়ে ছিল মেঝেতে। সেও উঠে বসে)

মীর–বেগম : করিমের মা!

করিমের মা : ঘুম ভাইঙ্গা গেল আম্মা?

মীর–বেগম : হ্যাঁ, পাতলা ঘুম– গাঁয়ের খালি বাড়ীটা চোখে ভাসছিল! সারাটা বাড়ী, পুকুর, মসজিদ .... সব কিছু!

করিমের মা : আমিও ঘন ঘন স্বপ্ন দেখি আম্মা। স্বপ্নে দেখি– আমাগো ভাঙ্গা ঘরের চালে লাউয়ের ডগা বাইয়া বাইয়া উঠতাছে! ডগাগুলো যে কি রকম ফন্‌ফনা, বাতাসে দোলে!

www.pathagar.com

মীর-বেগম : (উৎকর্ণ ব্যগ্র কণ্ঠে) করিমের মা! বউমার কোঠায় খুকুমণি দাদী বলে কেঁদে উঠল না?

করিমের মা : কই, কেউ কান্দে নাই তো! আপনের যে কি অইছে আম্মা, মনের চিন্তা শব্দ কইরা কানে ভাইসা আসে। খুকুমণি তো তার মায়ের কাছে ঘুমাইয়া রইছে! মা-সন্তানের সম্পর্ক- থাকব না ক্যান্? আর ওইখানে হয়তো আপনের খালি বাড়ীতে আইসা আমজাদ ভাই-

মীর-বেগম : (আবেগময় উচ্চ কণ্ঠে) আহ্ করিমের মা! আমজাদের কথা-

(দূর থেকে যেন ভেসে আসে আমজাদের আর্তকণ্ঠ- "আম্মা!" আমজাদের এই ডাক যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বুকফাটা আর্তনাদ করে ওঠেন মীর-বেগম)

আমজাদ!!

(সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মীর-বেগম। সেই কান্নার শেষদিকে যেন প্রতিধ্বনিত হয় মীর সাহেবের কম্পিত কণ্ঠ—)

নেপথ্য কণ্ঠে

মীর সাহেব : মীরবউ!! মীরবউ! শান্ত হও, শান্ত হও, শান্ত ....

(সেই প্রতিধ্বনি ক্রমে মিলিয়ে গিয়ে সব কিছু নীরব হয়ে যায়। ব্যগ্রভাবে ঘুম-ভাঙ্গা সাজ্জাদ ও সুরাইয়া আসে)

সাজ্জাদ : কি হয়েছে আম্মা?

সুরাইয়া : আপনি কেঁদে উঠলেন কেন?

মীর-বেগম : ভুল, সব কিছু ভুল! তোরা ভুল করে সর্বনাশ ডেকে আনছিস! আমি বাড়ীতে যাব সাজ্জাদ! বউমা, আমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও! মীর সাহেব আমাকে ....

(কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে)

সাজ্জাদ : সেই ব্যবস্থা করেছি। তার আগে কিছু খবর আছে।

সুরাইয়া : সোমা বলে যে মেয়েটি আমার কাছে মাঝে-মধ্যে আসত, তাকে আপনি দেখেছেন। তার সঙ্গে আমজাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই সোমার বাবা মুখলেস সাহেব চক্রান্ত করে আমজাদকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছিল। সে আমার কাছে আসত আমজাদকে মুক্ত করার সাহায্য চাইতে।

www.pathagar.com

সাজ্জাদ ঃ কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে এসব কাজে বাধা আসে।

সুরাইয়া ঃ তাই অনেক দিন থেকে গোপনে আমার আব্বাকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বন্দোবস্ত করতে পেরেছি।

সাজ্জাদ ঃ সেই মুখলেস সাহেবের মেয়ে সোমা খবর পাঠিয়েছে। কোর্টে বেপারী সাহেব নতুন করে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। তার এই স্টেটমেন্টের পর আমজাদ এখন নির্দোষ। মুক্ত।

(মীর বাড়ীর আঙিনায় লোকজনের কোলাহল। সবাই আমজাদের মুক্তির খবরে খুশী এবং তা নিয়ে কথাবার্তাও বলছে। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে)

(মীরবাড়ীর উঠানে, ঘরের বারান্দায় দিনের আলো। ঘরের বারান্দায় স্যুটকেস বিছানাপত্র ইত্যাদি। আনুর বাপ সেগুলো ঘরের ভেতর নিয়ে রাখছে। একাজে তাকে সাহায্য করছে মাজেদা–ফাতেমা। বারান্দায় বাইরে দাঁড়িয়ে তা–ই দেখছে আমজাদ ও আসাদ)

আমজাদ ঃ বুবুরা আবার এসব টানাটানিতে লাগলে কেন?

ফাতেমা ঃ টানাটানি করব না? এতদিনের খালি বাড়ী আজ খুশীর রোদে ঝলমল করছে! তুই, আমাদের আমজাদ, আজ মাথা উঁচু করে নিজের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে!

মাজেদা ঃ আজ সবাই জানে– মীর সায়বের ছেলে আর যা–ই হোক, খুনী–ডাকাত নয়!

ফাতেমা ঃ নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন হেলু ভাই। সেজন্যই তিনি আম্মাকে আনতে গেছেন। আজকের মধ্যে নিশ্চয়ই আম্মা এসে পা' রাখবেন এই মীরবাড়ীতে। আজকের মধ্যেই দেখিস আমজাদ– আমাদের সবাইকে নিয়ে মীরবাড়ী আবার জমজমাট।

আমজাদ ঃ (আত্মগত কণ্ঠে) শুধু মীরবাড়ীর মীরসাহেব ছাড়া!

(মুহূর্তে সবারই মুখে আঁধারের ছোঁয়া লাগে)

আসাদ ঃ যিনি বেঁচে থাকলে এই সম্ভাব্য পুনর্মিলনী হত মধুর, তাঁর সশ্রদ্ধ স্মৃতিতেও সে–মাধুর্য কেন বজায় থাকবে না আমজাদ? .... যাক, বাড়ীঘর সব পরিষ্কার .....

www.pathagar.com

নেপথ্যে

কোলাহল : ডাক্তার সায়েবও আইসা গেছেন, আমাগো ডাক্তার সায়েব!

(আমজাদসহ সবার মুখেই খুশীর ঝিলিক। হেলু ডাক্তার ধীরপায় এগিয়ে আসে)

ফাতেমা : (কাছে গিয়ে) ডাক্তার ভাই! আপনি একা?

হেলু ডাক্তার : হ্যাঁ, একাই ফিরতে হল রে বোন!

মাজেদা : আম্মাকে আনতে পারলেন না?

ফাতেমা : তাঁকে আসতে দিলেন না ভাইয়া-ভাবী?

হেলু ডাক্তার : অসুস্থ শরীরে -- যাক, আমজাদ! আমি জানতাম- কি হতে যাচ্ছে। মুখলেস সাহেবের বদৌলতে আমার ওপর তোমাদের অবিশ্বাসের আবরণকে বেহায়ার মত গায়ে জড়িয়ে আমাকে চলতে হয়েছে শুধুমাত্র মীরচাচার সেই নির্বাক অসহায় দৃষ্টির মর্যাদা রাখতে গিয়ে। আজ তুমি ফিরে এসেছ, আমি খুশী। এবার দু' একটা কথা বলব। আমজাদ, মীর চাচার শেষ ইচ্ছায় যে উইল আমি আগলে রেখেছিলাম, আজ সবার সামনে সেটা তোমার হাতে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাই। (উইলটা বাড়িয়ে দেয়) নাও আমজাদ, উইলটা নাও। পড়ে দেখ, এতে আমার স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই!

(সাজ্জাদের বাসায় মীর-বেগম, সাজ্জাদ ও সুরাইয়া)

সাজ্জাদ : তাছাড়া হেলুভাইর দিয়ে যাওয়া আব্বার উইলটাও পড়ে দেখলাম। আব্বা সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমরা কতটুকুই বা করতে পারতাম! এখন উইল অনুযায়ী গাঁয়ের গরীবেরা চাষ করে যে ফসল ফলাবে, তার এক-তৃতীয়াংশ পাব আমরা, তার থেকে মেটানো হবে মসজিদের ব্যয়-ভার। এক-তৃতীয়াংশ পাবে চাষীরা। বাকীটা দিয়ে করা হবে সার-সেচ প্রভৃতি ব্যবহারের কাজ।

মীর-বেগম : অথচ তোরা সবাই ভুল বুঝলে তোদের আব্বাকে, ভুল বুঝলে ওই হেলু মিয়াকে!

(এখানে মীর সাহেবের দাঁড়িয়ে থাকার ইনসার্ট দেখা যাবে। তাঁর কাছে এগিয়ে আসে হেলু ডাক্তার)

www.pathagar.com

(আমজাদ নতমুখ। আসাদ কাছে গিয়ে ডাক্তারের হাত ধরে। আমজাদও ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তারের হাত ধরে দৃঢ় কণ্ঠে বলে–)

আমজাদ : এখ্‌খুনি আমি ঢাকায় রওনা দিচ্ছি ডাক্তার ভাই। দেখি– আজকের দিনে আমার মা–কে সেখানে কে আটকে রাখে?

নেপথ্যে

লোকজন : আরে, মোটর গাড়ী কইরা আইসা গেছে করিমের মা! কি ব্যাপার?

(সবাই তাকিয়ে দেখে– হাসিমুখে করিমের মা এগিয়ে আসছে)

ফাতেমা : কি খবর করিমের মা?

করিমের মা : খবর নিয়াই তো আইলাম!

আমজাদ : খবরটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

করিমের মা : কই, কই। ডাক্তার সায়েব, ওই শেষ রাতের ডাকগাড়ীতেই আইতাছেন আম্মা– সকলরে লগে নিয়া। খবরডা জানাইতে আমারে বড়মিয়ার গাড়ীতে কইরা আগেই পাঠাইয়া দিছে!

(সকলেই আনন্দ–কোলাহল করে ওঠে)

ফাতেমা : আমরাও সকলে স্টেশনে যাব ডাক্তার ভাই!

হেলু ডাক্তার : বেশ তো, সবাই যেয়ো।

আমজাদ : সবাই যেয়ো মানে? আপনি যাবেন না সবাইকে নিয়ে?

ফাতেমা : সেই শেষ রাতের ডাকগাড়ীতে করে মীরবাড়ীতে ফিরে আসছেন মীরবাড়ীর প্রাণ, আপনার মীর–চাচার প্রতিনিধি মীর–আম্মা! সবাইকে নিয়ে আপনি তাঁকে স্বাগত জানাতে যাবেন না?

আমজাদ : ডাক্তার ভাই, আপনি কিন্তু আমাদের সকলের বড়, আমাদের বড়ভাই!

হেলু ডাক্তার : (ক্ষণকাল নীরব থেকে হাসিমুখে) যাব।

(সবাই আবার আনন্দ–কোহাহল করে ওঠে। ভোর–রাতের গাড়ীর শব্দ যেন ভেসে আসছে। অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে যেন ইঞ্জিনের আলো। সেই আলো এসে পড়েছে অপেক্ষমান সকলেরই আনন্দোদ্ভাসিত চোখেমুখে)

www.pathagar.com

লীলা-কঙ্ক

চরিত্র-লিপি

গায়েন

ও

দোহারকিরা

সহ-গায়েন

পন্ডিত গর্গ

কিশোর কঙ্ক

কিশোরী লীলা

তরুণ কঙ্ক

তরুণী লীলা

নন্দু

গেন্দু

বিচিত্র

মাধব

ও

পীর

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় 'কঙ্ক ও লীলা' নামক পালায় যে ভাষা (বানানসহ) ব্যবহৃত হয়েছে, আমরাও 'লীলা-কঙ্ক' পালায় তা-ই সেভাবে ব্যবহার করেছি।

www.pathagar.com

।। গৃহাঙ্গন।।

(গানের আসরে গান গাইছে গায়েন, সহযোগিতা করছে দোহারকিরা)

গায়েন ঃ প্রেম হইতে ত্রিভুবন যাঁহার সৃজনা।
তাঁহারে স্মরিয়া গাই আমার বন্দনা।।
চাইর কোণা পৃথিবী বন্দুম বন্দুম তরুলতা।
উপরে আকাশ বন্দুম নীচে বসুমাতা।।
চন্দ্রসূর্য বন্দি গাই জগতের আঁখি।
যাহার প্রসাদে আমি রাত্রদিবা দেখি।।

দিশা ঃ আইলরে জোয়ারের পানি নাও ভাসাইয়া দাও
মাঝি নাও ভাসাইয়া দাও।
লীলা–কঙ্কের আঙিনার জলে নায়ের পাল উড়াও।।

গায়েন ঃ বিপ্রপুরে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি করে জীবন পালন।।

দোহারকিরা ঃ মাঝি নাও ভাসাইয়া দাও।

গায়েন ঃ গুণরাজ নাম তার ভার্যা বসুমতী।
পতিব্রতা সেই নারী অতি ভক্তিমতী।।

দোহারকিরা ঃ মাঝি নাও ভাসাইয়া দাও।

গায়েন ঃ সংসারেতে ভার্যা ভিন্ন কেহ নাহি ছিল।
কিছুদিন পরে এক পুত্র জনমিল।।

দোহারকিরা ঃ মাঝি নাও ভাসাইয়া দাও।

গায়েন ঃ সাটিয়ারা দিনে তাল পাতায় লিখিয়া।
কঙ্ক নাম রাখে মাতা আদর করিয়া।

দোহারকিরা ঃ মাঝি নাও ভাসাইয়া দাও।

গায়েন ঃ ছয় না মাসের শিশু হইল যখন।
দারুন রোগেতে হইল মাতার মরণ।।

দোহারকিরা ঃ আইলরে জোয়ারের ....
.... নায়ের পাল উড়াও।।

গায়েন ঃ ভার্যার লাগিয়া বিপ্র পাগল হইয়া ফিরে।
কেবা রাখে শিশুপুত্রে কেবা ভিক্ষা করে।।

(ইনসার্টঃ উন্মাদপ্রায় গুণরাজ পথে পথে ফিরছে)

www.pathagar.com

চিন্তারোগে গুণরাজ মৈল অবশেষে।
মাতাপিতা রইলনা কেউ শিশু কঙ্কের পাশে।।

দিশা : কূল নাই অকূল গাঙে ভাসে কঙ্কের নাও—
হায়রে অভাগ্যা কঙ্করে।।

গায়েন : খাকুরা বলিয়া কেউ নাহি লয় কোলে।
সংসারেতে নাহি কেউ শিশুরে যে পালে।।

(ইনসার্টঃ সাধারণ বিছানায় একা শিশু পুত্র। ......
অবশেষে মুরারি এসে শিশুকে কোলে নেয়)

দোহারকিরা : হায়রে অভাগ্যা কঙ্করে।।

গায়েন : মুরারি নামেতে এক চন্ডাল সুজন।
শিশুরে দেখিয়া তার দুঃখী হইল মন।।

দোহারকিরা : হায়রে অভাগ্যা কঙ্করে।।

গায়েন : কোলেতে লইয়া শিশু নিজ ঘরে আনে।
চন্ডালিনী পালে তারে পরম যতনে।।

দোহারকিরা : হায়রে অভাগ্যা কঙ্করে।।

গায়েন : নিজ পুত্ররূপে স্নেহ করে দুইজনে।
মুরারিরে বাপ বলি শিশু মনে জানে।।

দোহারকিরা : হায়রে অভাগ্যা কঙ্করে।।

গায়েন : কৌশল্যারে ডাকে কঙ্ক জননী বলিয়া।
জনক-জননী পুনঃ পাইল ফিরিয়া।।

(ইনসার্ট : কৌশল্যার কাছে শিশু কঙ্ক খেলা করে)

দোহারকিরা : কূল নাই অকূল গাঙে ভাসে কঙ্কের নাও—
হায়রে অভাগ্যা কঙ্করে।।

গায়েন : পঞ্চ না বছরের শিশু হইল যখন।
দারুণ জ্বরেতে মৈল চন্ডাল সুজন।।
পতির লাগিয়া কান্দি দিবস-রজনী।
অনাহারে অনিদ্রায় মরে চন্ডালিনী।।
যেই ডালে করে ভর সে-ডাল ভাইঙ্গা যায়।
কেমনে বাঁচিবে কঙ্ক কি হইবে উপায়।।
দিবানিশি চন্ডালের শ্মশানে পড়িয়া।
দুইদিন গেল কঙ্কের কান্দিয়া কান্দিয়া।।

www.pathagar.com

দিশা ঃ আমার না হইল মরণ।
কান্দিতে কান্দিতে আমার যায় গো জীবন।।

গায়েন ঃ গর্গ নামে ছিল এক পন্ডিত ব্রাহ্মণ।
শিষ্যালয় হইতে বাড়ী করেন গমন।।
পরম পন্ডিত তিনি ধর্মে বড় জ্ঞানী।
সর্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত লোকে কয় শুনি।।
দেখিয়া শ্মশানে শিশু যায় গড়াগড়ি।
হাত ধরি উঠাইলা গিয়া তাড়াতাড়ি।।

(ইনসার্ট ঃ গর্গ পন্ডিত শ্মশান থেকে কঙ্ককে স্নেহভরে নিয়ে আসে নিজের কুটিরে। গায়েনের বর্ণনা অনুয়ায়ী যথাসম্ভব দৃশ্যে তা দেখানো হবে)

নামাবলী দিয়া শিশুর বয়ান মুছায়।
সঙ্গেতে লইয়া কঙ্কে নিজ ঘরে যায়।।
দেখিয়া গায়ত্রী দেবী সুখী হৈলা মনে।
পুত্রহীনা পুত্র পাইল মাতা মাতৃহীনে।।
দিনে দিনে যায় দিন বাড়ে কঙ্কধর।
নরম স্বভাব তার দেখিতে সুন্দর।।

দোহারকিরা ঃ আমার না হইল মরণ।
কান্দিতে কান্দিতে আমার যায় গো জীবন।।

সহ-গায়েন ঃ দেখিয়া গর্গের মনে ইচ্ছা হইল ভারি।
দশ না বছরের কালে হাতে দিলা খরি।।
আদরে যতনে কঙ্কের সুখে দিন যায়।
লেখাপড়া করে আর ধেনু যে চরায়।।

(ইনসার্ট ঃ কিশোর কঙ্ক মাঠে ধেনু চরায়)

দুঃখিতের দুঃখ না যায় বিধি হৈল বাম।
বরাতের ফেরে হায়রে হৈল কোন কাম।।
গায়ত্রী জননী মৈল শীতলা রোগেতে।
কঙ্কের কপাল মন্দ এই দুনিয়াতে।।
লীলা নামে ছিল গর্গের একটি দুহিতা।
ভূঁয়েতে লুটিয়া কান্দে হারাইয়া মাতা।।

www.pathagar.com

(ইনসার্ট ঃ কিশোরী লীলা কঙ্কর পাশে পাশে
থেকে কঙ্ককে সাহায্য করে)

আষ্ট না বছরের লীলা মায়ে হারাইয়া।
বুঝিল কঙ্কের দুঃখ নিজ দুঃখ দিয়া।।
কঙ্কেরে না দিয়া ভাত লীলা নাইসে খায়।
দুইজনে গলাগলি ঘুরিয়া বেড়ায়।।
বাথান হইতে কঙ্ক ধেনু লয়ে আসে।
আবের পাঙখা লইয়া লীলা বৈসে তার পাশে।।

(ইনসার্ট ঃ ছোট লীলা কিশোর কঙ্ককে পাখার বাতাস করছে। পাখার মাধ্যমে দেখানো হবে তরুণী লীলা বাতাস করছে তরুণ কঙ্ককে। নেপথ্যে গান; দৃশ্যে লীলার বিভিন্ন বর্ণনার প্রকাশ)

দিশা ঃ বনে বনে ও কোকিলা আর ডাইকো না।
ওই ডাকে জ্বলে যে আগুন
জলে নিভে না।।
লাগে রঙের ঝিলিক।

গায়েন ঃ হাসিয়া খেলিয়া লীলার বাল্যকাল গেল।
সোনার যৈবন আসি অঙ্গে দেখা দিল।।

দোহারকিরা ঃ লাগে রঙের ঝিলিক।

(ইনসার্টঃ তরুণ কঙ্ক ও তরুণী লীলা গায়েনের
বর্ণনা অনুযায়ী কাজ করে যায়)

সহ-গায়েন ঃ শাওনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপ চম্পক বরণী।।

দোহারকিরা ঃ লাগে রঙের ঝিলিক।

গায়েন ঃ নদীর ঘাটে গেলে কন্যা জ্বলে নদীর পানি।
লীলারে দেখিয়া বান্ধে সাউদের তরণী।।

দোহারাকিরা ঃ লাগে রঙের ঝিলিক।

সহ-গায়েন ঃ পুষ্প না বাগানে লীলা পুষ্প তুলতে যায়।
মৈলান হইয়া পুষ্প পাতাতে লুকায়।।

দোহারকিরা ঃ লাগে রঙের ঝিলিক।

গায়েন ঃ চান্দমুখ দেখিয়া চান আন্ধাইরেতে লুকে।
পন্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে।।

দোহারকিরা ঃ লাগে রঙের ঝিলিক।

www.pathagar.com

সহ-গায়েন ঃ চাচর চিকণ কেশ লীলার বাতাসেতে উড়ে।
বর্ষাতিয়া চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে।।

দোহারকিরা ঃ লাগে রঙের ঝিলিক।

গায়েন ঃ মুষ্টিতে আটয়ে লীলার চিকণ কাকলী।
হাটিয়া যাইতে কন্যার যৈবন পড়ে ঢলি।।

দোহারকিরা ঃ বনে বনে ও কোকিলা আর ডাইকো না।
ওই ডাকে জ্বলে যে আগুন জলে নিভে না।।
লাগে রঙের ঝিলিক।

সহ-গায়েন ঃ মনের সুখেতে কঙ্ক আছে গর্গপুরে।
গুরুর নিকটে থাকি নানা শাস্ত্র পড়ে।।
পুরাণ সংহিতা আদি হরেক প্রকার।
শিখিয়াছে যথাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার।।
(ইনসার্ট ঃ কঙ্ক গাছের নীচে বসে বাঁশী বাজায়, পাশে এসে দাঁড়ায় লীলা)
কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে।
সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে।।

।।গৃহাঙ্গন।।

লীলা (গান) ঃ আইস আইস প্রাণের বন্ধু রে
বইস আমার কাছে।
দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে।।
নয়নের কাজল রে বন্ধু তুমি গলার মালা।
একাকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীলা।
ভয়ে কাঁপে মন যে আমার
হারাই তোমায় পাছে।।
(ইনসার্ট ঃ প্রয়োজন মত লীলা ও কঙ্কের অভিব্যক্তিময় দৃশ্য দেখানো হবে)
না যাইও না যাইও বন্ধু চরাইতে ধেনু।
আতপে শুকাইয়া গেছে তোমার সোনার তনু।
তোমার মাথার কেশ রে বন্ধু
ঘামে ভিজিয়াছে।।

গায়েন ঃ এমন সময় কিবা হইল বিবরণ।
(সুরেলা কথায়) কহিব সকল সবে শুন দিয়া মন।।

www.pathagar.com

কোথা হইতে এক পীর আসিল সেখানে।
দরগা স্থাপনা করি বসে আনমনে।।
অন্তরের কথা নাহি দেয় বলিবারে।
আপুনি কহিয়া যায় অতি সুবিস্তারে।।
অবাক হইল সবে দেখি কেরামত।
দর্শন-মানসে লোক আইসে শত শত।।

সহ-গায়েন ঃ যে যাহা মানত করে সিদ্ধি হয় তার।
হেকমত জাহির হয় দেশের মাঝার।।
সিন্নির কণিকা মাত্র পীর নাহি খায়।
গরীব দুঃখীরে সব ডাকিয়া বিলায়।।

(সুরেলা কথায়)

বাথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন বেণু।
উচ্চ পুচ্ছে ছুটে আসে গোষ্ঠের যত ধেনু।।
আহারে কঙ্কের বাঁশী ধরে কত মধু।
কাঙ্খের কলসী থইয়া শুনে কুলবধূ।।
এমন মধুর গীত, কেবা করে আচম্বিত,
শুনি পীর ভাবে মনে মনে।
এ নহে সামান্য জন, পীরের হৈল মন,
ডাকাইয়া আনে নিজ স্থানে।।

(ইনসার্ট ঃ পীরের আস্তানায় কঙ্ক)

জহুরী জহর চিনে বেনে চিনে সোনা।
পীর প্যাগাম্বর চিনে সাধু কোন জনা।
পীরের অদ্ভুত কান্ড সকলি দেখিয়া।
কঙ্কের পরাণ গেল মোহিত হইয়া।।
সর্বদা নিকটে কঙ্ক ভক্তিপূর্ণ মনে।
চরণে লুটায় তার দেবতার জ্ঞানে।।
দীক্ষিত হইলা কঙ্ক সেই পীরের থানে।
এই কথা গর্গ পন্ডিত কিছুই না জানে।।
ভক্তি-মুক্তি-তন্ত্র-মন্ত্র-দেহ-প্রাণ-মন।
অচিরে গুরুর পদে কৈল সমর্পণ।।

(গায়েনদের এইসব কথা ও গানের প্রেক্ষাপটে দৃশ্যে তদনুযায়ী বর্ণনা দেখানো হবে)

www.pathagar.com

গায়েন ঃ দেখিয়া শুনিয়া পীর, কঙ্করে করিলা স্থির,
উপযুক্ত ভক্ত এহি জন।
সত্যপীরের পাঁচালী, কঙ্কেরে লিখিতে বলি,
একদিন হইল অদর্শন।।

।।গৃহাঙ্গন।।

(কঙ্ক পাঁচালী লিখছে। পাশে বসে লীলা সেসব রচনা
গুছিয়ে রাখছে। নেপথ্যে গায়েনের সুরেলা কথা)

সহ-গায়েন ঃ গুরুর আদেশ মানি, লিখিয়া পাঁচালী খানি,
পাঠাইলা দেশে আর বিদেশে।
কঙ্কের লিখন কথা, ব্যক্ত হইল যথাতথা,
দেশ পূর্ণ হৈল তার যশে।।

(ইনসার্ট ঃ হিন্দু মুসলমান পাঁচালী পড়ে খুশী।
গৃহাঙ্গনে গর্গের মুখে হাসি)

গায়েন ঃ কঙ্ক আর রাখাল নহে, কবিকঙ্ক লোকে কহে,
শুনি গর্গ ভাবে চমৎকার।
হিন্দু আর মুসলমানে, সত্য পীরে উভে মানে,
পাঁচালীর হৈল সমাদর।।

(আনন্দিত হিন্দু–মুসলমান জনতা।
দৃশ্যে গর্গের প্রতিক্রিয়া)

নহে কঙ্ক সামান্য মানব।
ভক্তিমান অতি ধীর, গর্গ কৈলা মনে স্থির,
কঙ্কে ঘরে তুলিয়া লইব।।
পন্ডিত সমাজীগণে, একত্র করিয়া ভণে –

(গৃহাঙ্গনে পন্ডিত সমাবেশে গর্গপন্ডিত))

গর্গ (কথায়) ঃ এই কঙ্ক ব্রাহ্মণ তনয়।
জ্ঞানমানে নাহি রয়, চন্ডালের অন্ন খায়,
ঘরে নিতে নাহিক সংশয়।।

নেপথ্যে

গায়েন " ঃ এতেক শুনিয়া নন্দু, আর যত গোড়া হিন্দু
কয় সবে মাথা নাড়াইয়া।
নন্দু " ঃ আমরা সম্মত নহি, আরও শুন সবে কহি,
লহ কঙ্কে মোদেরে ছাড়িয়া।।
গেন্দু " ঃ জন্মিয়া চন্ডালের অন্ন খায় যেইজন
যে তারে সমাজে তুলে সে নহে ব্রাহ্মণ।।

www.pathagar.com

নন্দু (কথায়) : অনাচারে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কুল।
মাটিতে পড়িলে কেহ নাহি তুলে ফুল।।
গর্গ " : শাস্ত্র কথা যতটুকু জ্ঞানমতে জানি।
এ বিধান সত্য বলি কি করিয়া মানি।।

(কেউ কেউ দুই পক্ষেই মাথা নাড়ে)

নিষ্পাপ অনাথ শিশু সে তো নারায়ণ।
জাতিভেদ নাহি তার শাস্ত্রের বচন।।
নন্দু " : আমরা তো এই শাস্ত্র কভু শুনি নাই।
গেন্দু " : কালক্ষয় অকারণ ঘরে চল যাই।।
গর্গ " : শাস্ত্রমতে আমি তারে ঘরে তুলি লব।
নন্দু "
ও
গেদু : : সেই ঘরে একঘরে সকলে করিব।।

(নন্দু, গেন্দু ও অন্যান্যারা চলে যায়। গর্গ একা দাঁড়িয়ে)

নেপথ্যে
সহ-গায়েন : চারিদিকে দাউ দাউ অনল জ্বলিল।
জ্বলিলেন গর্গ আর কঙ্ক ভস্ম হইল।।
নেপথ্যে
গায়েন : আছিল চন্ডাল কঙ্ক হইল ব্রাহ্মণ।
কঙ্কেরে নাশিতে যুক্তি করে দ্বিজগণ।।

(ইনসার্ট : পৈতাধারী কঙ্ককে নীরবে মন্ত্র দান করছে গর্গ)

।।পথ।।

(লোকজনকে বুঝাচ্ছে নন্দু-গেন্দু)

নন্দু (কথায়) : ওই কঙ্ক নহে শুধু চন্ডালের পুত।
গর্গের যতেক যুক্তি সকলি অদ্ভুত।।
গেন্দু " : তদুপরি –
খোয়াইয়া চন্ডালের যত হিন্দু-রীত।
মুসলমান পীরের কাছে হইয়াছে দীক্ষিত।।
নন্দু " : জাতিভ্রষ্ট হইয়া রচে পীরের পাঁচালী।
যতেক হিন্দুর মুখে মাখি দেয় কালি।।

www.pathagar.com

(ইনসার্ট ঃ হিন্দুগণ পাঁচালী ছিঁড়ে ফেলে,
আগুনে পোড়ায়। তারা ক্রোধান্বিত)

নেপথ্যে

গায়েন (কথায়) ঃ হিন্দু যত সবে কঙ্কে মুসলমান বলি।
কেহ ছিঁড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী।।
জাতি গেল মুসলমানের পুথি নিয়া ঘরে।
যথাবিধি সবে মিলি প্রায়শ্চিত্ত করে।।

।।পথ।।

(নেপথ্য বক্তব্যের দৃশ্যমান অভিব্যক্তি)

নন্দু (কথায়) ঃ আর এক কথা সবার কাছে না যায় কথন।
গেন্দু " ঃ কঙ্কেরে সঁপেছে লীলা জীবন-যৌবন।।
নন্দু " ঃ সন্ধ্যামন্ত্র নাহি জানে বেদাচারহীন।
দুরন্ত দুর্জন যারা সমাজেতে ঘৃণ।।
গেন্দু " ঃ মদ্য-মাংস খায় সদা পাষণ্ড-আচার।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে হয় কুলাঙ্গার।।
নন্দু " ঃ ব্রাহ্মণ-দুহিতা লীলা সকলি ভুলিয়া।
কলঙ্কিনী হইয়াছে কুল ভাঙ্গাইয়া।।
সকলে " ঃ কলঙ্কিনী, কলঙ্কিনী, লীলা কলঙ্কিনী।

।।গৃহাঙ্গন।।

(গর্গের অস্থির পদচারণ)

নেপথ্যে

গায়েন ঃ এতেক শুনিয়া গর্গ ক্রোধচিত্ত হৈলা।
(সুরেলা কথায়) কেবা শত্রু কেবা মিত্র বুঝিতে নারিলা।।
গর্গ " ঃ দুগ্ধ দিয়া কালসাপে করিনু পোষণ।
ফাঁক পাইয়া সেই মোরে করিল দংশন।।
খেদাইলে দূরে তবু মিটে নাহি আশ।
স্বহস্তে নিশ্চয় কঙ্কে করিব বিনাশ।।

(অস্থির গর্গ গৃহাঙ্গনের অন্যত্র গিয়ে দাঁড়ায়)

কি কলঙ্ক কৈল মোর কহন না যায়।
কঙ্কেরে মারিয়া পরে মারিব লীলায়।।

www.pathagar.com

তারপর প্রবেশিয়া জ্বলন্ত আগুনে।
প্রায়শ্চিত্ত করব নিজে শরীর দহনে।।

(লীলা আসে। লীলাকে কাছে দেখে গর্গ বলে —)

শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
ঝটিতি জলের ঘাটে করহ গমন।।
শীঘ্রগতি আন জল কলসী ভরিয়া।
দেবের মন্দির গেল অপবিত্র হইয়া।।
কুস্বপন দেখিয়াছি কাল নিশা ভাগে।
দেবতা চলিয়া যান তেই সে বিরাগে।।
জল লইয়া তুমি আইস তাড়াতাড়ি।
স্বহস্তে মন্দির আমি পরিষ্কার করি।।
অপবিত্র ঘরখানি পবিত্র করিব।
জনমের তরে শেষ পূজায় বসিব।।

(লীলা নতমুখে চলে যায়। গর্গ দেখে, ভাবতে থাকে)

।। গৃহাঙ্গনের পাশে।।

(লীলা জল আনতে চলেছে। দাঁড়িয়ে ভাবে)

লীলা (কথায়) ঃ এমন হইল পিতা কিসের কারণ।
কোনদিন দেখি নাই বিরস বদন।।

(আসে গর্গ)

গর্গ " ঃ শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
আমিই আনিব জল দেবের কারণ।।

(লীলা পিতার দিকে তাকায়)

কলসী রাখিয়া তুমি যাও ফিরি ঘরে।
দেবের নৈবেদ্য মোর খাইল কুকুরে।।

(লীলা কলসী মাটিতে রাখে। তা উঠিয়ে নিয়ে গর্গ চলে যায়। লীলা এগিয়ে যায় ঠাকুর ঘরের দিকে। বাইরে থেকেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নেপথ্যের গান অনুযায়ী অভিব্যক্তি প্রকাশ করে)

নেপথ্যকণ্ঠে ঃ (কথায়) কলঙ্কিনী, কলঙ্কিনী, কলঙ্কিনী লীলা।

www.pathagar.com

নেপথ্যে

নারী কণ্ঠে ঃ (গানে) ওগো আমার প্রেমের ঠাকুর
প্রেমের কানু তুমি বল,
লীলা কেন কলঙ্কিনী।

নেপথ্যে

পুরুষ কণ্ঠে ঃ (গানে) ফুলের পথে কাঁটার ঘায়ে
রক্ত-কমল ফোটেই যদি,
ভয় কেন তোর পূজারিণী।।

(ধেনুসহ বাড়ী ফিরছে কঙ্ক। বাঁশী বাজাচ্ছে সে।
নেপথ্যে আগের গানের অবশেষ)

নেপথ্যে

পুরুষ কণ্ঠে ঃ (গানে) প্রেম-ঠাকুরের এই তো ধারা।
ব্যথার ঘায়ে সর্বহারা,
প্রেম-ঠাকুরের এই তো ধারা।।

(একটু আড়ালে থেকে লীলা লক্ষ্য করে ঃ ঠাকুর
ঘরের বাইরে এসে ফুলগুলো ফেলে দিচ্ছে গর্গ)

নেপথ্যে

গায়েন (কথায়) ঃ লেপিয়া পুছিয়া ঘর পবিত্র করিয়া।
লীলার তুলা ফুল গর্গ দিল ফালাইয়া।।
দেব-পূজা করি গর্গ পবিত্র মন্দিরে।
ক্রোধচিত্তে ঢুকে গিয়া ভোজন আগারে।।

(লীলার নেপথ্য কণ্ঠে তার মনের ভাবনা—)

লীলা ঃ প্রতিদিন পূজাকার্য সমাপন করি।
আমারে ডাকিয়া নেন অতি তাড়াতাড়ি।।

(লীলা কি ভেবে নিয়ে সন্তর্পণে এগোয়)

(রান্নাঘরের অভ্যন্তর। নেপথ্যে গায়েনের কথা)

নেপথ্যে

গায়েন (কথায়) ঃ কঙ্কের লাগিয়া ভাত লীলা যত্ন করে।
টানাইয়া রাখে কাগমলার উপরে।।

(কিছু উঁচুতে ঢেকে রাখা ভাত। সেখানে এসে গর্গ দাঁড়ায়)

www.pathagar.com

চকিত হইয়া গর্গ চারিদিকে চায়।
মানুষ জন কিছু নাহি দেখিবারে পায়।।
কৌটা খুলি কাল–বিষ অন্নে মিশাইল।
গোপনে থাকিয়া লীলা সকলি দেখিল।।

(দৃশ্যে তা–ই দেখানো হয়)

(বাথান থেকে ধেনুসহ ফিরে আসছে কঙ্ক)

।। রান্নাঘর ।।

(কঙ্ক খেতে এসে দেখে ঃ ভাতের থালা সামনে নিয়ে লীলা বসে আছে। তার চোখে জল)

কঙ্ক (কথায়) ঃ লীলাবতী তুমি আজ কান্দ কি কারণ।
গৃহেতে ঘটিল কিবা অঘট–ঘটন।।
আর দিন আমি যবে গোষ্ঠ হতে আসি।
জিজ্ঞাসেন পিতা কত নিকটেতে বসি।।
আজি কিবা অপরাধ করিনু চরণে।
জিজ্ঞাসিয়া উত্তর না পাই তে কারণে।।

(লীলা নীরব চোখে তাকায় শুধু)

আর বার বলে কঙ্ক "দেবী, তোমারে সুধাই।
তোমারে কান্দিতে আমি কভু দেখি নাই।।"
কথা যদি নাহি বল মোর মাথা খাও।
আজি কেন বসুমতী কান্দিয়া ভাসাও।।

লীলা " ঃ আমার মিনতি রাখ শুন কঙ্কধর।
পালাইয়া যাও তুমি হইয়া দেশান্তর।।

(কঙ্ক জিজ্ঞাসু)

কতিপয় দুষ্টলোক পিতারে ছলিল।
সর্বনাশ হেতু সবে যুক্তি করিল।।

(কঙ্ক আরও জানতে চায়)

কাল গরল বিষ অন্নে মাখাইয়া।
আসিছে রাক্ষসী লীলা তোমারে খুঁজিয়া।।

কঙ্ক " ঃ পরম পন্ডিত পিতা কিছুদিন পরে।
দুষ্টের ছলনা প্রভু পাইবে বুঝিবারে।।
শুন দেবী লীলাবতী আমার বচন।

www.pathagar.com

দুঃসংবাদ

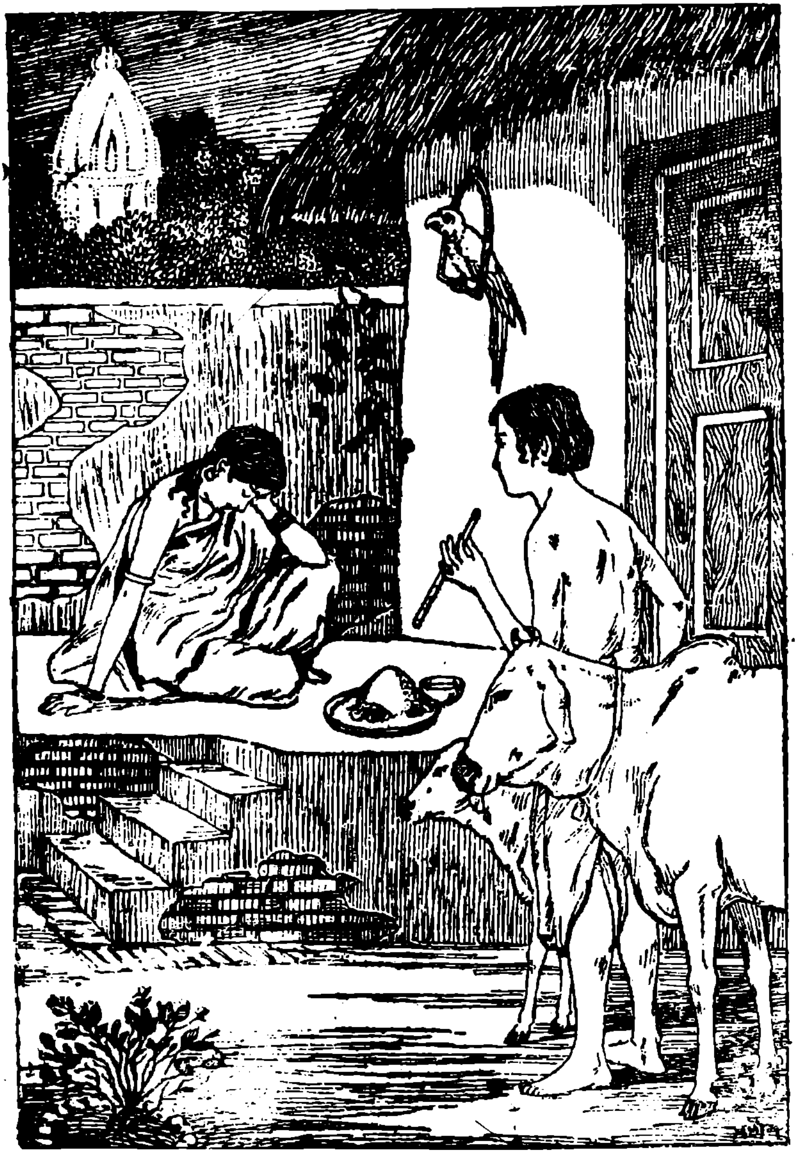

"আর বার বলে কঙ্ক, 'দেবী, তোমারে সুধাই।
তোমারে কান্দিতে আমি কভু দেখি নাই।।"

www.pathagar.com

কিছুদিন করিব আমি তীর্থেতে ভ্রমণ।।
রাখিও পিতারে লীলা অতি যত্ন করে।
ভ্রম দূর হলে পিতার ফিরি আইব ঘরে।।
বিদায় মাগিছে কঙ্ক লীলা তোমার কাছে।
আবার হইবে দেখা প্রাণ যদি বাঁচে।।

(লীলার চোখের জলে সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়)

।। অঙ্গন ।।

(কাপড়ের পোটলা নিয়ে বিদায় নিচ্ছে কঙ্ক। পিছনে লীলা আসে)

লীলা (গানে) ঃ তুমি কি চলিলে কঙ্ক কত কালের সাথী।
কেমন করে কাটবে লীলার অন্ধ দীঘল রাতি।।

কঙ্ক (গানে) ঃ ঘরে আছে পোষা রে পাখী হীরামন শারী।
তাহারে ডাকিও লীলা 'কঙ্ক' নাম ধরি।।

লীলা (গানে) ঃ তোমার দেশেও উঠবে গো চান জমবে তারার মেলা।
মনে রাইখ্য কবিকঙ্ক বকুল তলার খেলা।।

কঙ্ক (গানে) ঃ কঙ্কেরে স্মরিও লীলা সকাল দুপুর সাঁঝে।
মনের কথা শুইনো আমার তোমার মনের মাঝে।।

(কঙ্ক চলে যায়। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে লীলা)

।। পথ ।।

(অস্থির গর্গ আপন মনে বলে)

গর্গ (কথায়) ঃ দেবের মন্দির হইল পিশাচের থানা।
এমন পূজার ফুলে কীট দিল হানা।।
আর না ফিরিব আমি আশ্রমে আমার।
আগুনে পুড়াইয়া সব করিব ছারখার।।
মনেতে করিনু স্থির ভাবিয়া চিন্তিয়া।
মারিব পাপিষ্ঠা কন্যা জলে ডুবাইয়া।।

।।গৃহাঙ্গন।।

(লীলা দাওয়ায় উঠতে যাচ্ছে, তখনই ব্যস্ত হয়ে আসে বিচিত্র)

বিচিত্র (কথায়) ঃ লীলাবতী বোন আজি হইল সর্বনাশ।
কাল-বিষে সুরভির হইল প্রাণনাশ।।

(লীলা স্তম্ভিত)

www.pathagar.com

লীলা (কথায়) ঃ বিষ-মাখা ভাত তবে খাইল সুরভি।
বিচিত্র " ঃ আশ্রমে ডুবিল লীলা সৌভাগ্যের রবি।।
লীলা " ঃ চারিদিকে অমঙ্গল, কঙ্ক কাছে নাই।
বিচিত্র " ঃ তোমার পিতারে খুঁজি কোথাও না পাই।।

।। ঠাকুর ঘরের অভ্যন্তর।।

(ঠাকুরের পায় মাথা ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে আছে গর্গ)

নেপথ্যে

গায়েন (কথায়) ঃ দুই দিন গত হয় সর্বলোকে শুনে।
ধর্ণা দিয়াছে গর্গ দেবের চরণে।।
অন্নজল নাহি খায়, না দেয় মেলানি।
দুই দিন পরে গর্গ শুনে দৈববাণী।।

নেপথ্যে

দৈববাণী ঃ শুন শুন শুন গর্গ দেবের বচন।
দেবতা বিরূপ তোমা হইল যে কারণ।।
নিজ কন্যা বধিবারে যেবা যুক্তি করে।
পালিত জনেরে যেবা বিষ দিয়া মারে।।
সেই তো কারণে তার এই সর্বনাশ।
সেই বিষে সুরভির হইল প্রাণ নাশ।।

(গর্গ অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে তাকায়)

গর্গ (কথায়) ঃ সর্ব ধর্ম পন্ড হইল ইহ-পরকাল।
আপনার পায়ে মারি আপনি কুড়াল।।

(ইনসার্টঃ লীলা কাঁদছে)

সরলা সুশীলা কন্যা পাপ নাহি জানে।
হানিয়াছি মৃত্যু-বাণ তাহার পরাণে।।
অভিসন্ধি করিয়াছি মারিতে তাহায়।
কি কব পাপের কথা কইতে না জোয়ায়।।

(ইনসার্ট ঃ বিবাগী কঙ্ক পথ চলে)

দেবের সমান যার অন্তর সরল।
হেন পুত্রে বধিবারে দেই হলাহল।।
আশ্রমে গোহত্যা হইল আমার কারণ।
অগ্নিতে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন।।

www.pathagar.com

(গর্গ বেরিয়ে যেতে চায়। আবার দৈববাণী)

নেপথ্যে

দৈববাণী : শুন গর্গ, অনুতাপে দগ্ধ কর ভুল।
দেবতায় দাও লীলার তুলে আনা ফুল।।

(আনন্দাশ্রু চোখে নিয়ে গর্গ বাইরে যায়।
ফেলে দেওয়া ফুল কুড়িয়ে আনে)

নেপথ্যে

গায়েন (গানে) : আঙ্গিনার বাসি ফুলে, অঞ্জলি ভরিয়া তুলে,
পূজা করে দেবের চরণ।
লীলার তোলা বাসি ফুলে, পূজি প্রেম-অশ্রুজলে,
মুক্ত হইল গর্গের জীবন।।

।।ঠাকুর-ঘরের সম্মুখ।।

(দুয়ার খুলে গর্গ বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়।
সেখানে অপেক্ষমান বিচিত্র ও মাধব)

গর্গ (কথায়) : বহুদিন পুত্রজ্ঞানে পালিয়াছি যারে।
হীরামন তোতা মোর কোথা গেল উড়ে।।
চারিদিক শূন্য হেরি তাহার কারণ।
দেশে দেশে ঘুরি তোমরা কর বিচরণ।।
ভাইয়ের মতন তোমরা করিয়াছ স্নেহ।
কঙ্কের বিহনে মোর শূন্য হইল গেহ।।
যাও যাও বিচিত্র আরে মাধব সুন্দর।
যেখানে যে দেশে গেছে পুত্র কঙ্কধর।
আরও কইও কইও তোমরা জানায়ে মিনতি।
সন্দেহ ঘুচেছে মোর কঙ্কধর প্রতি।।
আরও কইও কঙ্করে পোষনিয়া পাখী।
ক্ষীর-সর ত্যাজিয়াছে তাহারে না দেখি।।
আন্ধাইরে ঢাইক্যা রইছে চান্দের বাগান।
আমার আশ্রম আজি হইয়াছে শ্মশান।।
যদি তার দেখা পাও কইও হাতে ধরি।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা ভিক্ষা করি।।

(বিচিত্র ও মাধব নীরবে গুরুর পদধূলি নেয়)

www.pathagar.com

।।গৃহাঙ্গন।।

(অঙ্গনের খুঁটিতে হাত রেখে লীলা দাঁড়িয়ে।
পিতার কথা শুনছে সে। মুখে ফোটে হাসি)

(গর্গ দেখছে – চলে যাচ্ছে বিবিত্র ও মাধব)

(অঙ্গন থেকে লীলা প্রায় ছুটে বেরিয়ে যায়)

(নেপথ্যে গান। গাছের নীচে লীলার নৃত্যময় অভিব্যক্তি)

নেপথ্যে

লীলা (গানে) ঃ পূবেতে উদয়রে ভানু পশ্চিমেতে যাও।
ব্রহ্মান্ড ঘুরিয়া কঙ্কের দেখা নিগো পাও।।
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও।
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও।।

।।নদীর ঘাট।।

(লীলা জল নিতে এসেছে)

নেপথ্য

লীলা (গানে) ঃ তুমি তো দরিয়া রে নদী কূলে তোমার বাসা।
তুমি জান কঙ্ক–লীলার মনের যত আশা।।
তুমি জান কঙ্ক-লীলার ভালবাসাবাসি।
জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াছি নিশি।।

।। ঠাকুর–ঘরের সম্মুখ ।।

(গর্গের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে বিচিত্র–মাধব)

বিচিত্র ঃ শৈশব–সুহৃদ মোদের প্রাণের বন্ধুভাই।
দেশে দেশে গিয়া তারে খুঁজিয়া না পাই।।

মাধব ঃ কত যে খুঁজিনু তার নাহি লেখাজোখা।
নিখোঁজ হইলা বুঝি না পাইলাম দেখা।।

(গর্গ নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করে)

www.pathagar.com

গর্গ : গুরুর দক্ষিণা দাও কঙ্কেরে আনিয়া।
পরাণে মরিব নৈলে তাহারে ছাড়িয়া।।
মহাযাত্রার আর নাহি বেশী দিন বাকী।
সুখেতে মরিব যদি কঙ্কে সামনে দেখি।।

(বিচিত্র–মাধবকে অনুরোধের কণ্ঠে–)

যে দেশেবাজিছে গৌর–চরণ–নূপুর।
সেই পথ ধরি তোমরা যাও ততদূর।।
যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল।
হরিনামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল।।
সেই দেশে কঙ্কের করিও অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ ভক্তের পাবে দরশন।

।।পথ।।

(খোল–করতালসপু সংকীর্তন গাইছে একটা দল)

কীর্তন : গৌরচরণ–নূপুর বাজে গো।
নদীয়ার সেই চাঁদ হৃদি–গগনে যেন
ভুবন–মোহন রূপে রাজে গো।।
গৌরচরণ–নূপুর বাজে।

(বিচিত্র–মাধব আসে)

সেই রূপে দুই নয়ন গেল।
নূপুরের ধ্বনি প্রাণ হরিল।।
সেই রূপে দুই নয়ন গেল।

বিচিত্র (কথায়) : কোথাও না পাই কঙ্কে।

(একটা গাছের নীচে নিদ্রিত কঙ্ক।

কঙ্ক স্বপ্ন দেখছে ঃ

চারদিকে তার আগুন জ্বলছে। তাকে ঘিরে
এগিয়ে আসছে আগুনের শিখা। কঙ্ক
ভীত। এমন সময় এগিয়ে এলেন সেই পীর।
হাত বাড়িয়ে ধরেন কঙ্কের হাত। আগুন থেকে
নিয়ে যান কঙ্ককে। – কঙ্ক জেগে ওঠে। পীর নেই)

www.pathagar.com

।।গৃহাঙ্গন।।

(লীলার সামনে নতমুখে দাঁড়িয়ে বিচিত্র–মাধব।

নেপথ্যে গায়েনের কথা)

নেপথ্যে

গায়েন (কথায়) ঃ রটিয়াছে জনরব, সর্বলোকে বলে।

ডুবিয়া মরেছে কঙ্ক দরিয়ার জলে।।

(বিছানায় শায়িতা লীলা। শিয়রে উপবিষ্ট গর্গ।

নির্বাক, যেন পাষাণ)

(গাছের পাতা ঝরে। বিচিত্র ও মাধব ঝরা পাতা কুড়িয়ে

গাছতলা পরিষ্কার করে)

(পাতাশূন্য গাছ। সেদিক দিয়ে অতিক্রম করে গেন্দু ও নন্দু।

একবার দাঁড়িয়ে নীরবে রুচিহীনের মত হেসে চলে যায়)

নেপথ্যে

গর্গের আর্তনাদ ঃ লীলা! মা ....

(সারা প্রকৃতি যেন সুরে সুরে কেঁদে ওঠে।

পাতাশূন্য গাছ দাঁড়িয়ে আছে)

– আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে –

।।শ্মশান।।

(ত্রস্তপায় কঙ্ক এগিয়ে আসে। হঠাৎ দাঁড়ায় সে।

অবাক হয়ে অদূরে দেখে ঃ গর্গ পাগলের মত শ্মশানের মাটি

জমা করেছে। যেন লীলাই শুয়ে আছে!

কঙ্ক আস্তে আস্তে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। গর্গের সেদিকে

খেয়াল নেই। কঙ্ক গর্গের পায়ে হাত রাখে। অবাক হয়ে

তাকায় গর্গ। দু'জনই উঠে দাঁড়ায়)

গর্গ ঃ লীলা আর নাই কঙ্ক!

(গর্গের বুকে কঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়ে)

www.pathagar.com

নেপথ্যে

গায়েন (গানে) ঃ আকাশে দেবতা কান্দে গর্গের কান্দনে।
ভাটীয়ালে কান্দে নদী না বহে উজানে।।

(ইনসার্টে নিসর্গের দৃশ্য)

নেপথ্যে

সহ-গায়েন ঃ আকাশেতে চন্দ্র কান্দে তারা কান্দে রৈয়া।
বনের পশুপক্ষী কান্দে বনেতে বসিয়া।।

নেপথ্যে

গায়েন (গানে) ঃ অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল।
কঙ্কের সহিত মুনি যায় নীলাচল।।
সঙ্গে চলে অনুগত শিষ্য পঞ্চজন।
সংসার তেয়াগি গেলা জন্মের মতন।।

(বন-বনান্তর পেরিয়ে ভ্রমনে বেরিয়েছে কঙ্ক ও গর্গ।
ভেসে আসে আগের গানের একটা অংশ-)

নেপথ্যে

লীলা (গানে) ঃ তোমার দেশেও উঠবে গো চান জমবে তারার মেলা।
মনে রাইখ্য কবি কঙ্ক বকুল তলার খেলা।।

নেপথ্যে

কঙ্ক (গানে) ঃ কঙ্কেরে স্মরিও লীলা সকাল দুপুর সাঁঝে।
মনের কথা শুইনো আমার তোমার মনের মাঝে।।

(পাহাড়ের পথে উঠে যাচ্ছে কঙ্ক ও গর্গ। তখনও
শোনা যাচ্ছে নেপথ্যের গান)

www.pathagar.com

পূর্ব–পাকিস্তানের নাটক

আসকার ইবনে শাইখ

রচনাকাল ঃ ১৯৬২
প্রকাশকাল ঃ
বাঙলা একাডেমী পত্রিকা
৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
বৈশাখ–আষাঢ়,১৩৭০
এপ্রিল–জুন, ১৯৬৩
পৃঃ ৯৭–১১২

পূর্ব–পাকিস্তান থেকে আজও মহাশূন্যে কোন রকেট নিক্ষেপ করা হচ্ছে না বা এখান থেকে আজও কোন মোটর গাড়ি তৈরী হচ্ছে না– এসব প্রশ্ন আমাদের মনে দূর থেকে উঁকি দিয়ে গেলেও এখানে আজও উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হচ্ছে না, এ প্রশ্নটা মনে বিরক্তির ছায়া ফেলে যায়। এই শেষ প্রশ্নের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আছে শুধু এই প্রশ্নেমোড়া দাবির পরিমাণ ও তারতম্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। চাইছি আমরা অনেক। তার রকমও অনেক। বিভিন্ন চাওয়ায় সঙ্গতি না থাকলে বিভিন্ন পাওয়ায় অসঙ্গতি আসতেই পারে। একই স্থান–কালের পরিপ্রেক্ষিতে পদহীনকে দেখে পাদুকাহীন যদি সান্ত্বনা পাওয়ার বদলে তৃপ্তিই পেয়ে বসে, তাহলে তাকে কতটুকুই বা দায়ী করা যায়? বর্তমানে আমরা যেন এক বিরাট 'না'–এর বৃত্তে সীমিত হয়ে বাস করছি। আমাদের কামনা–বাসনা, দাবি–দাওয়া প্রত্যাশিত মুক্তি–পথে এগোতে চাইলেই এই না–এর দর্শন লাভ নিশ্চিত। দশদিকে তাই একটি ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছেঃ নেই। এটা সামগ্রিক জীবনের কথা। আমাদের আছে সবই, অথচ কিছুই যেন নেই। উপায় আছে, ইচ্ছা নেই। প্রয়োজন আছে, চেষ্টা নেই। অনেকটা 'দুয়ার আছে, ঘর নেই'–এর মত।

www.pathagar.com

নাটকের বেলাতেও প্রায় তা-ই। নাটক সম্পর্কে বহুত কথা আমরা বলি। অনেকটা চর্যাপদের মত। অর্থ আছে, স্পষ্টতা নেই। এমনিতর বলা থেকেই বলাবলির সৃষ্টি হয়। আমরা বলাবলি করি। কিছুটা ন্যায়ত, কিছুটা ধর্মত, কিছুটা জানার অভাববশত। নট বলেন, নাট্যকার নেই– অভিনয়যোগ্য 'সত্যিকার' নাটক লেখবার মত উপযুক্ত নাট্যকার। নাট্যকার বলেন, লিখব কি করে? নাট্য-মঞ্চ নেই। নাট্য-মঞ্চ কিছুই বলে না। তবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞানপূত সমালোচক বলেন, নাট্য-মঞ্চ তো নেই-ই, দু'একজন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কোন নাট্যকারও নেই। সকলের কথা ঠিক বলে ধরে নিয়ে একত্র করে যুক্তি-প্রয়োগে দেখা যাবে, আমরা কেউই নেই, কিছুই নেই। শুধু সমালোচনা ছাড়া। অথচ জাতীয় নাট্য-মঞ্চের কথা বাদ দিলে মনে হয় সবই আমাদের আছে। নট, নাট্যকার, নাটক এবং সাধারণ নাট্য-মঞ্চও। তাহলে?

সব নট-নাট্যকার-সমালোচকই একথা ঠিক এভাবে বলেন না। দেশ, সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা। নিজেদের ধারণা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সবাই হয়তো ঠিক কথাই বলেন। কিন্তু বহুবচনের বিভিন্ন 'ঠিক' পরস্পরের সংঘাতে একটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে। তাই তথ্যে আসাই ভাল। নাটক এক যৌথশিল্প বলে 'পূর্ব-পাকিস্তানের নাটক' বলতে আমি গত পনের বছর ধরে যেসব রচনা নাটক নামে অভিহিত হয়ে আসছে এবং ছাপা হয়ে বেরিয়েছে সে সব রচনা এবং এই পনের বছরের অভিনয়-শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন নাট্য-কর্মকে বোঝাচ্ছি। এই সমগ্র নাট্য-প্রবাহের রূপ ও প্রকৃতি আযাদী-উত্তর কালে নব-পরিচিতি লাভ করলেও আযাদী-পূর্বকালে তার একটা রূপ ও প্রকৃতি ছিল। সামান্য হলেও একটা সামগ্রিক নাট্য-অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই আমরা নবরূপায়ণের পথে এগিয়ে এসেছি। এই সাথে প্রকাশিত নাটকের যে তথ্যতালিকা দেওয়া হল, তাতে দু'টি সময়ের পরিচয়ই তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে।

(আযাদী-পূর্ব কাল এবং আযাদী-উত্তর কালের তালিকা দু'টিতে তথ্যগত ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু 'সংক্ষিপ্ত তালিকা'য় দু'টি কালের বিষয়ভিত্তিক নাট্য-সংখ্যার শতকরা হিসাবে যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তথ্যগত ভুলের জন্য সে-চিত্রে তেমন কোন প্রভাব পড়বে না; কারণ তথ্যগত ভুল বিষয়ভিত্তিক সব বিভাগেই থাকবার কথা এবং এমনি অবস্থায় শতকরা হিসাবে সে-ভুল দূরীভূত হয়ে যাওয়ারও কথা।)

www.pathagar.com

আযাদী–পূর্ব কাল ঃ

নাট্যকার	নাটক								
	ঐতিহাসিক	সংখ্যা	সামাজিক	সংখ্যা	লোক–কাহিনী ভিত্তিক	সংখ্যা	অন্যান্য	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
কাজী নজরুল ইসলাম			আলেয়া ও ঝিলিমিলি	১					১
শাহাদাৎ হোসেন	সরফরাজ খাঁ, নবাব আলীবর্দী, মসনদের মোহ, আনারকলি	৪							৪
ইব্রাহিম খাঁ	আনোয়ার পাশা, কামাল পাশ	২							২
আবুল ফজল			আলোক–লতা, একটি সকাল	২					২
আকবরউদ্দিন	সিন্ধু–বিজয়	১							১
মন্মথ রায়					মহুয়া	১			১
সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ	বঙ্গগৌরব হোসেন শাহ	১							১
রমেশ গোস্বামী	কেদার রায়	১							১
বন্দে আলী মিঞা	আমানুল্লাহ্	১							১
মোহাম্মদ আব্দুর রহমান	দেবলা–উদ্ধার	১							১
মোঃ ইসহাক রেজা চৌধুরী	চক্রজাল	১							১
নূরুল মোমেন			রূপান্তর	১					১
মোট		১২		৪		১		০	১৭
শতকরা হিসাবে	প্রায়	৭১	প্রায়	২৩	প্রায়	৬		০	১০০

www.pathagar.com

আযাদী—উত্তর কাল :

নাট্যকার	নাটক								
	ঐতিহাসিক	সংখ্যা	সামাজিক	সংখ্যা	লোক-কাহিনী ভিত্তিক	সংখ্যা	অন্যান্য	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
(বর্ণক্রম অনুসারে)									
অন্নদা মোহন বাগচী	মসনদ	১							১
আখন্দ মোঃ শামসুল হক			কার দোষে?	১					১
আজীম উদ্দীন আহ্মদ			অহংকার, মা	২	মহুয়া, কাঞ্চন	২			৪
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	মেহের নিগার	১	যা' হতে পারে	১					২
আবু জাফর শামসুদ্দিন							শনিগ্রহ ও পৃথিবী	১	১
আবু যোহা নুর আহমেদ	জাহাঙ্গীরের বিচার, আনারকলি	২	আগামী দিন, তামাসা	২					৪
আবুল ফজল	কায়েদে আযম	১							১
আবুল হাশেম			মাষ্টার সাহেব	১					১
আব্দুল ওয়াহেদ			আঁধারে আলো	১					১
আব্দুল মতিন			অভ্যুদয়	১					১
আব্দুল জব্বার খাঁ	ইসা খাঁ	১	জাগলো দেশ, প্রতিজ্ঞা	২					৩
আব্দুল জব্বার চৌধুরী			পাশাপাশি	১					১
আব্দুল মাজেদ তালুকদার			প্রতিজ্ঞা	১					১
আব্দুর রহীম আখন্দ			কার ভুলে, প্রত্যাগত	২					২
আব্দুল হক			অদ্বিতীয়া	১					১
আব্দুল হাই মাশরেকী			সাঁকো	১					১

www.pathagar.com

নাট্যকার	নাটক								
	ঐতিহাসিক	সংখ্যা	সামাজিক	সংখ্যা	লোক-কাহিনী ভিত্তিক	সংখ্যা	অন্যান্য	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
আশরাফ উজ জামান খান			সয়লাব	১					১
আসকার ইবনে শাইখ	অগ্নিগিরি, রক্তপদ্ম	২	বিরোধ, পদক্ষেপ, দুরন্ত ঢেউ, বিদ্রোহী পদ্মা, প্রতীক্ষা, অনুবর্তন, বিল বাওরের ঢেউ, এপার-ওপার,	৮					১০
আলাউদ্দিন আল-আজাদ			ইহুদির মেয়ে	১			মরক্কোর যাদুকর	১	২
আলী মনসুর			পোড়ো বাড়ী, বোবা মানুষ	২					২
ইব্রাহিম খলিল	ফিরিঙ্গী-রাজ, সমাধি, স্পেনবিজয়	৩							৩
ইব্রাহিম খাঁ	ভিস্তি-বাদশা	১	ঋণপরিশোধ, কাফেলা	২					৩
এ.এইচ.এম. বসির উদ্দিন	সোহরাব-রোস্তম	১	বিচিত্রানুষ্ঠান, সংশোধন	২					৩
এ.কে. মকবুল আহমদ			গাঁয়ের মেয়ে	১					১
এম.এ. আজম			এই শতাব্দী ও তারপর	১					১
এম.এ. হাসেম খান			দেশের দাবী	১					১
এম. আব্দুল হামিদ চৌধুরী	নবাব আলীবর্দী	১							১
এম. গোলাম রহমান	উদয়নালা, ইরাণ-দুহিতা, ফিরোজ শাহ্	৩							৩
ওবায়েদুল হক			এই পার্কে, দিগ্বিজয়ী চোরাকারবার, ভোট ভিখারী	৩					৩

www.pathagar.com

নাট্যকার	নাটক								
	ঐতিহাসিক	সংখ্যা	সামাজিক	সংখ্যা	লোক-কাহিনী ভিত্তিক	সংখ্যা	অন্যান্য	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
ওহীদুল আলম			হালুয়া	১					১
জসিমুদ্দিন			পল্লীবধু	১	বেদের মেয়ে, মধুমালা	২			৩
কবির চৌধুরী			আহবান	১					১
কাজী নজরুল ইসলাম					মধুমালা	১			১
কাজী মুহাম্মদ ইলিয়াস			স্মাগলার	১					১
কে. এম.জিয়াউদ্দিন			মঞ্জুমুকুল	১					১
কোবাদ আলী			আমার দেশ	১					১
খলিল আহ্মদ			উপেক্ষিতা	১					১
তালুকদার সাজাহান			নীড় ভাঙা ঝড়	১					১
নেয়ামাল ওয়াকীল	বীর কেশরী খালেদ	১							১
নুরুল মোমেন			নেমেসিস, নয়া খান্দান, যদি এমন হোত	৩					৩
নুর আহমদ শাহ্	হাসনু-আদহাম	১							১
পরেশ প্রসন্ন সেন	তপস্বিনী	১							১
প্রসাদ বিশ্বাস			অবিচার, পাকা রাস্তা	২					২
ফকীর লোকমান হাকিম			যুগের ডাক	১					১
ফররুখ আহমদ	নৌফেল ও হাতেম	১							১
ফররুখ শিয়ার			ব্ল্যাকমার্কেট,	২					২

www.pathagar.com

নাট্যকার	নাটক								
	ঐতিহাসিক	সংখ্যা	সামাজিক	সংখ্যা	লোক-কাহিনী ভিত্তিক	সংখ্যা	অন্যান্য	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
ফেরদাউস খান							কচিমেলা	১	১
ফিরোজ অল-মোজাাহিদ			স্বপ্ন	১					১
বন্দে আলী মিঞা			টোটো কোম্পানীর ম্যানেজার	১					১
বিরস-রসনা (সৈয়দ আব্দুস সাত্তার)			কবি-দা	১					১
প্রসাদবিশ্বাস			বিচার, অগ্নিস্নান, কবি সমাচার	৩					৩
মোজাহার হোসেন			জালিম	১					১
মোহাম্মদ ইউসুফ			মেঘনা	১					১
মোহাম্মদ নেজামতুল্লাহ্	শহীদ সেরাজ	১							১
মোহাম্মদ সোলায়মান			জরীপ	১					১
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত-প্রান্তর	১							১
মুফাখখারুল ইসলাম	মুরশীদ	১							১
যোগেশ চন্দ্র নাথ			গণ-জাগরণ	১					১
রাজিয়া খান			আবর্ত	১					১
রাজিয়া মহবুব							সাগর কন্যা	১	১
শওকত ওসমান	বাগদাদেরকবি	১	আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর কাঁকরমনি, এতিমখানা	৪					৫

www.pathagar.com

নাট্যকার	নাটক								
	ঐতিহাসিক	সংখ্যা	সামাজিক	সংখ্যা	লোক-কাহিনী ভিত্তিক	সংখ্যা	অন্যান্য	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
শফিকুল কবীর			জীবন-সংগ্রাম	১					১
(ডাঃ) শাহাদাত আলী খান			ছোট মা, ভুল	২					২
শেখ সামসুল হক			চাষীর ভাগ্য, ঝঙ্কার	২					২
সাইমুম			জাহান্নাম	১					১
সৈয়দ ওয়াহিদুল ইসলাম			অভিযান	১					১
সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ			বহিপীর	১					১
মোট		২৫		৭৮		৫		৪	১১২
শতকরা হিসাবে	প্রায়	২২	প্রায়	৭০	প্রায়	·৪	প্রায়	৪	১০০

www.pathagar.com

নাটক রচনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে, তুলনামূলকভাবে তার জাতওয়ারী পরিবর্তন। একশ'টি রচিত ও প্রকাশিত নাটকের মধ্যে জাতওয়ারী হিসাব হলঃ

সংক্ষিপ্ত তালিকা

	ঐতিহাসিক	সামাজিক	লোক-কাহিনী ভিত্তিক	অন্যান্য
আযাদী-পূর্ব কালে	৭১	২৩	৬	০
আযাদী-উত্তর কালে	২২	৭০	৪	৪

এ সত্য স্পষ্ট যে দুই সময়ে মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে সামাজিক নাটকের সংখ্যামানের ওলটপালট হয়েছে। এইকালে স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকারের শিল্প-চিন্তা হয়েছে বাস্তবমুখী ও সমস্যা কেন্দ্রিক। 'অন্যান্য' পর্যায়ের নাটক রচনাকেও এ কালের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, 'শনিগ্রহ ও পৃথিবী' এবং 'মহক্কোর যাদুকর' প্রভৃতি 'অন্যান্য' পর্যায়ের নাটক কল্পনার মুক্তি বিস্তারের প্রমাণই বহন করে। এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে শক্তিমত্তার পরিচায়ক। অপ্রকাশিত নাটকের উল্লেখ তথ্য-তালিকায় করা হয়নি। আশা করা যায়, তার সংখ্যাও প্রকাশিত নাটক-সংখ্যার কাছাকাছিই হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নাটক আমরা লিখেছি এবং সাহিত্যের অন্যান্য দিকের তুলনায় তার সংখ্যা নগণ্য নয়, আশাপ্রদভাবে গণ্য। মঞ্চরীতি ও প্রয়োগপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও অগ্রগতি হয়েছে। এই পনের বছরে সমগ্র নাট্যপ্রবাহ যথেষ্ট প্রাণবন্ত ও বেগবান হয়েছে, এ দাবি আমরা করতে পারি। পারি যদি, তাহলে কি মনে করব, 'নাটক নেই' কথাটারও কোন অর্থ নেই? এসব নাটক কি নাটক নয়? যেমন গাঁদাফুল ফুল হয়েও ফুল নয়?

।। দুই ।।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞার সবগুলো প্রয়োজনীয় দাবি গাঁদাফুল মেটাতে পারছে না বলেই ওটা ফুল নয়। তেমনি সাহিত্য-প্রমাতার দেওয়া নাট্য-সংজ্ঞার সবগুলো দাবি মেটাতে পারছে না বলেই হয়তো আমাদের নাটক নাটক হতে পারছে না। তবে ব্যবহারিক জগতে গাঁদাকে সবাই ফুল বলেই ধরে নিয়েছে। নাটককে নাটক বলে ধরে নিতে ক্ষতি কি? কিছুটা থাকলেও সে ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নেওয়া যায়, যদি নাটক কথাটির আগে একটা বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মোহিতলাল মজুমদার তা-ই দিয়েছেন। মহাজন-বাক্য মেনে নেওয়াই ভাল। বলা বাহুল্য, সব আদর্শ নাটকই একই পরিমাণের আদর্শ নয় এবং সব সাধারণ নাটকই একই পরিমাণের সাধারণ নয়। অনেকটা অনার্স ও পাস গ্র্যাজুয়েটদের মত। কৃতিত্বের তারতম্য আছে দু'য়ের মধ্যেই। আছে বলেই স্বীকার করতে হয়, 'খুব আদর্শ' থেকে 'খুব সাধারণ' সব নাটকই নাটক। তবে ভাল আর মন্দ। কোন দেশের নাট্যরচনার আরম্ভকালে সাধারণ নাটকের আশা করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। এই আণবিক যুগের দুনিয়া খুব সঙ্কুচিত। আজ দূরবর্তী দু'টি দেশও জ্ঞান ও ভাবের আদান-প্রদানে খুবই কাছে। সমগ্র দুনিয়ার জ্ঞান ও ভাবের উত্তরাধিকারলাভ সবারই সাধ্যায়ত্ত। সেদিক থেকে নাটকের সর্বাধুনিক স্তর থেকে আমাদের নাট্য-কর্মীর যাত্রা শুরু হতে পারে - একথাও কেউ বলতে পারেন। পাকিস্তানে আজ জেটবিমান তোয়ের করার ইচ্ছা করা হলে যে তাকে রাইট-ভাতৃদ্বয়ের অনুশীলন থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে, এমন ধারণা কেউ পোষণ করবেন না। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রেও কি এ ধারণাটুকু সর্বাংশে সত্য হবে?

কোন দেশের নাট্যপ্রবাহে প্রাণ ও বেগ সঞ্চার করে তাকে অগ্রগতির পথে মুক্তির সন্ধান দিতে হলে প্রয়োজনঃ

ক) উপযোগী রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা;

খ) কুশলী ও ব্রতশীল নাট্য-শিল্পী ও নাট্যকর্মী; এবং

গ) অতীতের নাট্য-অভিজ্ঞতা।

এইসব প্রয়োজন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতেঃ

জাতীয় জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত না হইলে উচ্চাঙ্গের নাটক রচনা সম্ভব হয়না।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেনঃ

তটের সঙ্গে তরঙ্গের মৃদু সংঘাতে যেমন নদীর জলে ঐক্যতান বেজে ওঠে, তেমনি শ্রোতা ও লেখকের মধ্যে একাত্মবোধ থেকেই উচ্চাঙ্গ নাটকের জন্ম হয়।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেনঃ

সমগ্র জাতি যখন এক গৌরবময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় ও তাহা হইতে এক মহৎ কর্ম-প্রেরণা লাভ করে, তখনই নাট্যপ্রতিভার বিকাশ সম্ভব।

এসব কথা মেনে নিলে 'মাহেন্দ্রক্ষণ'টির জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ও তার বিভিন্ন দিকের কথা এসে যায়। পন্ডিত ব্যক্তিদের মতে এলিজাবেথীয় যুগে ইংল্যান্ডের অবস্থাদি 'মাহেন্দ্রক্ষণে'র জন্ম দিয়েছিল এবং নাটকের ক্ষেত্রে নাকি তারই অবদান হলেন শেক্‌স্‌পিয়ার। তা-ই যদি হয়, তাহলে নাট্যপ্রতিভা বিকাশের জন্য জাতীয় জীবনের এই 'মাহেন্দ্রক্ষণ'টি পূর্ব-প্রয়োজন। আর এই

www.pathagar.com

ক্ষণটির অবদান নাট্যকার-সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়। অবস্থা তখন বিভিন্ন নাট্য-কর্মী সৃষ্টির সহায়ক হয়। আয়ার্ল্যান্ডের উদাহরণ থেকেও এসব কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মনন ও কর্মধারার এক বিশেষ অর্জিত স্তরই নাট্য তথা সাহিত্য-ক্ষেত্রের এই মাহেন্দ্রক্ষণ। এ ক্ষণটি পঞ্জিকায় লেখা থাকে না। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ এসে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত – এ কোনদিন হবার নয়। এর একটা প্রস্তুতি থাকে, কাজের মধ্য দিয়ে যার সঞ্চয় যুগের পর যুগ অর্জনের পথে এগিয়ে যায়। পাহাড়ের বাঁকা পথে বয়ে আসা ক্ষীণ জলধারাই সমতলের অনুকূল অবস্থায় বিশাল নদী হয়ে দেখা দেয়। প্রলয়ঙ্করী ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতন অবস্থায় একটি ক্ষীণদেহী পাহাড়ি নদীর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। আরম্ভেই বিশাল — এমনি একটি নদীর কথা চিন্তা করা কষ্টকল্পনা বই কিছুই নয়। প্রাণবন্ত ও বেগবান একটি নাট্যপ্রবাহের পেছনেও তেমনি এক নাট্য-ঐতিহ্য বা নাট্য-অভিজ্ঞতার অস্তিত্বও মেনে নিতে হয়। শেক্‌স্‌পিয়ারের দানে সমৃদ্ধ হওয়ার আগে ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের ভান্ডার শূন্য ছিল না। অভাব ছিল না নাট্য-শিল্পীর, বাধা ছিল না নাট্যাভিনয়ের। কিন্তু আমাদের এই দেশে? মীর মশাররফ হোসেন নাটক লিখেছিলেন — একথা আজ সবারই জানা। কিন্তু তা অভিনীত হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না। তবে ধারণা করা যায় মুসলমান-সমাজ এ ব্যাপারে অকৃপণ ছিল না। তার ধর্মীয় সংস্কার, তার মানসগঠন নাট্যাভিনয়কে জায়েজ বলে রায় দেয়নি। কিছুটা অতীতে গিয়ে আমাদের নাট্যধারার সন্ধান করলে তাই শূন্যতার খপ্পরে পড়তে হয়। তবে কি নাট্য-অভিজ্ঞতা আমাদের একেবারেই নেই? আছে, কিন্তু অতিসাধারণ নাটকের অভিনয়ের এবং তা-ও পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত। সে অভিজ্ঞতা অভিনয় করতে গিয়ে আমরা পাইনি, পেয়েছি কিছুটা নাট্য-ধারণা এবং তা যাত্রা, অপেরা ও আবেগ প্রধান পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাটকের। তাহলে সেদিন পর্যন্ত নাট্য-ঐতিহ্য নয়, নাট্য-অভিজ্ঞতাও নয়, কিছুটা নাট্য- ধারণা শুধু আমাদের ছিল। তারপর আযাদীর ঢেউ যখন এল, প্রায় তখন থেকেই আমাদের তরুণেরা অভিনয়ে নামলেন। সমাজের বাধাকে আড়াল করে, ইব্রাহিম খাঁ-শাহাদৎ হোসেন রচিত নাটক নিয়ে। মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। গ্রামে গ্রামে বাঁশ-কাঠে তৈরী মঞ্চ, শাড়ি-ঝোলানো উইংস্, বিয়ের পালকি জড়ানো শাদা-লাল পর্দার দৃশ্য, দেবদারু পাতায় সাজানো মঞ্চ-মুখ। এমনি এক মঞ্চে হ্যাজাকের আলোয় চলেছে সেদিনের তরুণ-অভিনয়। শহরে তার কিছুটা উন্নত স্তর। এই আরম্ভ। দশ-পনের বছরের এমনি ক্ষীণ প্রত্যক্ষ নাট্য-অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের নাট্য প্রবাহ পূর্ব-পাকিস্তানের সমতলে বয়ে এসেছে। কাজেই শাহাদাৎ হোসেন-ইব্রাহিম খাঁ কেন মার্লো-শেক্‌স্‌পিয়ারের মত নাটক আমাদের

www.pathagar.com

জন্য রচনা করতে পারলেন না এ প্রশ্ন না জাগাই উচিত। মার্লোর আগে পর্যন্ত ইংরেজি নাট্য সাহিত্যের রূপরীতি অনুধাবন করলে এটুকু অনুভব করা যেতে পারে যে, নিরাশ হওয়ার মত আমাদের নাট্যকারেরা কিছু করেননি। ইংল্যান্ডবাসীদের রাষ্ট্র-ধারণা অন্তত একশ' বছরের ওপার থেকে আমাদের প্রতি চোখ ঠারছে, এ কথাটাও কোন কোন নাট্যকার স্মরণ করিয়ে তৃপ্তি পেতে পারেন।

নাটকের তথ্য-তালিকা প্রমাণ করবে, সাতচল্লিশোত্তর কালে আমাদের নাটক রচনার উৎসাহ-উদ্দীপনা সাতচল্লিশপূর্ব কালের তুলনায় বেড়েছে অনেক। সাতচল্লিশের দুই পারের নাট্য-অভিজ্ঞতার দুই কালের পরিমাণও প্রায় সমান বলে এই তুলনা বৈধ। কিন্তু নাটক আমাদের উঁচুমানের হয়নি। শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর রাজার এক যুদ্ধের প্রয়োজনে একটি নদীর গতি-পথকে সম্পূর্ণ নতুন পথে প্রবাহিত করবার জন্য যথাবিহিত খাল কাটালেন। যুদ্ধ হল, জয়-পরাজয়ও হল; কিন্তু নতুন পথে নদী প্রবাহিত হল না। নাট্যধারার পরিবর্তনও হঠাৎ হয় না। অবিশ্যি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে অতি অল্প সময়ে সে পরিবর্তন আনা অসম্ভব না-ও হতে পারে। গত পনের বছরে এখানকার পরিবেশ পরিবর্তিত হলেও তা উপযুক্ত হয়েছে, একথা বলা যায় না। এতদিন আমরা যে সব নাটক লিখেছি, সাধারণভাবে দেহ-ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশেরই আঙ্গিক, অভিনয় ও মঞ্চ-রীতি পুরনো ও চিরাচরিত। সেগুলোর কাহিনী, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ ও দৃশ্য পরিকল্পনা আমাদের লব্ধ নাট্য-অভিজ্ঞতারই ছাপ বহন করে। দেশে, সমাজে অত্যাচার অবিচার চলছে। ঘুষখোর, মুনাফাখোর, মামলাবাজ, ফতোয়াবাজ নিরপরাধের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। তরুণ নায়ক এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। একটি ষোড়শী প্রেম তাকে উৎসাহ যোগায়। অনেক কষ্টের পর সে জয়ী হয়। কোন ক্ষেত্রে ষোড়শী গৃহিণী হয়, কোন ক্ষেত্রে হয় না। এই হল মোটামুটি নাটকের কাঠামো। কাহিনীর কাল দীর্ঘ। স্থান একাধিক। নাটক কতিপয় অঙ্কে এবং প্রতি অঙ্ক কতিপয় দৃশ্যে বিভক্ত। সমগ্র নাটক যেন সংলাপে ব্যক্ত পুরনো আঙ্গিকের এক বাংলা উপন্যাস। আমাদের রচিত সামাজিক বেশির ভাগ নাটকের মোটামুটি এই পরিচয়। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু সে ব্যতিক্রমও নিয়মস্থাপনের মত জোরদার নয়। যাত্রা ও ঐতিহাসিক নাটকের আঙ্গিকও মোটামুটি তা-ই। পার্থক্য যা, তা অনেকাংশে কাহিনী-উৎসের পার্থক্যের জন্য। বলা যায়, যাত্রার আঙ্গিকই দেশ-কালের পরিবর্তনে গা' মুড়ে ঐতিহাসিক নাটক হতে বর্তমানের সামাজিক নাটকে এসেছে। কাহিনী-উৎসের পরিবর্তন অর্থাৎ পৌরাণিক থেকে ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক থেকে সামাজিক নাটক-রচনার ধারাবাহিকতা যুগ পরিবর্তনের ফল। এই পরিবর্তন ঠিকই এসেছে। আসেনি

www.pathagar.com

আঙ্গিকের পরিবর্তন। মনে রাখতে হবে, এখানকার নাট্য পিপাসুদের চাহিদারও এমন কোন পরিবর্তন হয়নি, যাতে আঙ্গিক-পরিবর্তনের খুব জোর তাগিদ আসতে পারে। চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক খুব প্রত্যক্ষ। সাধারণ নাটকেই আমাদের চলে এসেছে এতদিন। এতেই সমাজের মনোরঞ্জন হয়ে এসেছে। নতুন ভাবধারা ও জাতীয়তার আবেগ-প্রকাশের ইচ্ছা থেকেও আমাদের বহু নাটকের জন্ম। আবার এত নাটক বহুর ভাবধারা ও আবেগকে বাড়িয়ে দিতেও কম সাহায্য করেনি। এদিক থেকে ওসব নাটকের প্রয়োজন ছিল বৈকি! এবং এই সাধারণ নাটকের পক্ষে এ প্রয়োজন মেটানোর গৌরবও যথেষ্ট। Poetic justice-এর প্রতি আমাদের প্রকৃতিগত যে একটা সাধারণ টান আছে, সেই টানই এসব নাটক দ্বারা কিছুটা শান্ত হয়। কারণ এ জাতীয় নাটকে ধর্ম, সত্য, ন্যায়, মহত্ত্ব প্রভৃতি জীবন-ধারণা যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচারিত হয়ে থাকে, অথচ কিছুতেই সেই অন্যায়ের উপশম হয় না- তারই পরাজয়ে বা ধিক্কারে আমরা আত্মপ্রসাদ পাই। মোহিতলাল বলেছেনঃ

এই সাধারণ নাটক যে সর্বকালীন বা সার্বভৌমিক সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাতে সময় বিশেষে সমাজ বিশেষের মনোরঞ্জন হইয়া থাকে, সেই প্রত্যক্ষ ফললাভই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি সেইরূপ নাটকেও যে ভাবোদ্দীপনা থাকে, তাহাতেই এক ধরনের রসোদ্রেক হয়। ··· সাধারণ নাটকে ঐ ভাবোদ্দীপনা নিম্নস্তরেই থাকিয়া যায়, চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয় না, ধাক্কা দেয়—একটা উত্তেজনাপ্রসূত নেশার সৃষ্টি করে মাত্র। তথাপি সেই নেশারও দাম আছে। মানুষের নিতান্ত বাস্তবপীড়িত মন উহাতেই কিছুক্ষণের জন্য বাস্তব-মুক্তির একটা সুখ অনুভব করে; বাস্তবকে খুব গভীরভাবে রূপান্তিত করিবারও প্রয়োজন হয় না, কেবল তাহাকে জীবনের মঞ্চ হইতে রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া অভিনয়ের দ্বারা একটু শোধন করিয়া লইলেই হইল।

রাষ্ট্রীয় ও যুগ-পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন ও মননের পরিবর্তন হয়। কিন্তু তা রাতারাতি হয় না। কিছুটা সময় লাগে। তাছাড়া ধাতস্থ হয়ে সে পরিবর্তন শিল্পসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে নতুন রূপে প্রকাশিত হতেও সময় লাগে। পনের বছর তার জন্য খুব যথেষ্ট নয়। অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে। এখনও অতীতের নাট্য-অভিজ্ঞতা আমাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে—চাহিদাতেও, সরবরাহেও।

www.pathagar.com

।। তিন ।।

কিন্তু পরিবর্তন এসেছে। সাতচল্লিশের আযাদী ছাড়াও। সে পরিবর্তন জীবনযাত্রার, দৃষ্টিভঙ্গির। নাটক কি ধরনের হবে, তা জেনেই তার অভিনয় দেখতে যাই। কিন্তু তৃপ্তি পাই না। অথচ এ ধরনের নাট্যাভিনয়ে কিছুদিন আগেও তুষ্টি ও চাঞ্চল্য ছড়ানো ছিল। আমরাই তা কুড়িয়েছি। এ কি অস্বীকার করা যাবে যে, এই আনন্দবঞ্চনার দায়িত্ব অনেকটা আমাদেরই মনের? মনেরই পরিবর্তন হচ্ছে। এটা যুগপরিবর্তনেরই ফল। রুশ-মার্কিন শিল্প-জ্ঞানে চাঁদের মুখ ঘুরে বেড়ালেও সেদিন পর্যন্ত আমরা অনেকেই বাস্তব জেটবিমান চোখে দেখিনি। কাজেই ওসব দেশে শিল্প যুগ বুড়িয়ে গেলেও আমাদের দেশে তা নবজাত। শিল্পযুগ স্বাভাবিকভাবেই এদেশেরও জীবন যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনবে। নবজাতকের একটু বয়স বাড়লেই তা আশা করা যায়। নতুন যুগের সমস্যায়-সমাধানে তখন মানুষ জীবনকে অনুভব করবে নতুন করে। নাট্যকার এই অনুভূত জীবনকেই তুলে ধরবেন নতুন আঙ্গিকে। এই পরিবর্তনের কারণ ও ফল কিছুটা সময়ের দুই পারে অবস্থিত। আমাদের এখানে পরিবর্তনের কারণ ঘটেছে এবং ঘটছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের মধ্যযুগীয় আরাম-আয়েশ, চলা-বলা, আনন্দ-উৎসব বর্তমান যুগের শহর-জীবনে তো কল্পনা করাই যায় না। গ্রামীণ জীবনেও আজ তা বেমানান। সারারাত জেগে থেকে যাত্রাগানের লীলা-মাধুর্য উপভোগ করতে গাঁয়ের চাষীও আজ নারাজ। সে জানে রাতের পরের দিনটি তাকে ক্ষেতে কাটাতে হবে। রাতের ঘুম তার সহায়ক। তাছাড়া যাত্রার আসর বসায় কে? আগে ছিল রাজা-রাজড়া, জমিদার-তালুকদার। তাঁদের মিহি জীবনের দ্যুতির বিচ্ছুরণ হিসাবে জনসাধারণ পেত যাত্রা-থিয়েটার, নাচ-গানের আনন্দ। কিছুদিন আগেই তাঁরা অতীত হয়েছেন এবং যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত, তাঁরা আজও ব্যাঙ্কের ব্যস্ত পথে ধূলি উড়াচ্ছেন। মনের আনন্দ-বাসনার গলি-পথে নজর দিলেও সংস্কৃতির ছায়াপথে দৃষ্টি ফেরানোর প্রবৃত্তিলাভ করতে তাঁরা এখনোও পারেননি। গাঁয়ের লোকেরা মাঝে মাঝে তাঁদের লাখ-বিলাখের খবর পায়। কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া অতীতের আস্বাদন আর পায় না। কাজেই মধ্যযুগীয় আনন্দ-ধারার তলানিটুকুতে গা' ভিজিয়ে অবগাহনের আস্বাদ পেতে চেষ্টা করে এদেশের শতকরা পঁচানব্বই জন। বাকি পাঁচ জন অশিক্ষিত শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম শিক্ষা ও সম্মানলব্ধ সংস্কৃতিবান যাঁরা শহরে বসবাস করছেন, তাঁরা পরিবর্তনের বিভিন্ন স্রোতে ভাসমান। বিভিন্ন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন তাঁদের দাবির প্রকৃতি ও মান। তাঁদের শিল্পীরা তাই দিশেহারা না হলেও চকিতদৃষ্টি। হয়তো কিছুটা হতচকিত। আজকের দুনিয়া থেকে সাধ তাঁরা যত পেয়েছেন, এই অল্প সময়ে সাধ্য তত

www.pathagar.com

পাননি। ফলে, তাঁদের সৃষ্টি শিল্পপিপাসুর মনকে অতৃপ্তির বিরক্তিতে চঞ্চল করে তোলে। যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এ চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। এখন এখানে শিল্পযুগের আরম্ভ। পরিণতি আসার সময় আরও পরে।

কিন্তু আমরা এই নতুন দিনকে গ্রহণ করতে কতটা তৈরী হচ্ছি, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নাট্যান্দোলনে এ প্রস্তুতির লক্ষণ যদি কিছু থাকে, তার প্রমাণ মিলবে নাট্যকর্মীর বিভিন্ন প্রচেষ্টায়। নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় নতুন আঙ্গিক আবিষ্কারের অভিলাষ যদি আমরা এ অবস্থায় আপাতত মুলতবি রাখি, তাহলে সাদামাটা প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়, আমাদের নাট্যকার ও প্রয়োজক কি বিভিন্ন নাট্য-সাহিত্যের ও নাট্য-প্রযোজনার উন্নত আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন? করছেন যে নাটক রচনার ক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিয়েছেন নুরুল মোমেন, সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, ফররুখ আহ্‌মদ, সিকান্‌দার আবু জাফর, সাইদ আহমেদ প্রমুখ নাট্যকারেরা। আর নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে তার প্রমান দিয়েছে ড্রামা সার্কেল, সমকাল ও সাতরঙ প্রভৃতি নাট্যসংস্থা। নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' একটিমাত্র চরিত্রের এক পূর্ণাঙ্গ নাটক। সমস্ত ঘটনাকে নেপথ্যে রেখে চরিত্রটির উপর তার প্রভাব প্রকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি করে নাট্য-রচনার এ কৌশল অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবিদার। সৈয়দ আলী আহসানের 'কোরবাণী' 'জোহরা ও মুশতারী' এবং 'জুলায়খা' বই হিসাবে ছাপা হয়ে বেরোয়নি। কিন্তু আঙ্গিকের পরীক্ষায় তাঁর রচনাত্রয় প্রোজ্জ্বল। জাপানের 'নো প্লে'র আঙ্গিকের অনুসরণ তাঁর রচনায় লক্ষণীয়। জাপানের 'নো প্লে' মূলত একটি বিশেষ মঞ্চ-ব্যবস্থায় সঙ্গীতের আবহের মধ্যে প্রকাশিত একটি কাব্য। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি মৃত আত্মা তার মুক্তির জন্য পৃথিবীতে আসে এবং পৃথিবীতে তার সেই জীবনযাপনের কাহিনী ব্যক্ত করে। অবশ্য নাটকটি শেষ হয় তার বাঞ্ছিত মুক্তিতে। 'আনন্দ-আহত' চিত্তে সে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আলী আহসানের এই রচনাগুলো মঞ্চে অভিনীত হলে এ আঙ্গিকের সাফল্য বোঝা যেত। মুনীর চৌধুরীর 'কবর'ও আঙ্গিকের পরীক্ষায় বিশিষ্ট। যেমন বিশিষ্ট সিকান্‌দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান' ও সাইদ আহমেদের 'কালবেলা'। দীর্ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ফররুখ আহ্‌মদের কাব্যনাটক 'নৌফেল ও হাতেম' এক অভিযাত্রীক প্রচেষ্টা। কাব্য ও ছন্দ নাটকে অচল না হয়ে বরং তাকে সচল ও সজীব করে তুলতে পারে— এ পরীক্ষার প্রমাণ হিসাবে 'নৌফেল ও হাতেম' স্মরণীয়। উল্লিখিত নাটক ছাড়াও ভালো নাটক আমাদের রয়েছে। কিন্তু এসব নাটকের আঙ্গিক ও নতুন প্রচেষ্টা অনায়াসেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর এ কথাও প্রমাণ করে যে বিশ্ব-নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের নাট্যকারদের পরিচয় পরোক্ষ হলেও

www.pathagar.com

অন্তরঙ্গ। উন্নতির পথে অনুসরণ অপরিহার্য। অনুসরণ তখন অন্বেষণেরই নামান্তর। শিল্প–সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য রত্ন অন্বেষণ সম্পূর্ণ কাম্য। বিভিন্ন সাহিত্যের রত্ন খুঁজে এনে তাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে অনুবাদ ও এড্যাপ্টেশন। যুগান্তকারী বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও এড্যাপ্টেশন করে আমাদের নাট্যকারেরা প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাচ্ছেন। নাট্য–সাহিত্যের জনক গ্রীক–নাট্যকারেরা। 'সফোক্লিস'–এর 'ইডিপাস রেক্স' গ্রীক–নাটকের মধ্যমণি। তার অনুবাদ করে সৈয়দ আলী আহসান আমাদের নাট্য–সাহিত্যকে দীপ্তিময় করে তুলেছেন। গল্সওয়ার্দি ও বার্নার্ড শ'কে এদেশে পরিচিতির ব্যাপ্তি দিতে চেষ্টা করেছেন মুনীর চৌধুরী। কবীর চৌধুরী করেছেন ইবসেন ও ক্লিফর্ড ওডেট্সের অনুবাদ। আর্থার মিলার ও বার্নার্ড শ'র নাটকের অনুবাদ করেছেন বজলুল করিম। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের উৎসাহ যথেষ্ট। এমনি করে নিজস্ব রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের নাট্যকারেরা যে উদ্যম ও প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন, তার সামগ্রিক প্রকৃতি এই কথাই প্রমাণ করে যে, সাধনা দিয়ে সাধ্য বাড়ানো যায়। আর তাতে সাধও অপুরণ থাকার কথা নয়। নাট্যান্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত এখনও কিছুটা অন্ধকারে, সন্দেহ নেই। তবু নাট্যকারেরা দীপ জ্বালাচ্ছেন একটি দু'টি করে। অবিশ্যি দীপান্বিতার জন্য এখনও অনেক দীপের প্রয়োজন।

দেখা যাচ্ছে, নাট্য–অভিজ্ঞতার ধারা আমাদের এখন বেশ পুষ্ট হয়ে এসেছে। যথেষ্ট সংখ্যক সাধারণ নাটক আমরা লিখেছি। আদর্শ নাটক রচনার পথেও পা বাড়িয়েছি। বিভিন্ন নাট্য–সাহিত্যের মুক্তা আহরণ করতে আরম্ভ করেছি। বিভিন্ন আঙ্গিক নাট্য–শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করছে। সর্বোপরি নাট্য–সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের ইচ্ছা আমাদের প্রবলতর হয়েছে। বাকি শুধু এইসব উপাদান–আয়োজনকে যথাবিহিত কাজে লাগানো। আজ পর্যন্ত এ কাজে যাঁরা অগ্রসরমান, তাঁদের মধ্যে বাঙলা একাডেমীর কর্মচঞ্চল ও সুযোগ্য পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান ও একাডেমীর কার্য–নির্বাহক সমিতির মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম সর্বাগ্রে আসে। একাডেমীতে তাঁরা একটি ছোট খাটো পরীক্ষামূলক নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর সহযোগিতায় নাটক–প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। শুনতে পাচ্ছি বাঙলা একাডেমীর মত এ কাজে এমনি এগিয়ে আসছেন পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল। সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে গঠিত ড্রামা–সিজন কমিটি গত বছর ঢাকায় চার মাস ব্যাপী যে নাট্যানুষ্ঠানের প্রচলন করেন, তার প্রভাব আমাদের নাট্যান্দোলনে যথেষ্ট। এসব নাট্যানুষ্ঠানে আমাদের নাট্যশিল্পীরা একদিকে যেমন অর্থ–চিন্তামুক্ত হয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার পরীক্ষা করতে পেরেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিদেশাগত নাট্য–শিল্পীর অনুশীলন ও কলাকৌশল

www.pathagar.com

অনুধাবন করতে পেরেছেন। নাট্য-অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছরও এই নাট্য-মওসুম আরম্ভ হয়েছে। তবে এক নতুন রূপে। গ্রীক-নাট্যান্দোলনের স্বর্ণযুগে নাটকের প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত ছিল। নাট্যকারেরা নাটক রচনা করে তার অভিনয়ের আয়োজন করতেন। নাট্যকার নিজেই প্রয়োগকর্তা। জনসাধারণ সে নাট্যাভিনয় উপভোগ করত। বিচারকমন্ডলী নাটকের মান নির্ণয় করতেন। বাঙলা একাডেমী এবারে নাটক চেয়েছেন। প্রথমে আটটি নাটক নির্বাচিত হবে। তারপর অভিনয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম মানের তিনটি নাটক বিচারকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রকাশিত হবে। গ্রীক-নাট্যান্দোলনের সঙ্গে তাই এ প্রচেষ্টার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, নির্বাচিত নাটক তিনটি প্রকাশিতই হবে না শুধু, পুরস্কৃতও হবে। নাট্য-শিল্পের অগ্রগতির পথে এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সহায়তা করবে। জাতীয় নাট্য-মঞ্চের দাবি যুক্তিবহ ও সঙ্গত। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার পথ এখনও নিষ্কন্টক নয়। আর ঢাকায় জাতীয় নাট্য-মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হলেও সারা দেশের নাট্যাভিনয়ের পথ খুব সুগম হওয়ার কথা নয়। গ্রামে-গ্রামে, শহরে-বন্দরে আমাদের দেশে নাট্যানুষ্ঠান হয়। তাতে ভাল নাটক চাই। আর এমন অভিনয় ব্যবস্থা চাই যাতে অল্প আয়াশে, অল্প টাকায় সে নাটকের অভিনয় হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নাটক রচনা, অভিনয়-ব্যবস্থার নব-পন্থা উদ্ভাবনের। জাতীয় নাট্য-মঞ্চ তাতে অবশ্যই প্রধান সহায়ক হবে। কিন্তু বাঙলা একাডেমী, পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পূর্বোক্ত প্রচেষ্টা তার চেয়ে একাজে কম সহায়ক হবে না। বরং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলে একাডেমীর মত প্রতিষ্ঠান সারাদেশে নাট্যান্দোলনের জোয়ার আনতে পারে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও এ কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির ত্যাগ ও স্বপ্ন জড়িয়ে আছে এই বাঙলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠায়। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সস্নেহ প্রচেষ্টায় নাট্য-শিল্পীর ব্রত ও সাধনা সাফল্যমন্ডিত হোক, আজকের দিনে এই-ই আমাদের বড় আশা।

www.pathagar.com

ছায়া-ছায়া পথ

চরিত্র–লিপি

রাহেলা বেগম
সালমা বেগম
ফাতেমা
ফেলুর মা
পৌঢ় ডাক্তার
মাসুদ খান
ম্যানেজার
কেরানী –১
কেরানী –২
মানিক (ছোট)
মানিক (বড়)
সেলিম (ছোট)
সেলিম (বড়)
ও
ফেলু

www.pathagar.com

৭

(বেশ বড় লোকের এলাকার এক বড় লোকের বাড়ী থেকে একটা দামী গাড়ী বেরোয়। বড়লোকদের সুন্দর বাড়ীগুলো ছাড়িয়ে যাচ্ছে গাড়ীটা। গাড়ীটা দেখা যায় না, দেখা যায় দ্রুত পেছনে পড়া বাড়ীগুলোর উপরিভাগ। ক্রমে পেছনে–পড়ার দ্রুততা কমে আসায় বোঝা যায়– গাড়ীর গতি কমে এসেছে। এবার গাড়ীর ড্রাইভারকে স্পষ্টই দেখা যায়, কিন্তু গাড়ীর দু'জন আরোহী ততটা স্পষ্ট নয়। গাড়ীটা মোড় নেয়)

(এবার দেখা যায়– মধ্যবিত্ত এলাকার সাধারণ পাকা বাড়ীগুলোর উপরিভাগ দ্রুত পেছনে পড়ছে! আবার গতি কমে আসে। দেখা যায়– গাড়ীটা আবার মোড় নিচ্ছে)

(ক্রমে বস্তী এলাকা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। অপ্রশস্ত রাস্তায় সাধারণ স্তরের লোকজন চলাফেরা করছে। রাস্তার পাশে পাশে খুপড়ীর পর খুপড়ী। হঠাৎ গাড়ী থেমে যাওয়ার শব্দ, রাস্তার লোকজন থমকে দাঁড়ায়। সংগে সংগে ভেসে আসে লোকজনের হৈ চৈ, কোলাহল)

(বস্তীতে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আজিমুদ্দিন আহমদের 'ডিসপেনসারী'র সামনে দাঁড়ানো মানিক নামের এক তরুণ চমকে ফিরে তাকায়, সংগে সংগে ফিরে তাকায় বুড়ো হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আজিমুদ্দিন আহমদ। ত্রস্তপায় এগিয়ে যায় মানিক। সেদিকে তাকিয়ে আছে ডাক্তার, পেছনে দৃশ্যমান ডাক্তারের 'ডিসপেনসারী'র সাইন বোর্ড)

(গাড়ীটাকে ঘিরে লোকজনের ভীড়, কোলাহল, আজেবাজে মন্তব্য। ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসা মানিকের চোখে পড়ে– প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী রাহেলা বেগম গাড়ীর পেছনের সীটে বসে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে দেখছে। গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার ও মানিকেরই সমবয়সী এক তরুণ– নাম সেলিম– দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘিরে আক্রমণোদ্যত লোকজন। মানিকের চোখেমুখে ফুটে উঠছে স্পষ্ট বিরক্তি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় মানিক)

মানিক : (বিরক্তিমিশ্রিত রাগে) এই সাবধান, কেউ ওদের গায়ে হাত দেবে না, সবাই সরে যাও। ভীড় করো না, যাও বলছি।

www.pathagar.com

(লোকজন সরে যেতে থাকে, কোলাহলও কমে যায়। সেলিমকে বলে মানিক–)

মানিক : এই বিলাসী গাড়ী নিয়ে সেলিম সাহেবের বস্তী এলাকায় আসার সখ কেন? যত বড়লোকই হোন, এ্যাকসিডেন্টটা ঘটে গেলে এতক্ষণে টের পেতেন। (ড্রাইভারকে) এবার যান।

রাহেলা : (গাড়ী থেকেই) মানিক!

(মানিক অন্যদিকে তাকিয়ে রাগত কণ্ঠেই ডাকে–)

মানিক : এই ফেলু!

(গাড়ীটা চলে যায়। রাহেলা বেগম তাকিয়ে দেখে– মানিক তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। ফেলু এগিয়ে আসে)

কোথায় থাকিস? খেয়ালী বড়লোকদের গাড়ী বস্তীর রাস্তায় এসে হ্যাংগামা বাঁধায়, আর তোরা সব আড্ডা মারিস?

ফেলু : আমরা গাড়ী আসা থামাই ক্যামনে? তাছাড়া হঠাৎ কইরাই বাচ্চা ছেলেটা গাড়ীর সামনে দিয়া দৌড় দিল। তয় অল্পের লাইগ্যা বাঁইচা গেছে।

মানিক : ওরা এমনি করেই মরবে একদিন। বাপমায়েরা তো রোজগার নিয়ে ব্যস্ত। এতই যখন রোজগারের প্রয়োজন, তখন আর সন্তানের দরকার ছিল কি।

(মানিকের সংগে সংগে ফেলুও ফিরে চলে ডিসপেনসারীর দিকে)

(সেলিমদের সাজানো ড্রইং রুম। সেলিম ও রাহেলা বেগম কথা বলছে। রাহেলা বেগমের চোখেমুখে অপরাধী ভাব)

সেলিম : আপনারই খেয়ালের জন্য এই ঝামেলা খালাম্মা।

রাহেলা : হ্যাঁ সেলিম, দোষটা আমারই। হঠাৎ ভাবলাম– বস্তীর দিকটা হয়েই যাই। তবু তো রক্ষা, মানিক ছিল ওখানে।

সেলিম : ওখানকার মাস্তানদের নেতা যখন, তখন আর থাকবে না কেন?

রাহেলা : (দ্বিধান্বিত বিস্মিত কণ্ঠে) আমার মানিক ওখানকার ....

সেলিম : আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার পর ওখানেই তো সে আস্তানা গেড়েছে। কেন, আপনি তা জানতেন না?

রাহেলা : ওখানে এক ডাক্তারের কাছে সে যায় জানতাম। কিন্তু ....

www.pathagar.com

সেলিম ঃ কিছুদিন ধরেই আপনাদের মা ও ছেলের মধ্যে চলছে মন কষাকষি, মান-অভিমান। আমি জানি- মানিকের খোঁজেই আপনি ওই বস্তীর দিকটায় গিয়েছিলেন। আর তাতেই মানিক আমাকে কথার চাবুক মারার সুযোগটা পেল।

(বলেই বেরিয়ে যায় সেলিম। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে রাহেলা বেগম)

(ডাক্তারের ডিসপেনসারী। কথা বলছে ডাক্তার ও ফেলু)

ডাক্তার ঃ সেলিম আর মানিকের আম্মা রাহেলা বেগম ছিলেন ওই গাড়ীতে?

(ফেলু নীরবে সায় দেয়)

যাক, আল্লাহ্ খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

(মানিক এসে ফেলুকে কিছু টাকা দেয়। তারপর কিছু না বলেই যেতে গিয়ে থামে। রোগীকে ওষুধ দেয় ডাক্তার)

এই ওষুধ, আগের মতই খাবেন।

প্রথম রোগী ঃ তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাব তো ডাক্তার সায়েব?

(ডাক্তার হাসে)

ডাক্তার ঃ মানিক, শুনলাম তোমার আম্মা ছিলেন ওই গাড়ীতে। হয়তো তোমার খোঁজেই ....

মানিক ঃ (বেশ রাগের সংগে) আমাকে খোঁজার কি আছে? আমি কি গরু-ছাগল যে হারিয়ে গেছি?

(বলেই হন হন করে চলে যায়। ফেলুর মত ডাক্তারও অবাক)

ফেলু ঃ আইজকাইল মানিক ভাই সামান্য কথায়ই ক্ষেইপ্যা যায়। এইডা একটা রোগে দাঁড়াইয়া গেছে।

ডাক্তার ঃ আমিও লক্ষ্য করেছি, মায়ের ব্যাপারে কথা উঠলেই মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। এটাকে এক রকম রোগই বলতে হবে।

ফেলু ঃ আপনে তো রোগের কারণ-টারণ জাইন্যা ওষুধ দেন। মানিক ভাইর এই রোগটা সারাইতে তেমন কোন ওষুধ দিতে পারেন না?

ডাক্তার ঃ রোগটা যে মনের, আমার এই ওষুধে সারানো মুশকিল।

(আরও রোগী আসে)

www.pathagar.com

(সেলিমদের খান এজেন্সির অফিসের বারান্দায় কথা বলছে ম্যানেজার ও সেলিম)

ম্যানেজার : (উত্তেজিত ভাবে) এ যে দেখি সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। বস্তীতে গাড়ী এ্যাকসিডেন্ট, মাস্তানদের এলাকা। যতটুকু জানি, মানিক এখন রীতিমত ইয়ে .... মানে ....

সেলিম : মারাত্মক কিছু ঘটে নি, তবু আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ম্যানেজার সাহেব?

(মুহূর্তে গোবেচারা হয়ে যায় ম্যানেজার)

ম্যানেজার : আপনার সম্ভাব্য বিপদের কল্পনায় ছোট সাহেব। তা নইলে– আমি তো জানি, কি অদ্ভুত রকমের ভাল মানুষ আপনার ওই খালাম্মা। এতদিন .... মানে প্রায় এক যুগ ধরে আপনাকে নিজের ছেলের মত করেই সেবাযত্ন করে আসছেন। আর মানিক তো নিজেরই ছেলে। দুই ছেলে এক মা .... যাকে বলে রীতিমত সিনেমা ....

সেলিম : এত প্যাঁচানো কথা শোনার জন্য আপনার সংগে কথা বলতে আসি নি। আমি স্ট্রেট্ টক্ পছন্দ করি।

(গোবেচারা ভাবে নীরবে সায় দেয় ম্যানেজার)

আমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছি– কি বলেন?

ম্যানেজার : হয়েছেন। মিস্টার মাসুদ খানের একমাত্র উপযুক্ত সন্তান, আমাদের ছোট সাহেব।

সেলিম : এদেশে ড্যাডির দু'টো এশ্‌টাবলিশ্‌মেন্টের একটি খান এজেন্সি চালান আপনি।

ম্যানেজার : জ্বি, ব্যবসাপাতি ম্যানেজ করি, ম্যানেজার।

সেলিম : এখানে ড্যাডির পরিবার বলতে তো আমি!

ম্যানেজার : জ্বি, ড্যাডি বিদেশে– আপনাকে মানে আপনার পরিবারকে ম্যানেজ করেন খালাম্মা।

সেলিম : আইনত পর হলেও বাস্তবে আমার একান্ত আপন ওই খালাম্মা।

ম্যানেজার : আপনাদের মধ্যে সুগভীর এক মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান।

সেলিম : কিছুদিন আগে আপনি খালাম্মার খরচাদি সম্পর্কে আকারে– ইংগিতে কি সব যেন বলছিলেন?

www.pathagar.com

ম্যানেজার : জ্বি, স্ট্রেট্ বলা সম্ভব নয় বলেই বোধ হয় আকারে-ইংগিতে বলছিলাম যে আমাদের শ্রদ্ধেয়া খালাম্মা আপনার জন্য যখন যা চান, আপনার ড্যাডির নির্দেশ অনুসারে আমি তা কালবিলম্ব না করে দিতে বাধ্য।

সেলিম : এতদিন ধরে যা তিনি নিয়েছেন, তার একটা পিক্চার আমি পেতে চাই।

ম্যানেজার : কিছুক্ষণের মধ্যেই দিয়ে দেব।

(ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারী। কথা বলছে ডাক্তার ও ফেলু)

ডাক্তার : ফেলু, তোর মায়ের মুখে অনেক কথাই শুনেছি। মানিকের ছোট বেলার কথা, রাহেলা বেগমের অসহায় অবস্থার কথা। হঠাৎ করেই মানিকের সামান্য কেরানী বাপ মারা গেল। রাহেলা বেগমের আশ্রয় বলতে রইল একই বাসার সাথী-ভাড়াটে আর এক কেরানী রহমান সাহেবের সংসার।

ফেলু : আমার মায় তখন ছোটা ঝিয়ের কাজ করত ওই রহমান সায়বের বাসায়।

ডাক্তার : রাহেলা বেগমের এমন কোন আপন জন এই শহরে ছিল না যার কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করা যেত। কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল হাতের টাকাপয়সা। সামনে অন্ধকার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেল একটা চাকরী।

(শেষ কথাগুলোর সময় টিনের ঘরের একটা কোঠায় দেখা যায়— বালক মানিককে পাশে নিয়ে রাহেলা বেগম চিন্তাক্লিষ্টভাবে তাকিয়ে আছে স্বামীর ফটোটার দিকে)

(প্রায় বার বছর আগেকার কথা। মধ্যবয়সী ফেলুর মা কথা বলছে আরও কম বয়সের ডাক্তারের সংগে, এই ডিসেপনসারীতেই)

ফেলুর মা : এমুন চাকরীই পাইলো মানিকের মায় যে টেকাপয়সার চিন্তা দূর অইলেও আর একটা চিন্তা তারে ঘিইরা ধরছে।

ডাক্তার : কি চিন্তা ফেলুর মা?

ফেলুর মা : চাকরীডা অইলো এক বড়লোকের বাসায়। বড়লোকের একমাত্র ছাওয়াল মা-মরা সেলিমের দেখাশুনা করা,

www.pathagar.com

রাইতদিন চব্বিশ ঘন্টা, তারে ছাইড়া নিজের ছাওয়ালের কাছে অবসর সময়ে আইলেও তার কাছে থাকতে পারবো না। এই নাকি চাকরীর শর্ত। অখন ক'ন .... মায়েরে ছাড়া মানিকই থাকে ক্যামনে, আর মানিকরে ছাইড়া মায়েই বা থাকে ক্যামনে?

ডাক্তার : ওই বড়লোকের নাম মাসুদ খান– খান এজেন্সির মালিক। ওই অফিসের দুই কেরানীই আমার কাছ থেকে ওষুধপত্র নেয়। তাদের কাছে শুনেছি– মানিকের আম্মা মাসুদ খানের ছেলের দেখাশুনার দায়িত্ব পেয়েছে।

ফেলুর মা : কিন্তু মানিকের মায়ের চিন্তা তো থাইক্যাই গেল।

ডাক্তার : হুঁম্, এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সৃষ্ট হল আর এক সমস্যা।

(খান এজেন্সির অফিস। ম্যানেজার ও দুই কেরানী কথা বলছে। সেই প্রায় এক যুগ আগে)

ম্যানেজার : সমস্যার শেষ হয়েও শেষ হল না হে।

(দুই কেরানীই অবাক হয়ে মুখ তোলে। ম্যানেজার প্রথম কেরানীকে বলে–)

বুঝতে পারলে না?

(প্রথম কেরানী নীরবে মাথা নাড়ে। ম্যানেজার দ্বিতীয় কেরানীকে বলে–)

বুঝতে পারলে না?

(দ্বিতীয় কেরানীও নীরবে মাথা নাড়ে)

বুঝবার মত ব্রেন থাকলে তো খান এজেন্সির এই ম্যানেজারের কোন অসুবিধাই হত না।

(ঝাঁঝালো কণ্ঠে) বলছি আমাদের মালিক মাসুদ খান সাহেবের ওই মা-মরা ছেলে সেলিমের দেখাশুনা করার জন্য মহিলা নিয়োগের কথা।

(কেরানী দু'জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে)

কেরানী–১ : বুঝতে পেরেছি। আবার সমস্যার কথা বলুন স্যার।

কেরানী–২ : ওই শেষ হয়েও শেষ হল না থেকে বলুন স্যার।

www.pathagar.com

ম্যানেজার : সমস্যা ছিল ওই সেলিমের জন্য গভর্নেস জাতীয় কাউকে নিয়োগ করা নিয়ে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল।

কেরানী-১ : জ্বি। শর্ত ছিল --- মহিলাকে হতে হবে বিধবা ও নিঃসন্তান।

কেরানী-২ : বিধবা হওয়াটা কোন সমস্যাই ছিল না। সমস্যা ছিল এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণের দিনে নিঃসন্তান হওয়াটা নিয়ে।

ম্যানেজার : যে খান এজেন্সির এই সাধারণ ছোট অফিসটা দেখে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে তার মালিকের আয়-উপার্জন কত, তাঁর মাতৃহারা ছেলের গার্জিয়ান হবে একটু কম বয়সী আধুনিক মানে স্মার্ট এক মহিলা- বিজ্ঞাপনে উল্লেখ না থাকলেও বুঝে নেওয়া ছিল সহজ।

কেরানী-১ : জ্বি স্যার। বুঝে নিয়েই তো সাতাইশ জন মহিলা ইন্টারভিউ দিল।

কেরানী-২ : নিয়োগ পেল না একজনও।

ম্যানেজার : বিদেশী স্বভাবের খান সাহেব বিরক্ত হলেন। পরের দিন প্রাইভেটলি দেখা করে নিয়োগ পেয়ে গেলেন রাহেলা বেগম। শর্ত ভেঙে। কম বয়সী বিধবা, কিন্তু নিঃসন্তান নন। একমাত্র সন্তান মানিক হল নতুন সমস্যা।

কেরানী-১ : সাংঘাতিক সমস্যা।

কেরানী-২ : আচ্ছা স্যার, রাহেলা বেগম যে পোষ্টে জয়েন করলেন, তার ডেজিগনেশনটা কি?

ম্যানেজার : খালাম্মা।

উভয় কেরানী : খালাম্মা?

ম্যানেজার : খান সাহেবের নির্দেশ- রাহেলা বেগম সেলিমের খালাম্মা।

(বাইরে গাড়ী এসে থামার শব্দ। তিনজনই কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। জুতার শব্দে বোঝা যায়- মাসুদ খান এগিয়ে আসছেন)

আসছেন! বাইরে থেকে এসে এদিকে!

(তিনজনই কাজে মন দেয়। মাসুদ খান আসেন। সবাই উঠে দাঁড়ায়)

মাসুদ খান : ম্যানেজার সাহেব, একটু পরেই আমার ফ্লাইট। সেলিমের নতুন খালাম্মাকে যা যা বলার, বলে দিয়েছি।

(হাতে একটা খাম দেখিয়ে-)

www.pathagar.com

তার প্রতি আপনাদের করণীয় কাজের একটা তালিকা এতে রয়েছে। বলতে পারেন- এ আমার নির্দেশ-নামা। রাহেলা বেগমের কাছে এর একটা কপিও রয়েছে। আমার প্রতিটি নির্দেশ যথারীতি পালিত হবে, এই-ই আমি চাই। আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে- রাহেলা বেগম তার দায়িত্ব কতটুকু কি ভাবে পালন করছেন, তার বোঝাপড়া করব আমি, অন্য কেউনা।

(হাতের খামটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে চলে যান। তিন জনই যার যার আসনে এক সঙ্গে বসে পড়ে)

(রহমান সাহেবের বাসায় একটা টিনের ঘরের কোঠায় ছোট মানিক ও রাহেলা বেগম কথা বলছে। অদূরে দাঁড়িয়ে ফেলুর মা তা-ই শুনছে)

মানিক ঃ তুমি কোথায় ছিলে আম্মা? বাসায় একা থাকতে আমার খারাপ লেগেছে।

রাহেলা ঃ ছিলাম .... ইয়ে .... মানে আমি তো এখন এক জায়গায় চাকরী করছি মানিক। সেখানে আমাকে থাকতে হয়।

(ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে)

মানিক ঃ আব্বার মত চাকরী করছ তুমি? ওই চাকরীটাই?

রাহেলা ঃ না বাবা, আর একটা চাকরী। চাকরীর টাকায় আমাদের কোন কিছুর অভাব থাকবে না। মন দিয়ে পড়াশুনা করবে তুমি, অনেক বড় হবে। তখন আমরা একসঙ্গে থাকব।

মানিক ঃ এখন থাকবে না?

রাহেলা ঃ (নিজেকে কোন রকমে সংযত করে) কিছুদিন আমাকে ওখানে থাকতে হবে তো।

(মানিক মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে)

(রাতে একা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে মানিক। ঘুমের ঘোরেই পাশের খালি জায়গাতে হাতড়ে যেন কাকে ধরতে চায়। ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে দেখে- পাশে মায়ের জায়গাটা শূন্য)

www.pathagar.com

(রাতে দামী বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে রাহেলা বেগম। ঘুমের ঘোরে অভ্যাসমত পাশে হাত রেখে কাকে যেন স্পর্শ করতে চায়। ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে দেখে- পাশে মানিক নেই। অদূরে ঘুমিয়ে আছে সেলিম। সেলিমের শিয়রের দিকে দেয়ালে সেলিমের আম্মা সালমা বেগমের ফটো। বিছানা থেকে উঠে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ে রাহেলা বেগম)

(দিনের বেলা। রহমান সাহেবের বাসায় টিনের ঘরের কোঠায় রাহেলা বেগম ব্যগ্রভাবে এসে বিছানার ওপর হতাশভাবে বসে পড়ে। পেছনে পেছনে ফেলুর মা)

রাহেলা ঃ সব জায়গায় খুঁজলাম ফেলুর মা, কিন্তু মানিককে কোথাও পেলাম না।

ফেলুর মা ঃ কোন্ খানে গিয়া পুলাপাইনের লগে খেলতাছে বোধ অয়।

রাহেলা ঃ আমি ওর নতুন জামা কাপড় রহমান সায়বের বিবির কাছে রেখে এসেছি। ফেলুর মা, তুমি ভাই মানিককে একটু দেখে শুনে রেখো। তোমাকে মাসে মাসে আমি কিছু টাকা ধরে দেব।

ফেলুর মা ঃ এর লাইগ্যা টেকা দেওন লাগব ক্যান্? আমি তারে এমনিই দেইখ্যা শুইন্যা রাখবনে।

রাহেলা ঃ আমাকে এখ্খুনি ফিরে যেতে হবে। মানিক বাসায় এলে বলো- আমি তাকে দেখতে এসেছিলাম!

(কথা বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে)

(মানিক বাইরে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখে- রাহেলা বেগম রিকশায় উঠেও এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। তারপর রিকশা চলে যায়। মানিকের অভিমান ভরা মুখ আরও অন্ধকার হয়ে যায়। কি করবে ভেবে না পেয়ে একটা ঢিল কুড়িয়ে আনমনে সেটাই কোনদিকে ছুঁড়ে মারে)

(মাসুদ খানের বাসার সামনে রাহেলার রিকশা এসে থামে। রিকশা থেকে নামে রাহেলা বেগম। তখনই সেলিমদের গাড়ী এসে থামে। ড্রাইবার গাড়ীর দরজা খুলে দেয়, নামে সেলিম।

www.pathagar.com

রাহেলা বেগম সেলিমকে আদর করে নিয়ে যায় বাসায়। ড্রাইভার সেলিমের বইয়ের ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে বাসায় দিকে পা বাড়ায়)

(মানিক টিনের কোঠায় ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়ে বিছানার বালিশে মুখ লুকায়। ফেলুর মা কোঠায় ঢুকে মানিকের মাথায় হাত বুলায়)

ফেলুর মা : কান্দে না মানিক, ওঠ। চল, তোমার হাতমুখ ধোওয়াইয়া দেই, নাস্তা খাইবা।

(রাহেলা বেগম জানালা দিয়ে উদাস ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে। তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। গলা খাকারী দিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ায় ম্যানেজার। রাহেলা বেগম চোখ মুছে দরজার কাছে আসে)

রাহেলা : কিছু বলছেন আমাকে?

ম্যানেজার : আপনার এ মাসের মাইনেটা নিয়ে এসেছি মা।

(টাকার বান্ডেলটা দেয়)

গুণে নিন মা।

রাহেলা : ঠিক আছে, গুণতে হবে না। ইয়ে .... বলছিলাম কি, সেলিমের সেবাযত্নে কোন ত্রুটি হচ্ছে কি না– জানতে ইচ্ছে করে।

ম্যানেজার : এ কথা বলবেন না মা। আমাদের মহাভাগ্য– আপনার মত একজনকে পেয়েছি সেলিমের জন্য। খান সাহেব এক আজব মানুষ। এখানকার সংসারে তাঁর মন নেই। বিদেশ-বিভূঁয়েই ঘুরে বেড়ান। ছেলেকেও বিদেশে নিয়ে যান না কেন, জানি না। তবে খান সাহেব হয় তো প্রমাণই করে ছাড়লেন যে টাকা দিয়ে সব কিছুই পাওয়া যায়। বিজনেসের ব্যাপারে পেয়েছেন আমাকে, আর সেলিমের জন্য আপনাকে। আচ্ছা, আসি মা।

(ম্যানেজার যাবার জন্য পা বাড়িয়েও চোখের কিনারা দিয়ে দেখে– রাহেলা বেগম টাকার বান্ডেলটার দিকে তাকিয়ে আছে)

www.pathagar.com

(টিনের ঘরের কোঠায় মানিক রাগে অভিমানে বালিশ-বিছানা তছনছ করছে। অদূরে দাঁড়িয়ে ফেলুর মা অবাক)

(রাহেলা বেগম চিঠি লিখছে। খামের ওপরে লেখা হয়েছে —মিঃ মাসুদ খান ...)

(ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে কথা বলছিল ডাক্তার ও ফেলু। এখন বাকী কথা শেষ করে)

ডাক্তার : তোর মা বলেছিল- রাতেও মানিককে ছেড়ে থাকতে হয় বলে ওই চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ার কথা মাসুদ খানকে লিখে জানিয়েছিল রাহেলা বেগম।

ফেলু : এই কথা আগেও আমি শুনছি মায়ের মুখে।

ডাক্তার : তাতে মানিককেও খান ম্যানসনে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন মাসুদ খান। রাহেলা বেগম থেকেই গেল সেলিমের কাছে।

ফেলু : হ্যাঁ, থাইক্যাই গেল।

ডাক্তার : এমনিভাবে ভালোয় ভালোয় কেটে গেল বেশ ক'টি বছর। কিন্তু ভালোর আবরণে সর্বনাশা মন্দও যে জন্ম নিতে পারে, তা হয়তো মানিক মানিকের মা কেউই বুঝতে পারে নি। হঠাৎ একদিন সেই মন্দটাই বড় হয়ে দেখা দিল।

ফেলু : সেই মন্দডা কি ডাক্তার সায়েব?

ডাক্তার : ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারি নি- সেদিনও না, আজকেও না। শুধু জানি- এই কিছুদিন আগে সেলিমদের বাসা ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, একরাশ রাগ আর ক্ষোভ নিয়ে মানিক এসে হাজির হল আমার এখানে।

(ফ্ল্যাশ ব্যাক। সন্ধ্যার পর ডাক্তার ডিসপেনসারীতে বসে আছে। হঠাৎ করেই একটি ব্যাগ ও কিছু বইপত্র নিয়ে বড় মানিক এসে উপস্থিত হয় সেখানে)

ডাক্তার : এ কি মানিক। ব্যাগ আর বইপত্র নিয়ে হঠাৎ তুমি এখানে?

মানিক : হ্যাঁ, হঠাৎ করেই চলে এলাম।

ডাক্তার : (উঠে কাছে গিয়ে) কি হয়েছে রে মানিক?

www.pathagar.com

মানিক ঃ না ডাক্তার দাদু, কিছু হয় নি তো! এত বড়লোকের বাসায় আমার থাকতে ভাল লাগছে না, এসে পড়লাম। এখানেই একটা থাকার মত জায়গা ঠিক করে নেব।

ডাক্তার ঃ তোর আম্মা?

মানিক ঃ তিনি তো ওখানেই আছেন!

(বলে ভেতরের দরজা দিয়ে চলে যায়। ডাক্তার কিছুই তেমন বুঝতে পারছে না)

(সেলিমদের ড্রইংরুম। সেখানে সেলিম কথা বলছে রাহেলা বেগমের সঙ্গে)

সেলিম ঃ মানিক আমাদের ম্যানসন থেকে নাকি চলে গেছে খালাম্মা?

রাহেলা ঃ (দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে) তাই তো মনে হচ্ছে।

সেলিম ঃ কোথায় কার কাছে গেল?

রাহেলা ঃ জানি না।

(এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে রাহেলা বেগম ড্রইংরুমে যে কোন একটি কাজে মন দেয়। সেলিম নীরবে রাহেলা বেগমের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে। তার মুখে কিছুটা অবজ্ঞার ভাব)

(খান এজেন্সির অফিস। ম্যানেজার ও দুই কেরানী সেখানে কাজ করছে। দুই জন কেরানীই এক সঙ্গে আসন থেকে উঠে ম্যানেজারের দুই দিকে এসে দাঁড়ায়)

কেরানী–১ ঃ স্যার!

(ম্যানেজার মুখ তুলে নীরবে তাকায়)

অভিনন্দন স্যার।

(ম্যানেজার কোন উত্তর দেয় না, ভেসে আসে দ্বিতীয় কেরানীর কণ্ঠ–)

কেরানী–২ ঃ মনে হল স্যার–

(ম্যানেজার দ্বিতীয় কেরানীর দিকে তাকায়–)

আপনার এতদিনের চিকিৎসা কার্যকর হয়েছে।

কেরানী–১ ঃ ওই খালাম্মা আর দুই সন্তানের চিকিৎসা স্যার!

কেরানী–২ ঃ মানিক খান ম্যানসন ছেড়ে চলে গেছে।

www.pathagar.com

কেরানী-১ : হয়তো এই প্রবল সন্দেহে যে খান সাহেবের সঙ্গে রাহেলা বেগমের কি একটা সম্পর্ক আছে, প্রকাশ্যে যা কেউ জানে না।

কেরানী-২ : আর মা-মরা সেলিমের মনেও বোধ হয় প্রবল সন্দেহ যে খালাম্মার পরিচয়ে এক মায়ের বদলে সে অন্য মা পেয়েছে।

ম্যানেজার : এসব বাজে কথা, রুচিহীন সন্দেহের কথা, আমার সামনে আর উচ্চারণ করবে না। সাবধান করে দিলাম।

কেরানী-১ : না স্যার, আর উচ্চারণ করার তো প্রয়োজন আর নেই!

কেরানী-২ : আমাদের সাহায্যে প্রয়োজন তো আগেই সেরে নিয়েছেন স্যার!

ম্যানেজার : কেমন করে যে তোমরা কথা বল .... হেঃ হেঃ হেঃ ....

(ম্যানেজারের বিশ্রী হাসিতে কেরানীরাও যোগ দেয়)

(সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে বেশ উত্তেজিতভাবেই কথা বলছে রাহেলা বেগম ও মানিক)

রাহেলা : আমার ওপর কেন যে তোর রাগ তা বুঝতে পারছি না। তুই আমার ওপর খুশী নস তা অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছিলাম। সেদিন তো আমাকে ছেড়ে চলেই গেলি। কোথায় থাকিস, কি করিস- কিছুই আমি জানি না। এই-ই যদি করবি, তাহলে কার জন্য আমি খেটে মরছি পরের বাড়ীতে?

মানিক : আমার জন্য যে খেটে মরার দরকার নেই - তা তো অনেকদিন থেকেই বুঝতে পারছিলে! তবু যে কেন খাটছ- তার কারণ তুমিই জান। সেলিমদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বেশ পাকাপোক্ত বলেই তো মনে হয়!

রাহেলা : (বিস্মিত কণ্ঠে) বেশ পাকাপোক্ত সম্পর্ক!

মানিক : সেলিম তোমাকে মায়ের মতই দেখে। তোমাকে না হলে তার চলে না।

রাহেলা : আর তোর? তোর চলে রে মানিক?

মানিক : চলে যাচ্ছে তো!

রাহেলা : কিন্তু তোকে ছাড়া আমার চলে কি করে?

মানিক : যেমন করে চালাচ্ছ।

(বলেই যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় মানিক)

রাহেলা : (আর্তকণ্ঠে) মানিক!

www.pathagar.com

(কোন উত্তর না দিয়েই মানিক চলে যায়)

(সেলিমদের ড্রইংরুম। সেলিম তার পরলোকগত আম্মা সালমা বেগমের ফটোর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে মায়ের ছবি। নিজের কানে ভেসে আসছে নিজেরই কণ্ঠ-)

সেলিম : (নেপথ্য কণ্ঠে) আমি শুনেছি ... এ পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ড্যাডির সংগে তোমার দৃষ্টিভংগির পার্থক্য ছিল অনেক। ড্যাডির জীবনধারাকে তুমি কখনও সমর্থন করতে পার নি আম্মা!

(সেলিমের চোখে অতীতের ছবি ভেসে ওঠে। এই ড্রইংরুমেই কথা বলছে মাসুদ খান ও সালমা বেগম)

সালমা : ইচ্ছে করে আমরা দরিদ্র জীবন যাপন করব- আমি তা চাই না।

মাসুদ খান : তাহলে কি তুমি চাও সালমা?

সালমা : চাই সংসারের সচ্ছলতা, কিন্তু ন্যায়-নীতির বদলে প্রাচুর্যের ঢল নয়। তুমি চাইছ বিবেককে বিসর্জন দিয়ে আমরা যেন প্রাচুর্যে অবগাহন করে ঝলমলে একটা কৃত্রিম জীবন যাপন করি। কিন্তু আমি আর তোমার কাজের ধারাকে সমর্থন করতে রাজী নই।

মাসুদ খান : (নিজেকে কষ্টে সংযত করে নিয়ে) তুমি নীতিবান স্কুল-শিক্ষকের কন্যা। ন্যায়-নীতির বড় বড় কথা তোমার ধাতস্থ হয়ে আছে। কিন্তু জীবনের অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বাস্তবতার অভিজ্ঞতায় নিজেকে আমি তৈরী করেছি। আমার কাজের ধারাকে সমর্থন করতে না পার যদি, ওয়েল- তার জন্য দুঃখ বোধ করব, কিন্তু নিজের কাজের ধারায় আমি অবিচল থাকব। (হঠাৎ যেন আবেগাপ্লুত হয়ে) সালমা, তাতে আমাকে অবিচল থাকতে হবেই! ফেরার পথ আমার জন্য আর খোলা নেই!

সালমা : (কথাটার ইংগিত বুঝে নিয়ে) আমাদের সেলিমের ভবিষ্যৎ কোন্ পথে রচিত হবে?

www.pathagar.com

মাসুদ খান ঃ সেলিম যখন আমাদের কোলে আসে, তখন আমরা ছিলাম স্বপ্নচারী। কিন্তু আজ — থাক। আমি আজ যে পথের পথিক তাতে একা চলতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু তোমার হবে। তাই সেলিম তোমার আদর্শে বড় হয়ে তোমার পাশেই থাকবে — তার ব্যবস্থাই আমি করব।

(চলে যায় মাসুদ খান। হতবাক দাঁড়িয়ে থাকে সালমা বেগম)

সেলিম ঃ (নেপথ্য কণ্ঠে) আম্মা, তুমি তোমার জীবন–বোধকে আকড়ে থেকে শিশু সেলিমকে নিয়ে রয়ে গেলে এখানে, আর- ড্যাডি ছিটকে পড়লেন বিদেশ–বিভূঁয়ে। তারপর এক সময়ে ....
তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আম্মা। ড্যাডি তোমার সেলিমের দায়িত্ব দিলেন রাহেলা বেগমকে। দায়িত্বের সংগে তিনি পেলেন অনেক অধিকার। কিন্তু আমার মনে দিনের পর দিন জন্ম নিয়েছে এক প্রশ্ন ঃ এত অবাধ অধিকার কেন!

(খান এজেন্সির আলো–আঁধারি কোঠায় ম্যানেজার সঙ্গোপনে বলছে দুই কেরানীকে–)

ম্যানেজার ঃ কোন কমবয়সী মহিলা কোন ধনশালী পুরুষের কাছ থেকে অবাধ অধিকার কেন পায়– তা টের পাও না?

(চাপা হাসি। একটু আগে থেকেই অফিসের বাইরে থেকে মানিক দাঁড়িয়ে গিয়ে শুনতে পায় কথাগুলো)

(সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটা গাছের নীচে বসে মানিক হাতে আঁকা কয়েকটা ছবি দেখছে। শেষের ছবিটা রাহেলা বেগমের (অথবা সন্তান কোলে অন্য কোন মায়ের)। ওই ছবিটা দেখছে মানিক আর তীব্র বিতৃষ্ণায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে, আবার দেখছে। শেষে ঘৃণাভরে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছে– তখনই পেছন থেকে ডেকে ওঠে ডাক্তার। ছবিটা উলটে রেখে পাশে তাকিয়ে দেখে ডাক্তার এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। কষ্ট করে মানিক তার চোখমুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তন করছে)

ডাক্তার ঃ মানিক, আমি সেই কখন থেকে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শেষে ভাবলাম, তুই হয়তো এসব জায়গায় থাকতে পারিস।

মানিক ঃ (ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে) এত খোঁজাখুঁজি কেন?

www.pathagar.com

ডাক্তার : হঠাৎই মনে হল- দিনরাত ওই ভাঙা ডিসপেনসারীতে কাটানোর কোন মানেই হয় না।

মানিক : তাই প্রকৃতির শোভা উপভোগ করার খায়েশ জাগল? তার জন্য একা বেরিয়ে পড়লেই হত।

ডাক্তার : প্রকৃতির সাধ্য কি- এই বুড়ো মনটাকে আবার জাগিয়ে তোলে? এসব ব্যাপারে অন্তত একটা তাজা প্রাণের সংগ চাই।

মানিক : বুড়োর মনে কোন স্মৃতি-টিতি জাগছে না কি? হারিয়ে যাওয়া কোন দিনের আকর্ষণ?

ডাক্তার : নাম ধরে ডাকার আগে লক্ষ্য করলাম- কার একটা ছবি ছিঁড়তে যাচ্ছিলে? বোধ হয় কোন মায়ের ছবি? (হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে) কেন?

(ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মানিকের চোখে। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত ও আড়াল করে মানিক)

মানিক : আমার প্রশ্নের উত্তর চাই ডাক্তার দাদু।

(ডাক্তার আপন মনে হাসে)

ডাক্তার : উত্তর? হ্যাঁ, দেবার মত উত্তর যে নেই- তা নয়। এই বুড়োও তো এক সময় তরুণ ছিল! তারুণ্যের সেই দিনগুলো একেবারেই যে নীরস ছিল, তাও নয়। .... মেয়েটির নাম ছিল ফাতেমা। কিন্তু জান কি দাদু, ফাতেমার কাছে কত কথা বলতে চেষ্টা করেও কিছুই বলতে পারি নাই।

(উদ্যানে হাঁটছে ডাক্তার ও মানিক। মানিক হো হো করে হেসে দাঁড়ায়)

মানিক : এই বুঝি ডাক্তারের প্রেম? সব কথাই মনে মনে? আজিমুদ্দিন সাহেবের মনের কথা স্পষ্ট করে জানল না ফাতেমা বেগম, আর ফাতেমা বেগমের মনের কথাও জানল না আজিমুদ্দিন সাহেব।

ডাক্তার : এই যে জানতে চেয়েও না-জানা, পেতে গিয়েও না-পাওয়া, তার স্মৃতি বড় মধুর হে দাদু!

মানিক : ডাক্তারের লেট্ ম্যারেজ কি ওই মধুর স্মৃতিরই পরিণামে?

ডাক্তার : অনেকটা সেরকমই। তবে ফাতেমার সাথে দেখা আরও হয়েছিল। তখন তার অবস্থা বড়ই করুণ।

www.pathagar.com

(ফ্ল্যাশ ব্যাক। গাঁয়ের এক কুটির। কুটিরের বারান্দায় জলচৌকীতে বসে প্রায়-পৌঢ় ডাক্তার। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে বিধবা ফাতেমা)

ডাক্তার : তোমার সব কথাই শুনলাম রে ফাতেমা। একমাত্র বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে তুমি আজ বিধবা। স্বামীর ক্ষেতিজমিও এমন কিছু নেই যে তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারবে। বাপের বাড়ীতে গিয়ে ভাইদের সংসারে থাকাও সম্ভব নয় বললে। এমনি অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে নতুন একটা সংসারে গিয়ে উঠলে ক্ষতি কি?

ফাতেমা : আমার রহমত আলী বড় হইয়া যদি জিগায় – তার বাপের পরিচয় থাইকা তারে আমি বঞ্চিত করলাম ক্যান্, যদি জিগায়– সংসারে তার একমাত্র আপন সেই মায়ের মুখ আমি নতুন ঘোমটায় ঢাইক্যা দিলাম ক্যান্– তখন আমি কি জবাব দিব ডাক্তার ভাই?

ডাক্তার : উপায়ান্তর না দেখে অনেকেই এমনটি করতে বাধ্য হয়– দেবার মত এই উত্তরটাও তো আছে ফাতেমা!

ফাতেমা : (ম্লান হেসে) আল্লার কাছে দোয়া কইরেন ভাই– এই একলা ভিটায় থাইক্যাই যেন রহমত আলীরে আমি মানুষ কইরা তুলতে পারি। আমার মনে সেই জোর আছে।

(ডাক্তার ফাতেমাকে দেখে। তার চোখে ভেসে ওঠে একের পর এক দৃশ্যঃ (১) ধান ভানছে ফাতেমা। .... (২) চাল ঝাড়ছে কুলা দিয়ে। .... (৩) চালের বস্তা কামলার মাথায় উঠিয়ে দিচ্ছে অন্য কামলা। কাছে দাঁড়িয়ে তা-ই দেখছে ফাতেমা। ....(৪) কামলার হাত থেকে টাকা পেয়ে তা গুণে দেখছে ফাতেমা)

(উদ্যানের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় মানিক ও ডাক্তার)

মানিক : (বেশ গম্ভীর কণ্ঠে) সেই ফাতেমা বেগমের বর্তমান ঠিকানা কি দাদু?

ডাক্তার : আছে, দেওয়া যাবে। কিন্তু কেন? হঠাৎ ফাতেমার জীবন-কথা জানার এত আগ্রহ কেন?

মানিক : সব কেন'র উত্তর কি সহজে দেওয়া যায় ডাক্তার?

www.pathagar.com

ডাক্তার ঃ যায় না। তেমনি সব প্রশ্নের মীমাংসাও সহজে করা যায় না!

(অর্থপূর্ণভাবে কথাটা বলে ডাক্তার পা বাড়ায়। কথাটার ইংগিত বুঝতে চেষ্টা করে মানিক)

(সেলিমদের ড্রইংরুমে কথা বলছে সেলিম ও রাহেলা বেগম)

সেলিম ঃ একটা বিষয় আমাকে খুবই ভাবিয়ে তুলছে।

(রাহেলা বেগম সেলিমের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়)

কিন্তু তা বলতে আমার সঙ্কোচ লাগছে।

রাহেলা ঃ যা বলতে চাও, নিঃসঙ্কোচে বলতে পার সেলিম।

সেলিম ঃ ম্যানেজার সাহেব বলছিলেন আমাদের পারিবারিক খরচাপাতির কথা। তার ধারণা– খরচাপাতি কিছুটা বেহিসাবী রকমেরই হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে নাকি ম্যানেজারের কোন হাত বা নিয়ন্ত্রণই নেই!

রাহেলা ঃ তোমার ড্যাডির একটা নির্দেশ–নামা ম্যানেজার সাহেবের কাছেও আছে, আমার কাছেও আছে। সেটা পড়লেই বুঝতে পারবে– এতসব বছর ধরে ইচ্ছেমত খরচ করার অধিকার আমার ছিল এবং আছে, যদিও সে–অধিকার শুধুমাত্র তোমার প্রয়োজনেই কাজে লাগিয়েছি, আমার বা মানিকের প্রয়োজনে নয়। মানিকের জন্য বাড়তি যা খরচ হয়েছে– সেটা আমার মাইনে থেকে।

সেলিম ঃ ড্যাডির নির্দেশ–নামার এই যে ইচ্ছেমত খরচের অবাধ অধিকার– সেটা ....

রাহেলা ঃ (কণ্ঠে আদেশের জোর এনে) সেলিম, তোমার এই খালাম্মার প্রতি এমন অকারণ কোন ইংগিত করো না যার ওপর রুচির কোন আবরণ নেই। এর মধ্যেই তোমার ড্যাডিকে আমি আসতে অনুরোধ করেছি; কারণ, এখানে আমার থাকার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না। তাঁর আসবার আগে কোন নোংরা কথা যেন আমাকে না শুনতে হয়।

(চলে যায় রাহেলা বেগম। নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে সেলিম। তারপর একটা পেপারওয়েট হাতে নিয়ে তা সজোরে চেপে ধরে টেবিলে)

www.pathagar.com

(খান এজেন্সির অফিস। গভীর রাতে সেখানে ম্যানেজার একা। দেয়ালে টাঙানো মাসুদ খানের বিভিন্ন ভংগিমায় ছবির কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ম্যানেজার, আপন মনে কথা বলছে ও কল্পনায় শুনছে মাসুদ খানের কথা। কথা বলার সময় মাসুদ খানের ছবির স্থানে দেখা যাবে মাসুদ খানের কথা-বলা মুখ)

ম্যানেজার : (একটা ছবির পাশে দাঁড়িয়ে) জানি, আপনি ফিরে এসে আমাকে চার্জ করবেন নানা বিষয়ে। প্রথমেই জিজ্ঞেস করবেন- নির্দেশ-নামার বাইরে গিয়ে আমি রাহেলা বেগম সর্ম্পকে কলঙ্ক রটিয়েছি কেন?

(ছবিতে মাসুদ খানের পরিহাস ভরা মুখ থেকে কথা আসে-)

মাসুদ খান : আকারে-ইংগিতে তুমি সেলিমকে বুঝিয়েছ- ওই রাহেলা বেগমের সংগে রয়েছে আমার একটা রুচিহীন সম্পর্ক। অস্বীকার করবে ম্যানেজার?

ম্যানেজার : (নেপথ্য কণ্ঠে) না, অস্বীকার করব না। কিন্তু শর্তের বাইরে গিয়ে আপনি ওই মহিলাকে নিয়োগ করেছিলেন কেন?

মাসুদ খান : মন-মানসিকতার দিক দিয়ে যে স্তরের লোক তুমি তাতে উত্তর দিলেও তুমি তা উপলব্ধি করতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি- ও সব শর্তের কথা ভেবে তুমি কলঙ্ক রটানোর কাজে হাত দাও নি।

(মাথা নত করে ম্যানেজার। তারপর অন্য ছবির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ছবির দৃঢ়চেতা মাসুদ খানের কথা শোনা যায়-)

বছরের পর বছর ধরে তুমি আমার ধনসম্পদ হস্তগত করেছ। তোমার বিশ্বাস- যে কাজের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে আমি জড়িয়ে পড়েছি, তা থেকে মুক্তি পেয়ে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে আমি স্বদেশেও আসতে পারব না, তোমার কাছ থেকে হিসাব-নিকাশও বুঝে নিতে পারব না। বাকি রইল সেলিম। তার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে বেহিসাবী অর্থাৎ অপচয়ের দুর্নাম তুমি রটিয়েছ রাহেলা বেগমের নামে।

ম্যানেজার : (নেপথ্যে কণ্ঠে) আপনি অন্যায়ভাবে অর্থ কামাচ্ছেন। আর এখানে থেকে আমি তা ম্যানেজ করছি। এক মাইনে-করা দরিদ্র ম্যানেজারের দায়িত্বে আপনার বোগাস বিজনেস, অন্য মাইনে-করা দরিদ্র অভিভাবিকার দায়িত্বে আপনার

www.pathagar.com

অবহেলিত সেলিম। কিন্তু ইচ্ছেমত খরচ করার অধিকার আমার নেই, আছে ওই রাহেলা বেগমের। তাই আপনার গোপন বিজনেসের অর্থ যথাসম্ভব গোপনে কেন আমি হস্তগত করব না? আর তার দায়দায়িত্ব কেন আমি চাপাতে চাইব না আপনার অসংগতভাবে ফেভারড্ মহিলা ওই রাহেলা বেগমের কাঁধে?

(উত্তেজিত ম্যানেজার এবার নিজের কণ্ঠেই বলে ওঠে)

ম্যানেজার ঃ অর্থ আমি চাইব না কেন, কেন? আমি ফেরেশতা নই, রক্তমাংসের মানুষ।

(মাসুদ খানের পরিহাসভরা হাসি ভেসে আসে, এ-ছবি থেকে, ও-ছবি থেকে। সে-হাসিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ম্যানেজার। হঠাৎ করেই হাসি থেমে যায়। ভেসে আসে মাসুদ খানের শীতল দৃঢ় কণ্ঠ-)

মাসুদ খান ঃ শিগগীরই আমি আসছি। পার, নিজেকে রক্ষ করো আমার ছোবল থেকে। জান তো, অনেকের মতে আমরা হলাম অক্টোপাস। নিজেকে রক্ষা করো।

(ম্যানেজারের চোখে মুখে ফুটে ওঠে এক ভীত-সন্ত্রস্ত আতঙ্ক)

(রাত গভীর। ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে অস্বস্তিভরা সময় কাটছে মানিকের। বাইরে থেকে ডাক্তার আগে রোগী দেখে)

মানিক ঃ ডাক্তার দাদুর প্র্যাকটিস বেশ বেড়ে গেছে মনে হয়। রাতের অন্ধকারেও রোগী দেখতে যেতে হয়?

ডাক্তার ঃ (বসে) জান মানিক ভাই, এই বস্তীতে এসে প্রথম যখন ডিসপেনসারী সাজাই, তখন এত লোক ছিল না এখানে। আশা ছিল- বস্তীর মানুষগুলো ক্রমে এখানে গড়ে তুলবে সুন্দর সাজানো সব বাড়ীঘর। আমি হব সেই সুন্দর এলাকার ডাক্তার। কিন্তু মানিক, ক্রমেই যে এখানে গড়ে উঠল এক বিরাট বস্তী। খুপড়ীর পর খুপড়ী। মনে হয়, সারাটা দেশই বুঝি বস্তী হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

মানিক : (দরদ মেশানো কণ্ঠে) ভাবছি দাদু, এত দুঃখী সব মানুষ কোথায় ছিল। সব হারিয়ে এখানে এসে মাথা গোঁজার চেষ্টা করছে!

(হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে মানিক বলে)

অথচ মাসুদ খানদের ম্যানসনে ম্যানসনে অঢেল শূন্য স্থান। সেখানে থাকার মত মানুষের অভাব!

(ডাক্তার উঠে এসে মানিকের পাশে দাঁড়ায়, কাঁধের উপর হাত রাখে। তখনই ভেসে আসে মেঘের গুড়ু গুড়ু ডাক। বাইরের দিকে তাকায় দু'জন)

ডাক্তার : তুমি কিন্তু তোমার মূল সমস্যাকে আড়াল করে কথা বলছ! তোমার ভেতরে এক ঝড়ের আভাসই আমি পাচ্ছি। তাই বলব– সবার জীবনেই সমস্যা থাকে। কিন্তু তার সমাধানের জন্য অতি–নাটকীয়তার পথে ....

(মানিক কোন উত্তর না দিয়ে চলে যায়। ডাক্তার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে)

(ঝড়ো আবহাওয়া ক্রমে শান্ত হয়ে আসে। ভোর হয়। প্রকৃতি শান্ত। ডিসপেনসারীতে ডাক্তার একা। তখনই আসে রাহেলা বেগম, মানসিকভাবে যথেষ্ট বিধ্বস্ত। ডাক্তার উৎসুক দৃষ্টি মেলে উঠে দাঁড়ায়)

রাহেলা : আমি মানিকের আম্মা।

ডাক্তার : বস মা, বস। (উভয়েই বসে) হঠাৎই আমার এ ডিসপেনসারীতে তুমি মা?

রাহেলা : আমি জানি, অনেকদিন ধরেই মানিক আপনার একান্ত আপন জন। আমার ধারণা– আমাদের মা ও ছেলের একটা সমস্যার কথাও আপনি জানেন।

ডাক্তার : জানি না– এমন কথা বলব না মা।

রাহেলা : ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে যার সুরাহা না হলে আমাদের দু'জনেরই জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। মানিক কোথায় বাবা?

ডাক্তার : গত রাতে কোথায় যেন বেড়াতে চলে গেছে।

রাহেলা : (ভগ্ন কণ্ঠে) কোথায়?!

www.pathagar.com

ডাক্তার ঃ জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাই নি। আমার ধারণা– আমার এক আত্মীয়ার কাছেই সে গেছে। শুধু বলে গেছে– শিগগীরই চলে আসবে।

রাহেলা ঃ (চিন্তান্বিত কণ্ঠে) আচ্ছা, আমি তাহলে আসি বাবা!

(যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। ডাক্তারও দাঁড়িয়ে বলে–)

ডাক্তার ঃ জান মা, রৌদ্র তাপে বাষ্প জমে জমে মেঘের সৃষ্টি হয়। কখনো প্রচন্ড ঝড়ের সৃষ্টি করে সেই মেঘ। এতে মানুষের করার কিছু থাকে না, শুধু ঝড়ের কবল থেকে সব কিছু বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারে মানুষ। সেই ঝড়ও এক সময় থেমে যায়, শান্ত হয়ে আসে প্রকৃতি। মানুষের জীবনটাও তেমনি। আমার বিশ্বাস– মানিক সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে।

(রাহেলা বেগম ডাক্তারকে দেখে নিয়ে ধীর পায় চলে যায়। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার)

(গ্রামে ফাতেমার কুটির। একজন বুড়োমত কাজের লোক মানিককে 'বাওবেড়া'র পাশ দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফাতেমার কুটিরের দিকে। মানিকের চোখেমুখে হতাশাজনিত চিন্তার ছাপ। নিজেরই কণ্ঠ নিজের কানে ভেসে আসছে। সে বুড়ো লোকটির সংগে এগিয়ে যাচ্ছে)

মানিক ঃ (নেপথ্য কণ্ঠে) যে মা তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ অনুভূতিকে সম্মান জানাতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে বছরের পর বছর ধরে সাজিয়েছেন নিজের সংসার, তাঁকে এক নজর দেখতে ছুটে এলাম এখানে। কিন্তু এ কী শুনলাম এসে! ছেলের বিয়ের জন্য মা ব্যস্ত, আর হঠাৎ করেই কাউকে কিছু না বলে রহমত আলী বাড়ী থেকে উধাও? কেউ জানে না– কেন? কিন্তু মা ফাতেমা যে আজ অপ্রকৃতিস্থ!

(ফাতেমা কুটিরের বারান্দার খুঁটি ধরে কল্পনায় ভবিষ্যৎ ঘরবাড়ী দেখছে আর আপন মনে কথা বলছে। বুড়োর সংগে মানিক এসে নীরবে কাছে দাঁড়ায়)

ফাতেমা ঃ দক্ষিণ দুয়াইরা ঘর তুললে তো ওই ভিটায় তুলতে হয়। ওই ঘরে থাকব আমার রহমত আলী। বিয়া করাইয়া বউ আনব

www.pathagar.com

ঘরে, আমার একমাত্র ছাওয়ালের বউ! ছেলে আমার দক্ষিণ দুয়াইরা ঘরে থাকব। আর আমি থাকব এই ঘরেই।

বুড়ো : আম্মা গো, ঢাকা থনে মেহমান আইছে।

(ফাতেমা তাতে কান দেয় না। গুন্ গুন্ করে গান ধরে)

ফাতেমা : পাঞ্জি পুথি দেইখ্যা গণক বিয়ার লগ্ন করে।
চইল্যা গিয়া করব বিয়া শ্বশুরের ঘরে।।
সাজিয়া গুজিয়া বিনোদ হইল আগুসার।
ঘোড়ার উপরে বিনোদ হইল রে সওয়ার।।
আগে পাছে বাদ্য বাজে বাজে ঢোলডগর।
বরযাত্রী হইল যত পাড়ার নাগর।।

(মানিকের দিকে তাকিয়ে বলে-)

তুমি বুঝি বরযাত্রী হইবা আমার রহমত আলীর বিয়াতে? কিন্তু বাবারা, কয়েকটা দিন যে দেরী করা লাগব! দক্ষিণ দুয়াইরা ঘর বানতে লাগব! বউয়ের লাইগ্যা গয়নাগাঁটি কিনা লাগব, রহমত আলীর লাইগ্যা জামাকাপড়! তার পরে তো বরযাত্রী সাইজ্যা যাইবা তোমরা!

(আবার গুন্ গুন্ করে গান ধরে)

আগে যদি জানতাম নিমাই যাইবা রে ছাড়িয়া।
কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া না করাইতাম বিয়া।।
তুমি যে যাইবা রে নিমাই তারো নাই সে দায়।
কুলবধূ বিষ্ণু প্রিয়া কি হইব উপায়।।

মানিক : মা গো, আমি ঢাকা থেকে এসেছি, অন্য মায়ের সন্তান। এলাম আপনাকে এক নজর দেখতে।

ফাতেমা : খুব ভালা করছ বা'জান। কইলা আরেক মায়ের সন্তান। কথায় আছে না-
স'স্র বরণ গাভীরে একই বরণ দুধ।
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম সবে একই মায়ের পুত।।

(আবার গুন্ গুন্ করে গান ধরে)

আধ পৃষ্ঠ খাইছিল্ মায়ের মাঘ মাইসা শীতে।
আধ পৃষ্ঠ খাইছিল্ মায়ের ....

(গান থামিয়ে মানিকের দিকে তাকিয়ে থাকে।
মানিকের দৃষ্টিতেও মমতা)

www.pathagar.com

মায়ের গায়ের বস্ত্রখানি যাদুর গায়ে দিয়া।
কত নিশি গুয়াইছিল্ মায় বুকে অনল্ নিয়া।।
হইয়া পুত্র মইর়া গেলে পাশরিতাম দুখ।
বাঁইচা পুত্র সন্ন্যাস গেলে দেখবো কার মুখ রে–
নিমাই চান সন্ন্যাস যায় রে!!

মানিক : আমি নিশ্চয় জানি– আপনার রহমত আলী ফিরে আসবেই!

বুড়ো : শয়তানের ফেরেবে পইড়া অকারণে চইল্যা গেছে সে। শয়তানের ধোকায় এমন মায়েরেও বোধ হয় সন্দে করছে রহমত আলী।

ফাতেমা : (মানিককে) তুমি ঠিকই কইছ বাবা। আমার বুকে ফিইরা সে আইবই! (হঠাৎ আবেগে উত্তেজিত কণ্ঠে) মায়ের বুক খালি কইরা সন্তান নিয়া যাইব এমন সাধ্য কার? কার??

(অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে মানিক)

মানিক : দেখতে এসেছিলাম, দেখা হয়ে গেল। আমি আসি মা!

(মানিক চলতে আরম্ভ করে ... ক্যামেরায় দেখা যায় মানিকের দ্রুত থেকে দ্রুততর পদচারণা। সেই পদচারনা থামে এসে ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে। সেখানে একা বসে আছে ফেলু)

মানিক : (অস্থির কণ্ঠে) ডাক্তার দাদু কোথায়?

ফেলু : সেলিমদের বাড়ীতে।

(মানিকের চোখেমুখে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি)

(মাসুদ খানের ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে আছে একদিকে রাহেলা বেগম, অন্যদিকে সেলিম। ড্রইংরুমের দরজার বাইরে খোলা জায়গা– তার সামনে কাঁচের ও কাঠের কম্বিনেশন পার্টিশন। তাতে যে দরজা তা দিয়ে ঢুকছে ডাক্তার আর দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন মাসুদ খান। প্রথমে ড্রইং রুমে ঢোকেন মাসুদ খান, তার পরই ডাক্তার)

মাসুদ খান : আসুন, আসুন ডাক্তার সাহেব। আজ আপনাকে আমাদের খুবই প্রয়োজন। প্রয়োজন বিশেষ করে আপনার উপস্থিতির। কথা যা

www.pathagar.com

বলার তা মেইনলি আমিই বলব। আমার আসার খবর পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ম্যানেজার। দিক, তার যথাবিহিত ব্যবস্থা আমি করব। হ্যাঁ, বাই নেচার আমি বেশ কিছুটা রেস্টলেস বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলব আমি। আপনি বসুন।

ডাক্তার : দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে আমারও কোন অসুবিদা হবে না। আপনি বলুন।

(মাসুদ খান সিগার বা পাইপ ধরান)

মাসুদ খান : আমার জীবনধারা, আমার কর্মকান্ড– এ সবের রহস্য–চিত্র আমি এখানে উদ্ঘাটিত করতে চাই না। আমি চাই– আমার বক্তব্যে একটি সত্য প্রতিষ্টিত হোক।

(ডাক্তার, সেলিম ও রাহেলাকে নিবিষ্টমন শ্রোতা হিসাবে দেখা যায়)

এক যুগেরও আগে রাহেলা বেগম তার স্বামীর অকাল মৃত্যুর ফলে একমাত্র সন্তান মানিককে নিয়ে তার অসহায়তার কথা আমাকে জানাল যখন, তখনও আমি আমার প্রয়োজনের কথাটাই ভাবছিলাম। প্রয়োজনটা ছিল সেলিমের জন্য এমন একজন মহিলাকে পাওয়া যিনি সালমা বেগমের মতই তাকে মানুষ করে তুলতে পারবেন। তার বিনিময়ে টাকার প্রশ্নটা ছিল অতি তুচ্ছ।

(আবার ফ্ল্যাশ ব্যাকে অসুস্থ সালমা বেগম কথা বলছে মাসুদ খানের সংগে)

সালমা : কেন জানি না – তুমি বরাবর চেয়ে আসছ, আমাদের সম্পর্কটা বজায় থাক। সেদিন বলেছিলে– একা পথ চলতে আমার অসুবিধা হবে। তাই সেলিম থাকবে আমারই পাশে। তোমার এ পরিকল্পনা বোধ হয় আর বাস্তবে রূপ পেল না!

মাসুদ খান : তুমি মন ভেঙে দিয়ো না সালমা। তোমার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

সালমা : ভাল হয়ে উঠি যদি– ভাল। কিন্তু আমার মন বলছে ....

মাসুদ খান : সালমা, প্লিয হ্যাভ কনফিডেন্স।

www.pathagar.com

সালমা : ঠিক আছে, কিন্তু লক্ষ্য রেখো – আমার অভাবে সেলিম যেন কোন কষ্ট না পায়।

মাসুদ খান : আমি কথা দিচ্ছি– তোমার অভাবেও সেলিম যাতে তোমার স্বপ্নের সন্তান হয়েই বড় হয়ে ওঠে তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব।

(ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ হয়। ড্রইংরুমের এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মাসুদ খান, শুনছে তিনজন)

মাসুদ খান : সেলিমের মা চাইতেন– তাঁর ছেলে গড়ে উঠবে তাঁরই আদর্শে, আমার আদর্শে নয়। রাহেলা বেগম সেলিমের অভিভাবিকার নিয়োগ পত্র পেলেন। সঙ্গে পেলেন সেলিমের মায়েরই মত অবাধ অধিকার। রাহেলা বেগমের জন্য তার দায়িত্বটি ছিল যেমন নির্মম, তেমনি কঠিন। তাই অর্থ ব্যয়ের এই অবাধ অধিকার তাঁকে দিয়েছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ে রাহেলা বেগম সে দায়িত্ব পালন করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। সুদূর বিদেশে থেকে সব খবরই আমি রেখেছি, খুশী হয়েছি। কিন্তু ইচ্ছে করেই আমি থেকেছি বহু দূরে যাতে এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাহেলা বেগমের নারীত্বের মর্যাদায় কোন কলঙ্কের ছোঁয়া না পড়ে। কিন্তু ওই শয়তান ম্যানেজার সুকৌশলে কলঙ্ক লেপন করতে এগিয়ে এল এমন এক নারী, এমন এক মায়ের চরিত্রে, যিনি সেদিনের মত আজও সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। রাহেলা বেগম সম্পর্কে এ সত্যটিই আমি প্রতিষ্ঠিত করতে এখানে ছুটে এসেছি। মায়ের সেবাযত্ন পেয়েই সেলিম আজ এত বড়টি হয়েছে, কিন্তু সেই মায়ের যথাযোগ্য সম্মান সে দিতে পারে নি।

(এবার মাসুদ খান ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়ান)

মানিক এখানে নেই। আপনি আছেন। তার মনের একান্ত আপন। আমার প্রতিটি উচ্চারিত বাক্য যদি বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে মানিকের কাছে তার মায়ের মর্যাদাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব দিয়ে গেলাম আপনারই ওপর। রাহেলা বেগম এ বাড়ী থেকে আজ চলে যাবেন। আপনি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। .... কে?

www.pathagar.com

(সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখে– মানিক এসে দরজায় দাড়িয়েছে)

ডাক্তার : মানিক!

মানিক : আমি আমার মা–কে নিয়ে যেতে এসেছি।

ডাক্তার : (আবেগ কম্পিত কণ্ঠে) মানিক! আমার মায়ের উপযুক্ত মর্যাদা ছাড়া ....

(ডাক্তারের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। মানিক ডাক্তারের দিকে অভয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে —)

মানিক : সন্তান তো মায়েরই নাড়ী-ছেঁড়া ধন! আর মায়ের মর্যাদা? মা–কে সেই মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল! এস আম্মা। (মাসুদ খান ও সেলিমের দিকে তাকিয়ে) এই হতভাগ্য মানিকের কাছে তার মা যে এক বেহেশ্‌তী সওগাত! আসি।

সেলিম : ভুল আমি করেছি। আমি অপরাধী। কিন্তু তাই বলে আমার মা–কে নিয়ে তুমি কোথায় যাবে ভাই?

মানিক : ডাক্তার দাদুর বস্তীতে, আমার ঘরে! আমার মায়ের ঘরে!

সেলিম : কিন্তু এই রাতের আঁধারে সেই পথ যে তেমন দেখা যায় না!

মানিক : এঘর–ওঘর থেকে আলো এসে পড়ে সেখানেও। সেই ছায়া–ছায়া পথে আম্মাকে নিয়ে আমি ঠিক যেতে পারব। চাও যদি, তুমিও যে কোন সময় দেখে এসো আমাদের মা–কে!

(এক হাতে মায়ের হাত অন্য হাতে ডাক্তারের হাত ধরে মানিক ফিরে যেতে পা বাড়ায়। মাসুদ খানের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি, সেলিম নতমুখ)

– শেষ –

www.pathagar.com

পদ্মগোখ্‌রো

গল্প ঃ কাজী নজরুল ইসলাম

বেতার নাট্যরূপ ঃ আসকার ইবনে শাইখ

চরিত্র-লিপি

মীর সাহেব

মীর-বেগম

আরিফ

জোহরা

রাহাতন

পাগলা ফকীর

সৈয়দ সাহেব

সৈয়দ বেগম

হাকিম

ও

করিম

কাজী নজরুল ইসলামের ছোট গল্প 'পদ্মগোখরো' অবলম্বনে রচিত হয়েছে বেতার নাট্য 'পদ্মগোখরো'। এ বেতার নাট্যটি রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু বাড়তি চরিত্রের অবতারণা করতে হয়েছে। মূল গল্পের সুর বজায় রেখেই আমি তা করতে চেষ্টা করেছি। ব্যর্থতার ফলে যদি গল্পের অঙ্গহানি ঘটিয়ে থাকি, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

www.pathagar.com

(কয়েকটা কাকের কা–কা শব্দে মীর–বেগম চমকে ওঠেন। পরমুহূর্তেই অদূরে বড় ডেকচীতে হাতা ঘসার শব্দ শোনা যায়)

মীর–বেগম : রাহাতন, ওরে রাহাতন।

রাহাতন : (দূর থেকে) জ্বে মীর–আম্মা!

মীর–বেগম : কাকগুলোকে তাড়িয়ে দে না! কি রকম বিশ্রী শব্দ করছে। বাড়ীতে সারাদিন গেল মেজবানির ধকল — হাঁফ ছেড়ে একটু বসলাম, তখনই এই শব্দ!

রাহাতন : (দূর থেকে) এই যাহ্, যাহ্ — দূর — দূর —

(হাততালি দেয়)

মীর-বেগম : তোর এই 'দূর দূর' কথা আর হাততালিতে ওগুলো চলে যাবে? লোকজনদের কাউকে বল্– লম্বা বাঁশ দিয়ে ওগুলোকে তাড়াক। বাড়ীতে এতগুলো কাজের লোক – এই বিরক্তিকর শব্দ কারও কানে যায় না?

রাহাতন : (দূর থেকে) তাড়ানির ব্যবস্থা করতেছি মীর–আম্মা।

মীর-বেগম : আর তুই মীর সাহেবের পানের বাটা পাঠিয়ে দে। আমি যাচ্ছি ওখানে।

(বাঁশে–বাঁশে শব্দ করে কাক তাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে মীর সাহেবের হুকা টানার শব্দও ক্রমে কাছে আসছে)

মীর সাহেব : কি হল, এত জোরে জোরে কথা বলা হচ্ছে কেন?

মীর-বেগম : ওই যে কাকগুলো — কেমন কা–কা করছে। একটু বিশ্রাম নেব বলে বসেছিলাম। হঠাৎ কা–কা শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল। ওগুলোকে তাড়াতে বললাম।

মীর সাহেব : বাড়ীতে একটা মেজবানি হয়ে গেল। খেয়ে গেল সারা গাঁয়ের লোকজন, আর কাক–পক্ষী এসে কা–কা করবে না?

মীর-বেগম : বাড়ীর ভাঙা দালান–কোঠা আবার মেরামত করা হল। তারই জন্য লোক–খাওয়ানোর ব্যবস্থা। এই আনন্দের মধ্যে ওরকম বিশ্রী শব্দ শুনলে মনে হয় না— এ বাড়ীতে আবার অশুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে?

মীর সাহেব : না না বেগম, অশুভ যা কিছু ছিল, সব কেটে গেছে আমাদের আরিফের বিয়ের পর। সৈয়দ বাড়ীর মেয়ে জোহরা বউমা মীর

www.pathagar.com

বাড়ীতে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হারিয়ে যাওয়া সকল শুভ আবার ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে।

(অদূরে ঢেকচী ও বাসন-কোসনের শব্দ। মীর সাহেবের হুকার শব্দও শোনা যায়)

রাহাতন : এই যে আম্মা - পান।

মীর-বেগম : রেখে যা এখানে। — হ্যাঁ, চারদিকে লোকজনের মুখে শুধু এক কথা- এতদিন কষ্টের পর আলাদীনের চেরাগ পেয়েছে এই রসুলপুরের মীর বাড়ী। তার বদৌলতে মীর বাড়ী আমার জমজমাট!

মীর সাহেব : বলতে তো পারেই আরিফের মা। আরিফ-জোহরার শাদী হল দু'বছরের কিছু বেশি। তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে — তুমি যখন বউ হয়ে এলে এই মীর বাড়ীতে, তখন তো মীরদের ভাগ্য-তরী প্রায় ডুবেই গেছে! নিজের চোখে দেখেছি মীরদের সেই শান-শওকত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সব কিছু। লোকেরা বলতে আরম্ভ করল : ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল।

মীর-বেগম : নির্মূল হবে না? এত বিলাসিতা, এত ভোগ-বিলাস — লোকে তখন বলত — মুর্শিদাবাদের আর এক নওয়াব-বাড়ী যেন রসুলপুরের এই মীর বাড়ী!

(রাহাতন ঘরের কাছে এসে গলাখাকারী দেয়)

কি রে রাহাতন, কিছু বলবে?

রাহাতন : (অল্প দূর থেকে) ধারাকান্দার পাগলা ফকীর খাওয়া-দাওয়ার পর বসে আছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যাও হয়-হয়। আপনে কি সব কথাবার্তা —

মীর-বেগম : আর একটু বসতে বল্ গে'। আমি আসছি।

রাহাতন : জ্বে। (চলে যায়)

মীর সাহেব : মুর্শিদাবাদের নওয়াব-বাড়ী কিন্তু তার আগের শান-শওকত আর ফিরে পেল না!

মীর-বেগম : অথচ রসুলপুরের মীর বাড়ী তা ফিরে পেতে আরম্ভ করেছে— এই-ই তো বলবেন মীর সাহেব?

মীর সাহেব : বলতে তো কোন বাধা দেখছি না। অবিশ্যি নওয়াব-বাড়ীর সঙ্গে এই মীর বাড়ীর কোন তুলনাই হত না কোনদিন। ওটা

www.pathagar.com

ছিল একটা কথার কথা। যাক, পাগলা ফকীরকে আবার তলব দিয়ে আনা হল কেন?

মীর-বেগম ঃ বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই বউমার যমজ সন্তান জন্ম নিয়ে আঁতুড় ঘরেই মারা গেল। তারপর এতগুলো দিন যাচ্ছে — মানে মীর বাড়ীর ভবিষ্যৎ বংশধর —

মীর সাহেব ঃ ও, তারই জন্যে পাগলা ফকীরের ডাক পড়েছে? ঠিক আছে। আমি কিন্তু ছেলে–বউয়ের মুখে কোন অভাবের ছাপ দেখতে পাইনা।

মীর-বেগম ঃ সব কিছুই কি আর মানুষের চোখে পড়ে?

মীর সাহেব ঃ (নিম্ন কণ্ঠে) কিন্তু দেখো, চিকিৎসার নামে আমাদের ওই ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়ো না। মানুষের কাছে যা রহস্য, তা রহস্যই থাক।

মীর-বেগম ঃ সে–ব্যাপারে আমি সাবধান থাকব। আমিও জানি, আমাদের ছেলে–বউ খুবই সুখে–শান্তিতে আছে। কিন্তু — (নিম্ন কণ্ঠে) জোহরা বউমার কোন ভাবান্তরই কি আপনার চোখে পড়ে নাই?

মীর সাহেব ঃ (দ্বিধান্বিত নিম্ন কণ্ঠে) আমি তো ওদের মিল–মুহব্বতটাই —

(শোনা যায় আরিফ ও জোহরার মিলিত হাসি। কিছুটা দূর থেকে কাছে ভেসে আসে দু'জনের সেই আনন্দের হাসি)

আরিফ ঃ হ্যাঁ জোহরা, আমাদের দু'জনার মিল-মুহব্বতের কথা আজ অনেকেরই মুখে মুখে। আরও একটা কথা অবিশ্যি লোকজনের মুখে মুখে ফিরছে বলে শুনি।

জোহরা ঃ আরিফ সাহেবের সেই শোনা কথাটা কি? মীর বাড়ীর বউ এসে খুঁজে পেয়েছে জ্বিনের দেওয়া যক্ষের ধন — এই কথা তো?

আরিফ ঃ এমনি কাণাঘুষা তো আছেই। কিন্তু লোকের মুখে আজ এমন কথা, যা আমার জন্য খুব সম্মানজনক নয়। কি, বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছ যে?

জোহরা ঃ তোমার অসম্মানজনক সেই কথাটা শুনতে খুব ইচ্ছে করছে যে।

আরিফ ঃ আন্দাজ করে বল তো — সেই কথাটা কি?

www.pathagar.com

জোহরা ঃ জ্বিনে ধরা বউয়ের পাওয়া টাকায় আরিফ সাহেব প্রথমে কলকাতা গিয়ে কয়লার ব্যবসা, পরে কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টারি করে দেদার টাকা কামাচ্ছেন, ভাঙা বাড়ীঘর আবার মেরামত করাচ্ছেন। বলতে গেলে বউয়েরই বদৌলতে!

আরিফ ঃ জ্বি না, জোহরা বেগমের ধারণাটা ঠিক নয়।

জোহরা ঃ তাহলে আরিফ সাহেবই দয়া করে বলুন — সে কথাটা কি?

আরিফ ঃ সে কথাটা হচ্ছে – আরিফ মীর নাকি একজন ঘোর স্ত্রৈণ!

জোহরা ঃ যাঃ! বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছ তুমি।

আরিফ ঃ জ্বি না, বানিয়ে বলছি না। আমাদের ব্যাপারটা অন্যের চোখে ধরা পড়ে না মনে কর?

জোহরা ঃ আর আমি যে বাপের বাড়ী যাই না, যেতে চাই না, মীর বাড়ীতেই খুঁজে পেয়েছি সকল সুখের খনি — এ কথাটাও জানে না অন্যেরা!

আরিফ ঃ ঠিক আছে – মানলাম, আমাদের দু'জনারই সম্মান-অসম্মানের ব্যাপারটা সমান-সমান। কিন্তু জোহরা, কুতুবপুরের সৈয়দ বাড়ীর যে রত্নটি পেয়ে আমি আজ এত ঐশ্বর্যশালী, তাকে হারাতে হলে আমার যে বেদনা —

জোহরা ঃ কথাটি তুমি আর শেষ করো না। আমি তা শুনতে চাইব না।

আরিফ ঃ কেন? এটা যে আমার জীবন-মরণের কথা! তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে কেন?

জোহরা ঃ দূরে তো আমি সরে যাই নি! আমি তো রয়েছি তোমারই একান্তকাছে!

আরিফ ঃ না, ওই দু'টি প্রাণী তোমাকে আমার কাছ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়েছে!

জোহরা ঃ তুমি শুধু তোমার আবেগ নিয়েই এতসব ভাবছ। আমাদের দু'জনেরই আবেগের ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার মনের যে শূন্যতায় ভুগছি আমি — যাক, আমি বলি কি — এসব কথা থাক। তার চেয়ে তুমি বরং তোমার ওয়ালেদানের সেই বিলাস-দিনের গল্প কর। আজকের এ খুশীর আবহটা বজায় থাক।

আরিফ ঃ আমার সমস্যাটা এড়িয়ে যেতে চাইছ?

www.pathagar.com

জোহরা : আমার শ্বশুরের দাদাজানের আমলে এ বাড়ীতে নাকি পায়ের খড়মেও ঘুঙুর পড়ানো হত?

আরিফ : তাই তো শুনি। গোসলের আগে সেই মীর সাহেবের গায়ে তেল মেখে দিত সুন্দরী যুবতী মেয়েরা।

জোহরা : (অকারণে কণ্ঠে আনন্দ মাখিয়ে) এতসব সুন্দরী মেয়ে এই রসুলপুরে আসত কোথেকে?

আরিফ : দূর-অদূরের নানা জায়গা থেকে, টাকার বদলে।

জোহরা : সেই মীর তাহলে খুবই নির্মল চরিত্রের ছিলেন বলতে হবে!

আরিফ : তা ছিলেন। তাই তো মীরদের সেই স্বর্ণলঙ্কা একদিন হয়ে গেল দগ্ধলঙ্কা! তারপর কেটে গেছে বহুদিন। বহুদিনের দুঃসহ দারিদ্র! আর ঠিক তখনই এ বাড়ীতে এলে তুমি — কতুবপুরের সৈয়দদের কন্যা জোহরা! কিন্তু ---

জোহরা : কিন্তু দিয়ে আবার সেই কথার অবতারণা? তার আগে আমার একটা প্রশ্ন - মীর বাড়ীর অন্দর-পথের আলো-আঁধারিতে পাগলা ফকীর বসে আছে কেন?

আরিফ : অন্দর-পথের আলো-আঁধারিতে পাগলা ফকীর?

(নিম্ন কণ্ঠে ডাকে পাগলা ফকীর —)

ফকীর : কই রাহাতন, বেগমসা'ব এখনও যে আলেন না? পেট ভরিয়ে খাওয়ালে, আদর-যত্ন করলে। কিন্তু যে জন্যি আলাম, তার কি? তোমার সাথে আর কত কথা ক'ব?

রাহাতন : আর একটু বসেন ফকীর সা'ব। আম্মা কথা কইতিছেন মীর সায়বের সাথে। কথা শেষ করেই আসবেন।

ফকীর : ও, আচ্ছা। তা বউ-আম্মার যমজ সন্তান আঁতুড়েই মরি গেল শুনলাম। তার জন্যি বউ-আম্মার দুঃখের কারণটাও বুঝলাম। কোলে আরও সন্তান না এলে তো সে-দুঃখ ভুলবার নয়! কিন্তু তার জন্যি তো একটা সময় --- মানে- ইয়ে ---

রাহাতন : (হঠাৎ নিম্ন কণ্ঠে ফিস ফিস করে) এই বাড়ীতে এখন সাপ-খোপের আনাগোনা চলছে ফকীর সা'ব!

ফকীর : সাপ-খোপের আনাগোনা? তা বাড়ীটা তো পতিত হয়াই গেছিল। ঝোপ-ঝাড়ে সাপ-খোপ তো থাকেই! এখন আবার

www.pathagar.com

দালান-কোঠা ঠিকঠাক করা হয়েছে, সাপ-খোপের উপদ্রবও কমি যাবে।

রাহাতন : না ফকীর সা'ব, উপদ্রব এখন অনেক বেশি। মাইনষের মত ব্যবহার করতে আরম্ভ কইরেছে সাপ। ওই যে মীর আম্মা আসি গেছেন, আমি দুয়ারের পাশে তানির কাছে যাই।

ফকীর : আমি সেলাম জানাই মীর আম্মা। বড় শান্তিতে খাওয়া-দাওয়া সারলাম। এখন আপনের হুকুমের অপেক্ষায় আছি। সন্ধ্যারও বাকী নাই।

মীর-বেগম : ফকীরকে বল্‌-বউমার শরীরটা যাতে ঠিকঠাক হয়ে যায়, যাতে আবার —

ফকীর : তার জন্যি তাবিজ-কবচের ব্যবস্থা আমি কইরে দিব মীর আম্মা। কিন্তু ওই যে সাপ-খোপের কি সব কথা —

মীর-বেগম : রাহাতন, তুই ফকীর সা'বকে বল্‌ — আমার খুবই সন্দেহ, বাড়ীতে জ্বিন-ভূতের আছর পড়েছে। তা ঠেকাতে হলে —

ফকীর : যা যা করা দরকার, তা করা যাবে। কিন্তু রাহাতন ঠারে-ঠুরে যা কইল, কিছুই তার বুঝলাম না।

রাহাতন : আমরাও তো পষ্ট কিছু বুঝি না।

ফকীর : ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক মনে হইতেছে আম্মা। মন্ত্রগুণে জ্বিন-ভূত বান্ধা গেলেও রহস্যকে বান্ধা খুবই কঠিন।

রাহাতন : মীর আম্মা আমারে ইশারায় কইলেন — সেই কঠিন কাজটাই আপনে করবেন। টাকাকড়ি যা লাগে —

ফকীর : আচ্ছা, আইজ বাড়ীটার চাইরদিক তাইলে ঘুরে ফিরে দেইখে যাই। কূলকিনারা ঠিক কইরে আবার আসব নে। আল্লাহ্ হক। আবার সেলাম জানাই মীর আম্মা। রাহাতন, আমারে পথ দেখাও।

রাহাতন : চলেন।

(ওরা স্থানত্যাগ করে)

(ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে পাগলা ফকীর আর রাহাতন)

ফকীর : বুঝলে রাহাতন, সমস্যাটা খুব জটিল। এই জটিল সমস্যার জট খোলা যাবে এর মধ্যে যে রহস্য আছে, তা জানতি

www.pathagar.com

পারলে। আমার কাছে ধরা পইড়েছে যে এর রহস্যটা তুমি জান।

রাহাতন : এ্যাঁ! ধরা পইড়েছে?

ফকীর : ধরা পইড়েছে। অনেক দিনের ফকীর তো! তাও পাগলা ফকীর।

রাহাতন : কিন্তু সেই কথা বাপ-মা আর বউ–বেটা ছাড়া আর যে কেউ জানেনা।

ফকীর : হাঃ হাঃ হাঃ — আর কেউর মইধ্যে জান শুধু তুমি। তাই কইতেছি — আমারেও জানাও।

রাহাতন : আসেন।

(রহস্যময় মিউজিক। কথা বলছে রাহাতন। নিম্ন কণ্ঠে, কখনও ফিস্ ফিস্ করে)

ফকীর : কয়া যাও রাহাতন।

রাহাতন : মীর সায়বের ছেলে আর বউয়ের রূপ দেইখেছেন তো?

ফকীর : দেইখেছি। দুইজনই যেন আসমানের চান!

রাহাতন : কিন্তু রসুলপুরের মীর বাড়ী আর কুতুবপুরের সৈয়দ বাড়ী–

ফকীর : দুই বাড়ীই গরীব।

রাহাতন : কিন্তু কি আচানক! বিয়ার পর মীর বাড়ীর ভাগ্য ফিইরে গেল। মীর আম্মা আছিলেন চিররুগী। দেখতে দেখতে সেরে উঠলেন। মীর আম্মা কইলেন — বউ খুব পয়মন্ত।

ফকীর : হুঁম্, বুঝতেছি। মীর বাড়ীতে সৌভাগ্যের চান। আরও আগাইয়া যাও।

রাহাতন : (ফিস্ ফিস্ করে) একদিন —

ফকীর : (ফিস্ ফিস্ করে) হ্যাঁ, একদিন —

রাহাতন : জোহরা বউমা ভাঙা দালানের দেয়ালে দেখে একটা ফাটল। কি মনে করে একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিল সেই ফাটলে।

ফকীর : এমনি শোনা গেল —

(মিউজিকের মৃদু ক্রাশ)

রাহাতন : সাপের গর্জনের মত একটা শব্দ।

ফকীর : আর ভয় পেইয়ে —

রাহাতন : স্বামীরে খবর দিল।

www.pathagar.com

আরিফ	ঃ	কি যে তুমি কর জোহরা! আমার তো মনে হয় — ওই ফাটলে রয়েছে বিষধর সাপ! এই যে আব্বাও এসে গেছেন।
মীর সাহেব	ঃ	ও সাপটাকে মারতেই হবে। নইলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়ে দেবে। কিন্তু গর্জন শুনে মনে হচ্ছে — ওটা জাত সাপ!
আরিফ	ঃ	আব্বা, আপনাদের বউ যা করেছে, তাতে তো এভাবে ফাটলটাকে রেখে দেওয়া যায় না।
মীর সাহেব	ঃ	নে, শাবল নে হাতে। ফাটলটা আর একটু ভেঙ্গে খোঁচা দে।
		(দেয়ালে শাবলের ঘা দেওয়ার শব্দ)
		খুব সাবধানে। সাবধানে।
আরিফ	ঃ	আব্বা! সাপ! বেরুচ্ছে! একটা দুধ-সাদা গোখরো, মাথায় চক্র-চিহ্ন!
মীর সাহেব	ঃ	মারিসনে মারিসনে। ওটা বাস্তু সাপ!
আরিফ	ঃ	বাস্তু সাপ!
মীর সাহেব	ঃ	পদ্ম-গোখ্‌রো!
আরিফ	ঃ	পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। চলে আসুন সবাই।
জোহরা	ঃ	(নিম্ন কণ্ঠে) এই, শোন।
আরিফ	ঃ	কান্ড তো বাঁধালে একটা। এবার? কি বলবে, বল।
জোহরা	ঃ	তুমি যখন ফাটলটা খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পিতলের কোন কিছু আছে।
আরিফ	ঃ	তাই নাকি? দাঁড়াও, আব্বাকে কথাটা জানাই।
মীর সাহেব	ঃ	কিন্তু কই, আমি সেরকম শব্দ তো শুনি নি!
আরিফ	ঃ	আমরা তখন সাপের ভয়ে অস্থির। কাজেই শব্দ হলেও শুনতে পাইনি।
		(রহস্যময় মিউজিক)
রাহাতন	ঃ	তারপর বাপ-বেটায় দেয়ালের ইট সরাতেই দেখে —
ফকীর	ঃ	চকচকে একটা পিতলের কলসী!
রাহাতন	ঃ	কিন্তু আর একটা সাপ জড়ায়ে আছে কলসীটা। কিছুতেই নড়ে না।

www.pathagar.com

ফকীর : মাঝে মাঝে শুধু ফণা বিস্তার করে শাসায় — এ্যাঁ?

রাহাতন : জোহরা বউমার যে কি সাহস! কি মনে কইরে হঠাৎ এক বাটি দুধ আনি রাখল কলসীটার কাছে। সাপটা ছোবল মারল না বউমার হাতে। কলসীর গলা ছেইড়ে নামি আসি শান্তভাবে দুধ খেতে লাগল। আর শব্দ কইরতে লাগল ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত। একটু ক্ষণের মধ্যেই আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো আসি আগেরটার মত খেতে লাগল দুধ।

জোহরা : ওই আগেরটার গায়ে শাবলের খোঁচার দাগ। কী রকম নীল হয়েগেছে!

মীর সাহেব : আর এখানে থাকে না। চল বউমা, চল সবাই।

জোহরা : আব্বা আমি একটু ---

(কলসীর ঢাকনা খোলার শব্দ)

মীর-বেগম : কিন্তু কলসীতে যে অনেক আশরফী —বাদশাহীআশরফী!!

(কড়া মিউজিক। তার মাঝেই শোনা যায় শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কণ্ঠ-)

মীর সাহেব : সোনার মোহর!!

মীর-বেগম : সত্যিই বউমা, তোর সাথে মীর বাড়ীর লক্ষ্মী আবার ফিরে এল!!

(মিউজিকের পরিবর্তন- রহস্যজনক মিউজিক)

ফকীর : তারপর ক্ষুদ্র মক্তবের শিক্ষক আরিফ মীর মক্তব ছাড়ি কলকাতায়। কয়লার ব্যবসা, কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টারি! ভাঙ্গা মীর বাড়ীর মেরামত। অনেক চাকর-দাসী। তাই না রাহাতন?

রাহাতন : কিন্তু বউমাকে নিয়ে হইল বিপদ।

ফকীর : বিপদ?

রাহাতন : সাপ দু'টির জন্যি বউমাও যেমন মায়ের স্নেহে আকুল, পদ্মগোখ্‌রোগুলিও বউমার জন্যি তেমনি অনুরাগী। এখন-তখন দুধকলা দেয় বউমা, আর পদ্মগোখ্‌রারা খায় আর বউমার পিছে পিছে ফিরে।

www.pathagar.com

ফকীর : আর বউমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী-স্বামী বুঝি ভয়ে কম্পমান?

রাহাতন : সাপও মারতে পারে না, বাড়ীও ছাড়তে পারে না।

ফকীর : ধন-দৌলতের মায়া!

রাহাতন : শেষ পর্যন্ত সবারই সয়ে গেল সব কিছু। পদ্মগোখ্‌রোরা হয়া উঠল বউমার সন্তানের মত। রাতে বিছানায় বউমার গা জড়িয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু স্বামীর পক্ষে এসব সহ্য করা তো মুস্কিল। একদিন বউমাকে কয় তার স্বামী —

আরিফ : জোহরা, তোমাকে ছেড়ে চাই না আমি এই রাজ-ঐশ্বর্য। তুমি সম্মতি দাও, মেরে ফেলি ও দুটোকে। এর চেয়ে দারিদ্র আমার ঢের শান্তিময় ছিল।

জোহরা : ওগো, ওরা যে আমার সেই মরা দুই যমজ সন্তান।

আরিফ : জোহরা! কি বলছ তুমি?

জোহরা : ঠিকই বলছি। ওরা তো কারও কোন ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে আসে না।

আরিফ : তোমাকে ওরা দংশন করে না সত্যি, কিন্তু ওদের কাল্পনিক বিষের জ্বালায় আমি যে পুড়ে মরছি! ওরা যে আমার কি সর্বনাশ করেছে, তা তুমি বুঝতে চাও না যে! এর চেয়ে ওরা যদি সত্যি দংশন করত আমাকে, মরে গিয়ে আমি মুক্তি পেতাম।

জোহরা : (অনেকটা আপন মনে) এত দুশমন হয়ে পড়েছে ওরা?

(মিউজিক চলছে)

ফকীর : রাহাতন, কাহিনী এ পর্যন্তই থাউক। তোমাকে একটা কথা সাফ সাফ কইতে চাই।

রাহাতন : ক'ন ফকীর সা'ব!

ফকীর : এই সমস্যার সমাধান করতে পারি, অত বড় ফকীর আমি হই নাই। সমস্যাটা আল্লা'র হাতেই ছেইড়ে দাও। আর পরিণতির জন্যি অপেক্ষা কর। রাইত অনেকটা হইল, আমি আসি।

www.pathagar.com

(গ্রাম্য পথ। রাত। কাছে কোথাও শেয়াল বা কুকুরের অশুভ ডাক শোনা যায়)

করিম : এই রাইতে অশুভ শব্দ! হাকিম ভাই, অবস্থাটা ভাল ঠেকছে না।

হাকিম : হ', আঁন্ধারটাও বেশি বেশি মনে হয় করিম।

করিম : বাজার করে ফিরতে রাইত হয়া গেল! সঙ্গে নাই কোন আলো। পথ হাঁটছিও পঁচা ডোবার পাশ দিয়ে।

হাকিম : হ্যাঁ, সাপ-খোপের ভয় তো আছেই। — ওই যে পিছনে কে যেন আসতিছে! হাতের আলো জ্বলছে নিভছে।

করিম : টচ্ লাইট। মাঝে মধ্যে জ্বালায়, আবার নিভায়।

(অদূরে গানের গুন্‌গুনানি শোনা যায়)

ধারাকান্দার পাগলা ফকীর না কি?

(গুন্‌গুনানি গান কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে)

ফকীর : (কিছু দূরে) এমন উল্‌টা দেশ গুরু কোন্ জায়গায় আছে?

হাকিম : হ', পাগলা ফকীরই তো! (গলাছেড়ে) এই ফকীর, পা চালায়ে আস। আর গানটা ধর আরও জোরে।

ফকীর : (কিছু দূর থেকেই) ক্যান্, আন্ধাইরে ভয় করে নাকি? আসতেছি। (গান) এমন উল্‌টা দেশ গুরু কোন্ জায়গায় আছে?

আকাশেতে গাছের গোড়া পাতালেতে ফল ধইরাছে।

এমন উলটা ———————— আছে?

(কাছথেকে) কি, হইল কি? রাইতের আন্ধাইরে এত ডর?

করিম : এই পঁচা ডোবার পাশ দিয়ে যাচ্ছি — বোঝই তো ফকীর, আন্ধাইর রাইত, সাপ-খোপের ভয় আছে না?

ফকীর : হ্যাঁ, পঁচা ডোবা, সাপ তো থাকতেই পারে। কিন্তু সাপ যেমন আছে, সাপের ওঝাও তো আছে রে করিম!

হাকিম : তুমি তো হইলে ভূত-পেরত তাড়াবার ফকীর। দংশন যদি করেই, তাইলে সে বিষ নামানোর জন্যি আনতে হবে ওই দূর গাঁয়েরওঝা।

ফকীর : তা আনতে হবে। তবে চেষ্টা করলে ওঝার কাজও যে চালাতে পারি না, তা না। সাপের মন্ত্রও শিখেছিলাম। কিন্তু প্যাকটিশ্ করি না, তাই ওঝা নামটাও আর হইল না। শুনবা নাকি সাপের মন্ত্র? কিছুটা?

www.pathagar.com

করিম ঃ এই আন্ধাইরে আবার সাপের মন্ত্র শোনার কি দরকার?

ফকীর ঃ (সুর করে) এ– এই —

সাধের চিলা রে বাঁকা বলি তোরে–

কোন্‌খানে ডংশিলে রে চিলা যইবত নারীর গাও।।

হাকিম ঃ আহ্‌ হা — ফকীর!

ফকীর ঃ এ — এই —

আরক্ষ্যা জারক্ষ্যা বিষ তন্ত্র নাহি মানে
কালিয়া সাপের বিষ ঢলিয়া পড়ে রে!
উজানি উজানি দাফন যদি করিবে —
আয় বিষ মন কলব
রহিতে না পার বিষ মা পদ্মার তলব।।

করিম ঃ (কিছুটা অস্বস্তিতে) এইবার থাম ফকীর!

ফকীর ঃ থাবায় ধরিলাম বিষ
ছিপায় করলাম পানি;
আয় বিষ মন কলব
রহিতে না পার বিষ মা পদ্মার তলব।।

এর পর মাটিতে চাপ করে রাখা হাতের উপর পানি ঢালবে ওঝা, পানি। আর ভিজা মাটিতে ঘোরাবে হাত — লেপ্‌টে লেপ্‌টে লেপ্‌টে লেপ্‌টে। ব্যস, হয়ে গেল হাত চালান। এইবার সেই হাত ঘুরবে। ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে গিয়া পড়বে ডৌকার গায়ে সেই জায়গায় — যেখানে –

(সুরে) ডংশিছে দারুণ কালিয়া রে!

আয়, আয় বিষ মন কলব —
নাম্‌ নাম্‌ সাপের বিষ
নাম্‌ মা পদ্মার তলব!

হাকিম ঃ (চরম অস্বস্তিতে) ফকীর, থাম। এই আন্ধাইর রাইতে এইসব পাগলামী রাখ।

ফকীর ঃ (চাপা হাসি) ক্যান্‌? শুনলে গা ছম্‌ছম্‌ করে? হাঃ হাঃ হাঃ — এত ডর? থামলাম। তবে শুনে রাখ — সাপেরে না খোঁচালে, সাপের কোন ক্ষতি না করলে, সাপ কাউরে দংশন করে না। কিন্তু মাইন্‌ষে করে।

করিম ঃ মাইন্‌ষে করে?

www.pathagar.com

ফকীর ঃ করে না? এমন মানুষ নাই — যারে না খোঁচালেও, অন্য কোন ক্ষতি না করলেও, সেই অন্যেরে সে দংশন করে? তার দাঁতের গোড়ায় গজ্‌রায়ে গজ্‌রায়ে ওঠে সব্বনাইশ্যা বিষ! তার গল্প শুনবা?

হাকিম ঃ নাহ্, তোমার এই ঢংয়ের গল্প রেখে এমন কথাবার্তা কও, যাতে মনটা খুশী হয়। ওই যে পথের বাঁকে দোকান। দোকানের মাচায় বসে অবস্থাটা একটু বদলে নেই।

করিম ঃ তুমি বরং ওই উল্‌টা দেশের গানটা গাও।

ফকীর ঃ অত কমজোর মন নিয়া দুনিয়ায় চলবা ক্যামনে? কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, এমন কাজও তো মাইন্‌ষে করে!

এমন উল্‌টা দেশ গুরু কোন্ জায়গায় আছে?
আকাশেতে গাছের গোড়া পাতালেতে ফল ধইরাছে।।
এমন উল্‌টা ——————— আছে?

হাকিম ঃ ভাল ভাল — আকাশেতে গাছের গোড়া পাতালেতে ফল ধইরাছে?

ফকীর ঃ সেই দেশেতে যত লোকের বাস
আহার নিদ্রা নাই তাহাদের
নাই নাকে নিশ্বাস।
সেই দেশেরই যত লোকজন
এই দেশেতে আসিতেছে।।
এমন উলটা ——————— আছে?
কি, উল্‌টা দেশের গান শুইনে গা ছম্‌ছম্ ভাবটা কাটল?

(সকলেই হাসাহাসি করে)

(কথা বলছেন মীর সাহেব ও মীর-বেগম)

মীর-বেগম ঃ ছেলে-বউ সম্পর্কে মীর-সাহেবের ধারণা ঠিক নয়, দিনদিনই তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

মীর সাহেব ঃ যেমন?

মরি-বেগম ঃ ওই পদ্ম-গোখ্‌রোর জন্যে আরিফ তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিছানায় শুয়ে পায় সাপের ঠান্ডা স্পর্শ। কি যে অবাক কান্ড — সাপ দু'টি যেন বউমার অবুঝ দু'টি সন্তান!

www.pathagar.com

মীর সাহেব : হ্যাঁ, ওরা দেখছি বাড়ীর লোকের মতই এখানে সেখানে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

মীর-বেগম : এসব দেখে আমার কিন্তু পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্ছে। ছেলে আর বউয়ের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে, এতে আর দ্বিমত কি।

মীর সাহেব : এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে : বউমাকে কিছুদিনের জন্য কুতুবপুরে পাঠিয়ে দেওয়া। বেয়াই সাহেব যখন রসুলপরে আসছেনই না, তখন আরিফই নিয়ে যাক বউমাকে।

মীর-বেগম : এ ব্যবস্থাতে কাজ হতে পারে। বউমাকে না দেখে গোখ্‌রো দু'টি বিদায় নিতে পারে। তাহলেই সব রক্ষা পায়।

আরিফ : তুমি তৈরী হয়ে নাও জোহরা।

জোহরা : (ভগ্ন কণ্ঠে) আমি তো তৈরী হয়েই আছি।

আরিফ : এদিক ওদিক তাকিয়ে কি খুঁজছ? তোমার পদ্ম-গোখ্‌রোকে?

জোহরা : তুমি পাল্কীর কাছে যাও, আমি আসছি।

আরিফ : যাচ্ছি, দেরী করো না। (চলে যায়)

জোহরা : (আপন মনে) জানি, আমি চলে যাচ্ছি বলে তোরা কাছে আসবি না। কিন্তু না গিয়ে আমার উপায় কি বল্! আসি বাবারা। দেখিস, কারও কোন ক্ষতি করিস না যেন!

(গাভীর ডাক। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যায়
পাগলা ফকীরের গান–)

ফকীর : সস্র বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত রে
একই মায়ের পুত।।

(সৈয়দ বাড়ী। কথা বলছেন সৈয়দ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী)

সৈয়দ : এই যে, শুনছ? কোথায় গেলে? জলদি এস।

(কাছে আসতে আসতে)

বেগম : কেন, কি হয়েছে? এত ডাকাডাকি কেন?

সৈয়দ : ওই যে দেখ, কারা আসছে?

বেগম : ও মা, রসুলপুরের মেয়ে-জামাই আসছে যে!

www.pathagar.com

সৈয়দ : কিন্তু কথা নাই, বার্তা নাই — হঠাৎ এই গরীবের বাড়ীতে মেয়ে-জামাই?

বেগম : আগায়ে যান। এসেই গেছে যখন, বরণ করেন।

সৈয়দ : হ্যাঁ যাচ্ছি। দেখ দেখি — কথা নাই, বার্তা নাই — কি বিপদ!

(বলতে বলতে চলে যায়)

বেগম : নিজেরা খেতে পাই না, তার মধ্যে আবার মেহ্‌মান! ভাঙ্গা ঘরদোর, এখন মেয়ে-জামাইকে কোথায় রাখি!

(কথা বলতে বলতে আসে আরিফ ও সৈয়দ সাহেব)

আরিফ : হঠাৎই চলে আসতে হল আব্বাজান। আম্মা-আব্বা বললেন- অনেকদিন আপনাদের মেয়ে বাপের বাড়ীতে যায় না, তুমিই নিয়ে যাও আরিফ।

সৈয়দ : খুব ভাল করেছ বাবা, খুব উত্তম কাজ করেছ। তোমাদের জন্য মনটা সব সময় পোড়ে! এসে খুব ভাল কাজ করেছ।

আরিফ : আপনাদের মেয়ে এখানে কিছুদিন থাকবে। আমাকে আবার আজকেই চলে যেতে হবে। কলকাতায় আমার অনেক কাজ!

বেগম : সে কি বাবা! এসেছ, কয়েকদিন থাকবে — তবে তো! আজকেই চলে যাবে কি!

আরিফ : জ্বি না, কাজের চাপ এত বেশি যে না গিয়ে উপায় নেই। আমি প্রতি শনিবারেই আসব।

সৈয়দ : আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে। এখন একটু বিশ্রাম কর তো! যেতে হয়, পরে যেয়ো। ওগো, মেয়েকে নিয়ে যাও। কতদিন পরে এল!

বেগম : তোর শরীরটা ভাল আছে তো জোহরা?

জোহরা : আছে কোন রকম। আপনাদের সব কুশল তো?

বেগম : আমাদের আবার কুশল! তা বেয়াই-বেয়াইন কেমন আছেন? শুনলাম তাদের খুব সুখের দিন আজকাল? — এই যে, শুনছ? জোহরা, জামাই বাবাজী আজকেই কলকাতায় চলে যাবেন - মানে —

জোহরা : তার অনেক কাজ সেখানে।

বেগম : আমাদের গরীবী হালত দেখে আবার —

www.pathagar.com

জোহরা : না না আম্মা, সেসব কিছু নয়।

বেগম : তোর মরা যমজ সন্তান দু'টির কথা মনে পড়ে। এত সুখের মধ্যে কত বড় দুঃখ যে তুই পেলি রে মা!

(বলেই কাঁদতে আরম্ভ করে)

জোহরা : আমি আপনাদের জামাইর কাছে যাই। (চলে যায়)

সৈয়দ : এই যে, আবার কান্নাকাটি কেন!

বেগম : (হঠাৎ কান্না থামিয়ে) দেখেছ, জোহরার সারা গায়ে কত অলঙ্কার?

সৈয়দ : হ্যাঁ, বলা যায় — স্বর্ণভূষণে স্বর্ণকান্তি মেয়ে আমার বাপমায়ের ভাঙ্গা ঘরে বেড়াতে এল।

বেগম : অথচ বিয়ে দিলাম এক নিরাভরণ কন্যাকে!

সৈয়দ : একেই বলে কপাল বেগম, একেই বলে কপাল।

বেগম : অথচ আমাদের কপাল যে-কে সেই!

সৈয়দ : কুতুবপুরের ভাঙা কপাল। জোড়া লাগাতে চাইলেও লাগে না!

মীর-বেগম : আমি শুধু সাপ দুটোর কথাই ভাবছি। বউমা বাড়ীতে নেই, সাপ দুটোও যেন তাই বেচইন হয়ে পড়েছে। এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে। খুঁজছে ওরা বউমাকে। সেদিন দুধের বাটি রাখা হল উঠানে। বাটির কাছ দিয়েই গেল সাপ দুটো, কিন্তু কিছুতেই মুখ লাগালোনা দুধের বাটিতে।

মীর সাহেব : সাপ যে মানুষের বাচ্চার মত এমন ব্যবহার করতে পারে, ভাবতেই পারি না! ভাবছি, বউমার সময় সেখানে কাটছে কি করে!

বেগম : শোনেন, জোহরাকে নিয়ে তো খুবই মুস্কিলে পড়া গেল!

সৈয়দ : কেন, জামাইর সঙ্গে কোন কিছু হয়েছে নাকি?

বেগম : জিজ্ঞেস করেছিলাম। সেরকম কিছুর আভাস তো পেলাম না! জমাইও প্রতি হপ্তায় আসছে, আবার চলে যাচ্ছে কলকাতায়। এদিকে খাওয়া-দাওয়া বলতে কিছুই করছে না জোহরা। কোন রকম রোগ-বেরামের কথাও তো স্বীকার করে না। অথচ দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

সৈয়দ : সেই মরা সন্তানদের শোকই পেয়ে বসেছে কি না, কে জানে!

www.pathagar.com

বেগম : সেদিন বললে — বাড়ীতে আমার খোকাদের ফেলে এসেছি তো, তাই মন কেমন করে আম্মা!

সৈয়দ : খোকাদের ফেলে এসেছে? ও! সেই মরা দুই যমজ-সন্তান!

বেগম : আমাদেরই সংসার চলছে না, তার মধ্যে জোহরার এই অদ্ভুত খেয়াল! এমন করে চুপচাপ বসে না থেকে কিছু একটা করা উচিত। প্রায় হাজার বিশেক টাকার অলঙ্কার খুলে বাক্সবন্দী করে রেখেছে। চোর-ডাকাত আছে — আমার কিন্তু চিন্তার শেষনেই!

সৈয়দ : হ্যাঁ, চিন্তা তো আমারও! আমার এ ভাঙ্গা বাড়ীতে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার!

বেগম : যাক, আজই আবার জামাই আসবে কলকাতা থেকে।

আরিফ : তোমার ওই নতুন দুই খোকার খবর সৈয়দ বাড়ীতে জানাজানি হয়েছে নাকি?

জোহরা : না, আমার পদ্ম-গোখ্‌রোদের কথা কুতুবপুরের কেউ জানে না।

আরিফ : শুনলাম, খাওয়া-লওয়া করছ না বললেই চলে। কি ব্যাপার, সাপের মায়ের আত্মহত্যার ইচ্ছা আছে নাকি?

জোহরা : আমার মনের যে ব্যথা, তা তো তুমি বুঝতেই চাইছ না। শোন, গত রাতে স্বপ্ন দেখলাম - রাতে প্রদীপ হাতে আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে, যেখানে কবরে শুয়ে আছে আমাদের সেই যমজ সন্তানেরা। কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ধরেছে। সেসব ফুল ঝরে পড়ে মাটিতে। লালবরণ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে সেই দুটো ছোট্ট কবর! হঠাৎ শুনি 'মা, মা' বলে কারা যেন ডাকছে! কবর দুটোর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখি — কবর জড়িয়ে আমার পদ্মগোখ্‌রোরা!

আরিফ : হুঁম্ — শ্বশুর সাহেব বলেছেন — এখানে থাকতে তোমারও মন বসছে না, আর বুঝতে পারি — অভাবের সংসারে তাঁদেরও কষ্ট হচ্ছে। তাই তোমাকে কলকাতায় বা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চাই। তাই স্থির করলাম — কাল সকালেই তোমাকে নিয়ে কলকাতা রওনা দেব।

www.pathagar.com

জোহরা : কলকাতায় না গিয়ে বাড়ীতে গেলে হয় না?

আরিফ : না। প্রথমে চিকিৎসা, তারপর বাড়ীতে।

জোহরা : তাতে কতদিন কেটে যাবে, কে জানে!

আরিফ : রাত অনেকটা হল, শুতে হবে।

জোহরা : আমার চোখেও আজ অনেক ঘুম!

(অদূরে রাতের প্রহর ঘোষণা করে শেয়ালেরা। থমথমে একটা আবহ। যেন কোন অমঙ্গল সংঘটিত হতে চলেছে। হঠাৎ ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হয় একটা, বাক্স খোলার মৃদু আওয়াজ। আরিফের কণ্ঠে ঘুম জড়ানো প্রশ্ন "কে?" — কোন উত্তর নেই। দরজায় খট্ করে শব্দ হয়। কারা যেন বেরিয়ে যায়। — ভোরের পাখী ডেকে ওঠে। পাখীর কিচির মিচির)

আরিফ : জোহরা! ভোর হয়ে এসেছে, ওঠ।

(তখনই অদূরে শাশুড়ীর আর্তনাদ —)

বেগম : চোর, চোর এসেছিল। আমাদের সর্বস্ব নিয়ে গেছে। ওরে, তোরা সবাই জেগে দেখ্।

আরিফ : থাক আম্মা, আমি রাতেই জেগে উঠেছিলাম। চোর যখন গহনার বাক্স খোলে, তখনই।

(মুহূর্তে সব চুপচাপ)

জোহরা : কি, কি হয়েছে?

আরিফ : তোমার বিশ হাজার টাকার গহনা চুরি গেছে। সব কিছুই অস্পষ্ট, তবু মনে হয়, চোরকে আমি চিনতে পেরেছি। ঠিক আছে। ঝট্‌পট্ তৈরী হয়ে নাও। কলকাতার ট্রেন ফেল্ না করি।

জোহরা : অস্পষ্টভাবে হলেও চোরকে তুমি চিনতে পেরেছ? কে সেই চোর?

আরিফ : সব কথা নাই বা শুনলে! আমরা এখ্খুনি রওনা দেব।

সৈয়দ : (আসতে আসতে) না বাবা, কিছু মুখে না দিয়ে তোমাদের কিছুতেই যেতে দেব না!

আরিফ : এর পর কিছু খেতেও হবে? ঠিক আছে। কি খেতে দেবেন, দিন। খেয়েই যাব।

সৈয়দ : আসছি। খানিক অপেক্ষা কর বাবা, এই কিছুক্ষণ!

(বলতে বলতে চলে যান)

www.pathagar.com

জোহরা ঃ আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

আরিফ ঃ আর বুঝতে চেষ্টা করো না জোহরা। তাতে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে।

জোহরা ঃ সে–আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে না মনে কর?

(সঙ্গে সঙ্গে মিউজিক ক্রাশ হয়। ড্রামে আঘাত পড়ে, বার বার। এর মধ্যেই আরিফের বমি করার শব্দ শোনা যায়। জোহরার আর্তনাদ – **"ওরে খোকারা, তোরা কই রে?"** তারপর হঠাৎ করেই সব চুপচাপ)

বেগম ঃ (ফিস্ ফিস্ কণ্ঠে) এখন? এখন কি হবে?

সৈয়দ ঃ (তেমনি নিম্ন কণ্ঠে) কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।

বেগম ঃ (ফিস্ ফিস্ কণ্ঠে) বমি করতে করতে আরিফ চলে গেল কলকাতায়। তিন দিন হয়ে গেল পানিও স্পর্শ করছে না জোহরা। তার এক কথা – এই কুতুবপুরে আর না! আমাকে পাঠিয়ে দাও রসুলপুরে।

সৈয়দ ঃ রিপু আমাকে তাড়না করছে। কি করব, কিছুই বুঝতে পারছি না! জোহরাকে পাঠিয়েই দেব, আজই।

(তখনই ভাঙ্গা গলায় ডাক দেয় পাগলা ফকীর–)

ফকীর ঃ সৈয়দ সা'ব ঘরে আছেন? সৈয়দ সা'ব!

সৈয়দ ঃ কে? কে ডাকছ?

ফকীর ঃ পাগলা ফকীর! ধারাকান্দার পাগলা ফকীর!

সৈয়দ ঃ আসছি। (কাছে এসে) সৈয়দ সা'ব বলে ডাকছ তুমি। জানি না, কোন্ রকমের সৈয়দ আমরা — আসলে সৈয়দ কি না, তাও জানি না। তবে —

ফকীর ঃ লোকে বলে।

সৈয়দ ঃ হুঁম্। বড়ই অস্থির আছি ফকীর। ভাবছি, সব ছেড়ে ছুড়ে মক্কায় চলে যাব– সস্ত্রীক।

ফকীর ঃ সস্ত্রীক? অনেক টাকা লাগবে যে!

সৈয়দ ঃ লাগলেও যেতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল ওই জোহরাকে নিয়ে। রসুলপুরে না গিয়ে সে কিছুই মুখে দেবে না। কিন্তু জামাই চলে গেল —

www.pathagar.com

ফকীর : কাকে দিয়ে পাঠাবেন মেয়েকে? আমি, আমি আছি। আমি যাব পালকীর সঙ্গে। দিয়ে আসব রসুলপুরের পয়মন্ত বউকে!

সৈয়দ : হ্যাঁ, তা–ই কর। একটা পালকী ডেকে আন।

ফকীর : যাচ্ছি।

(চলে যায় ফকীর, আসে বেগম)

বেগম : যাক, শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা হল। রসুলপুরে আজই যাচ্ছে জোহরা।

মীর–বেগম : এ–কি! আরিফ কলেরার ধকল কাটিয়ে বাড়ীতে এল কলকাতা থেকে, আর তুমি বউমা কুতুবপুর থেকে পালকীতে? কিন্তু দু'জনই যে মরতে মরতে ফিরে এসেছ মনে হয়!

জোহরা : এই ছয় মাস আমার মনে কোন শান্তি ছিল না আম্মা!

মীর সাহেব : যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর। কথাবার্তা পরে হবে।

মীর–বেগম : ওই দেখ, বউমা আসতে না আসতেই ওই দুটো এসে হাজির।

মীর সাহেব : সঙ্গে সঙ্গে বউমা চলল রান্নাঘরে, দুধ আনতে। ওদের হাত থেকে আমাদের আর রক্ষা নেই মীর–বেগম!

(গভীর রাত। কথা বলছে জোহরা ও আরিফ)

জোহরা : এত বড় লজ্জা আমি কোথায় রাখি বল!

আরিফ : লজ্জা কি তোমার একার, আমার নয়?

(তখনই শোনা যায় রাহাতনের চীৎকার–)

রাহাতন : ও মা গো, ভূত! জ্বিন–ভূত!!

আরিফ : কি হল? রাহাতন!

(অদূরে শোনা যায় সৈয়দ সাহেবের কণ্ঠ —)

সৈয়দ : খেল রে! সাপে খেয়ে ফেলল!!

(সঙ্গে সঙ্গে লাঠির আঘাত, একটার পর একটা)

ওরে জোহরা! মা!!

আরিফ : জোহরা, তোমার আব্বার গলা?

জোহরা : সাপ! তাহলে আমার খোকারা —

(লাঠির আরও আঘাত এবং সৈয়দের গোঙানি)

আরিফ : চল জোহরা, জলদি!

(দরজা খোলার শব্দ। ওদিকে মীর সাহেবের কণ্ঠ —)

মীর সাহেব : কে কোথায় আছ — শিগগীর!

www.pathagar.com

ফকীর : (কাছে আসতে আসতে) কি ব্যাপার? এই রাইতের আন্ধাইরে —

জোহরা : কই আমার আব্বা? আমার খোকারা কই? আমার পদ্ম-গোখরোরা? আমার খোকারা —

আরিফ : জোহরা! একি— আব্বা! জোহরা অজ্ঞান হয়ে পড়ল যে!

(নীরবতা। শুধু করুণ সুর)

মীর সাহেব : এই যে, জ্ঞান ফিরেছে! বউমা!

আরিফ : জোহরা!

জোহরা : (ভগ্ন কণ্ঠে) আমার খোকারা? কই ওরা?

আরিফ : সব শেষ জোহরা। ফকীরের কথায় বুঝতে পারছি — মক্কা যাওয়ার আগে তোমার আববা আসছিলেন আমাদের গোপনে দেখে যেতে। আঙিনায় ঢুকতেই তাঁকে আক্রমণ করে তোমার পদ্মগোখ্‌রোরা। তাদের উপর পড়ে তোমার আব্বার লাঠির আঘাত — একের পর এক। পদ্মগোখ্‌রোরা মরেছে, কিন্তু প্রাণহীন করে দিয়ে গেছে তোমার আব্বাকে। — আম্মা, জোহরা আবার অজ্ঞান হয়ে গেল যে!

মীর-বেগম : বউমা!

(গাঁয়ের পথ। নিম্ন কণ্ঠে কথা বলছে করিম ও হাকিম)

করিম : মীর বাড়ীতে যে মড়ক লেইগেছে হাকিম!

হাকিম : হ্যাঁ, মীর সায়বের বেয়াই মরলেন সাপের কামড়ে। সাপও মরল লাঠির আঘাতে।

করিম : আর এসব মরণ দেইখে মীর বাড়ীর বউ সেই যে অজ্ঞান হইল, জ্ঞান আর ফিরে এল না!

হাকিম : ভোর হতে না হতেই পাগলা ফকীর গ্রামে রাষ্ট্র কইরে দিল — মীরদের সোনার বউ এক জোড়া মরা সাপ প্রসব কইরে মারাগিয়েছে।

করিম : অবাক কান্ড রে ভাই, অবাক কান্ড!

www.pathagar.com

। এক ।

মাটি ও মানুষের কথা

'বাঙ্গালাদেশের জন্মকথা' শিরোনামের প্রবন্ধে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেনঃ "অচিন্তনীয় মহাশক্তির অভাবনীয়, অবর্ণনীয়, অবোধ্য, বিক্ষোভের ফলে সূর্যমন্ডলের ঘুর্ণমান বিশাল নীহারিকা হইতে যেদিন আমাদের এই পৃথিবী বিরাট অগ্নিগোলকরূপে ছুটিয়া বাহির হইল এবং লাটিমের মত ঘুরপাক খাইতে খাইতে সূর্যমন্ডল প্রদক্ষিণ কার্যে লাগিয়া গেল, পৃথিবীর ইতিহাস সেই দিন হইতে আরব্ধ হইয়াছে। মহাশূন্যে সহস্র সহস্র বৎসর তাপ ছড়াইতে ছড়াইতে ক্রমশঃ এই অগ্নিগোলকের উপরভাগ জমিয়া শক্ত হইয়া উঠিল, নিম্নভূমিতে জলীয়বাষ্প জমিয়া স্থানে স্থানে দিগন্ত বিস্তৃত মহাসাগর গড়িয়া উঠিল। কতকাংশে কঠিন, প্রস্তরময়, জীবনের চিহ্নমাত্রশূন্য সীমা-পরিসীমাহীন মহাসাগর, এই বৈচিত্র্যহীন রূপই আমাদের এই জীবধাত্রী সুজলা-সুফলা তৃণবনরাজিশ্যামলা পৃথিবীর আদি রূপ।" (বাঙ্গালাদেশের জন্মকথা, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২, পৃঃ ৯৮)।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যানুযায়ী, তারপর হল পর্বতাদি-নদ-নদীর সৃষ্টি। ভূগর্ভস্থ আগুন নানা কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠে এখানে-সেখানে গড়ে তুলল পর্বত শ্রেণী। আর সলিলধারা উৎস রূপে পাহাড়ের গা বেয়ে কখনো প্রস্তরাদি ভেদ করে প্রবাহিত হল নীচের প্রান্তর অতিক্রম করে করে সাগরের পানে। উচ্চ পর্বত চুড়ায় জমল বরফ। গ্রীষ্মে তা-ই গলে গলে উৎসের জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করল নদী-শাখানদী-নদীনালা। সূর্যের তাপ ও তাপের অভাবে শৈত্য এবং প্রবহমান জলস্রোতের বেগ তিলে তিলে পাহাড় ক্ষয় করে করে বালি-ধূলি ও কাদার সৃষ্টি করতে লাগল। বাতাসে উড়ে এসে অথবা জলস্রোতের সঙ্গে নীচের প্রস্তরময় প্রান্তরে নেমে এসে তা পাথরের উপর দিতে লাগল প্রলেপ, মাটির প্রলেপ। এভাবেই ক্রমে গড়ে উঠল ভূ-পৃষ্ঠের মাটি, মাটির পৃথিবী।

কিন্তু এই মাটিতে কি করে জন্মাল বৃক্ষাণু আর পানিতে জীবাণু, তার রহস্য আজও রহস্যই রয়ে গেছে। 'The truth is that no one knows how life began in a lifeless world. It is one of the great unsolved wonders of creation, how a world which was a desert could become a flowering garden. সত্য হল এই যে,

www.pathagar.com

কেউ জানে না কি করে প্রাণহীন এই পৃথিবীতে হল প্রাণের সঞ্চার! এ হচ্ছে সৃষ্টির অমীমাংসিত বিস্ময়সমূহের অন্যতম এক বিস্ময়— কি করে মরুসদৃশ এক পৃথিবী হয়ে যেতে পারল এক ফুলন্ত উদ্যান!" (The Modern Encyclopedia for Young People, New York, 1935)। বৈজ্ঞানিকদের অভিমতঃ লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে সেই বৃক্ষাণু থেকে নানাবিধ উদ্ভিদের বিকাশ সম্ভব হয়েছে, আর সেই জীবাণু থেকে উদ্ভব ঘটেছে মানবাদি অসংখ্য জীবের ও প্রাণীর।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তসমূহ আল-কুরআনের এ-সম্বন্ধীয় ভাষ্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল-কুরআনের সেই ভাষ্য হচ্ছেঃ "বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য যাহারা ইহার অনুসন্ধান করে।" (কুরআনুল করীম, সুরা হা-মীম, আস্-সাজ্‌দা, আয়াত ৯-১০, ইসলামিক একাডেমী, পৃঃ ৯১৬-১৭)।

এখানে উল্লেখ্য যে, তফসীরকারীদের ব্যাখ্যানুযায়ী কুরআনুল করীমে উল্লেখিত এক 'দিন' আমাদের পার্থিব সময়জ্ঞাপক হাজারো বছরের সমান।

অবিশ্যি, আল-কুরআনের ওপর বিশ্বাসীদের কাছে এসব রহস্য আর রহস্য নয়; এসব হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র কুদরত। উপরিউক্ত আয়াতে 'পৃথিবীতে রাখিয়াছেন কল্যাণ' বলতে উদ্ভিদ-জীবজন্তু ইত্যাদিই বুঝানো হয়েছে; আর খাদ্যের ব্যবস্থা করার কথা তো বলা হয়েছে স্পষ্টই।

ভূ-তত্ত্ববিদগণ হিসাব করে দেখেছেন, আনুমানিক ১০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। এ সম্বন্ধে মতান্তরের অভাব নেই। The Modern Encyclopedia for Young People-এ বলা হয়েছে ১৫ কোটি বছরের কথা। বয়সের হেরফের ঘটলেও এ কথা সত্য যে, সুপ্রাচীনকালের বহু মহাদেশ ডুবে গেছে সমুদ্রগর্ভে, আর সমুদ্রগর্ভ উন্নীত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে অনেক মাটির দেশ অথবা সুউন্নত গিরিমালা।

ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানে বর্তমান বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান অবস্থিত, ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে তা ছিল অধুনালুপ্ত সুপ্রাচীন গন্ডোয়ানা মহাদেশের অন্তর্গত। "এককালে এই বিশাল মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া হইতে বর্তমান আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অখন্ড ভূভাগরূপে বিস্তৃত ছিল। তখন ভারত মহাসাগরের অস্তিত্ব ছিল না, বর্তমান ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার মধ্যস্থিত আরব সাগরও শুষ্ক ভূমিরূপেই বিরাজ করিত। এই বিস্তৃত মহাদেশের দক্ষিণে ছিল দক্ষিণ মেরুসাগর। হিমালয়

www.pathagar.com

পর্বত তখন পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। এই মহাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতের অবস্থান ভূমি এবং তিব্বতাদি দেশ জুড়িয়া এক সাগর বর্তমান ছিল। ভূ-তত্ত্ববিদগণ এই সাগরের নাম দিয়াছেন টেথিস।" (বাঙ্গালাদেশের জন্মকথা, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫২, পৃঃ ৯৮)।

ভূ-পৃষ্ঠের স্তর গঠন পর্যবেক্ষণ করে ভূ-তত্ত্ববিদগণ প্রাণীকুলের বিবর্তন চিহ্নাঙ্কের অনুসরণে ওই স্তর গঠনকালকে তিন যুগে বিভক্ত করেছেন। যে স্তরে আদিম জীবের চিহ্নাঙ্ক পাওয়া যায়, তার গঠন যুগের নাম প্রত্নজীবক। তার পরবর্তী গঠন যুগের নাম মধ্যজীবক এবং তারও পরবর্তী বর্তমান পর্যন্ত চলমান গঠন যুগের নাম নব্যজীবক। এই স্তর গঠনের তিনটি যুগ আবার কতিপয় উপযুগে বিভক্ত। প্রত্নজীবক গঠন যুগ সাতটি, মধ্যজীবক তিনটি এবং নব্যজীবক সাতটি উপযুগে বিভক্ত।

মধ্যজীবক যুগের শেষদিকে ভূ-পৃষ্ঠে এক প্রচন্ড প্রলয় ও পরিবর্তনের চিহ্ন ভূ-তত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার করেছেন। "এই মহাপ্রলয়ে ভূগর্ভে গলিত ধাতু প্রস্তরাদি উৎক্ষিপ্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের বিশাল মালভূমির সৃষ্টি করিল। কচ্ছ, কাঠিয়াবার, গুজরাট এবং মধ্য-ভারতের পর্বতমালাও এই মহাপ্রলয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে বিন্ধ্য, পশ্চিমঘাট, নীলগিরি ও পূর্বঘাট পর্বতমালা বেষ্টিত দাক্ষিণাত্যের জন্ম হইয়াছিল। ইহার পূর্বেই পৃথিবীতে জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বিবর্তিত হইতে হইতে এই যুগের শেষে স্তন্যপায়ী জীব ধরা পৃষ্ঠে আবির্ভূত হইল।

"দাক্ষিণাত্য গঠনের পর হাজার হাজার বৎসর চলিয়া গেল, ধরিত্রী স্থিতি লাভ করিল। নব্যজীবক যুগের প্রথম উপযুগে কিন্তু আবার ভূ-পৃষ্ঠ মহাপ্রলয়ে দুলিয়া উঠিল। এই ভয়ানক বিপ্লবে গন্ডোয়ানা মহাদেশ ভাঙ্গিয়া খন্ড খন্ড হইয়া গেল। উহার অনেকাংশ সাগরে ডুবিয়া গেল। অস্ট্রেলিয়া সমুদ্র বেষ্টিত পৃথক মহাদেশে পরিণত হইল। পূর্বাংশের উন্নততর ও স্থিরতর স্থানগুলিই শুধু বোর্ণিও, শেলেবেস, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় উপদ্বীপ ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করিয়া সমুদ্র জলের উপর মাথা তুলিয়া থাকিতে সমর্থ হইল। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের গঠনে ভারতবর্ষ ইহার বর্তমান ত্রিকোণাকৃতি প্রাপ্ত হইল। আফ্রিকা মহাদেশ আরব সাগরের জলদ্বারা ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইয়া গেল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়জনক পরিবর্তন হইল গন্ডোয়ানা মহাদেশের উত্তরাংশে। যে মহাপ্রলয়ের অভাবনীয় শক্তিতে গন্ডোয়ানা মহাদেশের দক্ষিণাংশ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া বর্তমান রূপ পাইল, সেই শক্তিই আবার টেথিস মহাসাগর গর্ভকে উপর দিকে টানিয়া তুলিল। যেখানে সাগর ছিল দেখিতে দেখিতে সেখানে বিরাট পর্বতশ্রেণী

www.pathagar.com

মাথা তুলিল, ইহারই নাম আমরা রাখিয়াছি হিমালয় পর্বত। একটা চারাগাছকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিলে যেমন নানা দিক হইতে চড়চড় করিয়া মাটি ভাঙ্গিয়া তাহার আস্ত শিকড় দুই-চারিটি উঠিয়া পড়ে, হিমালয়ের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আসাম ও আফগানিস্তানের পর্বতমালাও তেমনি করিয়া মাথা তুলিয়াছিল।" (পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯)।

এই হিমালয়ের উত্থানকালে আরও এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল- সেটা দাক্ষিণাত্যে। সে সময়কার ভূ-বিপ্লবে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিটি শুধুমাত্র স্থিতিবানই রয়ে গেল না, সেটা বরং আরও উঁচু হয়ে গেল। আর সে মালভূমির অব্যবহিত উত্তরে ও হিমালয়ের পাদমূল থেকে দক্ষিণে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে এক সুদীর্ঘ বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হল। এই গহ্বর প্রথম অবস্থায় পরিপূর্ণ হল সমুদ্রের পানিতে। কালক্রমে হিমালয় থেকে এবং পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণের পর্বতমালা থেকে আবির্ভূত নদীসমূহের বয়ে আনা প্রতি বছরের বালি-কাদা জমে জমে ভরে যেতে থাকল সেই বিরাট সুদীর্ঘ গহ্বরটি। এভাবে লক্ষ লক্ষ বছরের পলিমাটিতে জেগে উঠল মানুষের বাসযোগ্য মাটির সমতল— পশ্চিমে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ, পূর্বে যুক্তপ্রদেশ-বিহার-বাংলা-আসাম ও শ্রীহট্ট। ভূ-তত্ত্ববিদগণ হিসাব করে দেখেছেন, গড়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরে এক ফুট পলিমাটি জমে ওঠে। "কলিকাতা অঞ্চলে নীচে হাজার ফুট খুঁড়িয়া এবং যুক্ত প্রদেশে ১৩০০ ফুট খুঁড়িয়াও এই গহ্বরের প্রস্তরময় তলদেশ পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালা ইত্যাদি দেশের গঠনকার্য আনুমানিক ১০০০ X ৪৫০০= ৪৫,০০,০০০ অর্থাৎ মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া চলিতেছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের; সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, রূপনারায়ণ, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রাহ্মণীর; কৌশিকী, কালিন্দী, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়া, ত্রিস্রোতার; সুরমা, কে'শিকা, মেঘনাদ, গোমতী, ফণীর প্রাণঢালা দানে পুষ্ট, সমবেত চেষ্টায় গঠিত আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ। (পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯-১০০)।

এই যে বাঙ্গালা, বাঙলা বা বাংলা নামের জনপদ, শুধুমাত্র এই জনপদের মাটির গঠনই নয়, তার মানুষ ও সেই মানুষের মন-মানসের গঠন কাজও চলে আসছে সেই কোন্ সুদূরের কাল থেকে! কলকাতা অঞ্চলে ১০০০ ফুট খুঁড়েও অর্থাৎ ৪৫ লক্ষ বছরের সীমানায়ও বাঙ্গালা নামক জনপদের প্রস্তরময় তলদেশ পাওয়া যায়নি; তেমনি যুক্তপ্রদেশেও পাওয়া যায়নি ১৩০০ X ৪৫০০= ৫৮,৫০,০০০ অর্থাৎ সাড়ে আটান্ন লক্ষ বছরেরও আগের প্রস্তরময় তলদেশ!

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে যে আশ্চর্য ঘটনাবলীকে আবার আমরা স্মরণ করতে পারি তা হচ্ছেঃ এ যাবত ভূ-পৃষ্ঠে দু'বার প্রচন্ড আলোড়ন-বিপ্লব

www.pathagar.com

সংঘটিত হয়েছে। প্রথমবার মধ্যজীবক যুগের শেষদিকে এবং দ্বিতীয়বার নব্যজীবক যুগের প্রথম উপযুগে।

প্রথম আলোড়ন-বিপ্লবে উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন উৎক্ষিপ্ত পর্বতমালা বেষ্টিত দাক্ষিণ্যাত্যের; এবং দ্বিতীয় আলোড়ন-বিপ্লবে অস্ট্রেলিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত অখন্ড বিশাল ভূ-ভাগ খন্ড খন্ড হয়ে সাগর দ্বারা বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এ উপমহাদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত তখনকার টেথিস সাগর থেকে উত্থিত হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়। আর এই হিমালয় থেকে প্রবাহিত সলিল স্রোতবাহিত কাদামাটি-পলিমাটিরূপে জমে জমে বহু লক্ষ বছরে গড়ে ওঠে 'বাঙ্গালাদেশের' মাটি। নব্যজীবক যুগের পরিবর্তন ধারায় বাঙলার মাটির গঠন কাজ কিন্তু আজ পর্যন্তও চলে আসছে এবং ধারণা করা যায় আরও বহু বছর ধরে চলবে। নদীগুলো দীর্ঘকাল ধরে যেখানে প্রবাহিত হয়, সেগুলোর ধারাবাহিত বালি-কাদা দিনের পর দিন স্থিতি লাভ করতে করতে সেই খাত উঁচু হয়ে যায়। নদীধারা তখন খুঁজে নেয় নতুন কোন খাত। এভাবে বারবার খাত পরিবর্তনের ফলে নদী-বিধৌত জনপদ ক্রমে উঁচু হয়ে ওঠে, আর সাগর-মোহনায় ব-দ্বীপের গঠনে সাগর সৈকতও সরে যেতে থাকে ক্রমশঃ। এ প্রক্রিয়াতেই লাখো বছর ধরে গঠিত হয়েছে বাঙলার মাটি। নব্যজীবক যুগে এই গঠন প্রক্রিয়া কখনও তেমন ব্যাহত হয়নি। অবিশ্যি, কয়েকটি বড় ভূমিকম্প এই জনপদকে খানিকটা নাড়া দিয়ে গেছে এর মধ্যে। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এক ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র থেকে ভাগীরথী পর্যন্ত এক রেখায় বঙ্গোপসাগর উত্তর তীরের একাংশ কিছুটা বসে যায়। ফলে, ফরিদপুর-যশোহর-খুলনা-চব্বিশ পরগনা জুড়ে পূর্ব-পশ্চিমে সৃষ্টি হয় বড় বড় আকারের নিম্নভূমি বা বিল-বাঁওড়। তবে, নব্যজীবক যুগের প্রারম্ভে হিমালয় এবং পূর্ব-পশ্চিমের গিরিশ্রেণী উন্নীত হয়ে আর বঙ্গোপসাগর-আরব সাগর অবনমিত হয়ে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা গঠিত হওয়ার পর ভূ-পৃষ্ঠে আর সাধিত হয়নি তেমন উল্লেখযোগ্য প্রচন্ড কোন আলোড়ন-বিপ্লব, সংঘটিত হয়নি তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন।

পলিমাটি জমে জমে বাঙলার যে মাটি গঠিত হল, ভূ-তাত্ত্বিকদের বিচারে তা প্রাচীন পলি, মধ্যপলি ও আধুনিক বা নব্যপলি- এই তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম ও উত্তর বাঙলার অধিকাংশ স্থান এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহের ভাওয়াল ও মধুপুর জঙ্গল প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত, নদীমুখের ব-দ্বীপগুলো গঠিত আধুনিক বা নব্য পলিতে এবং মধ্য পলিতে গঠিত বাঙলার বাকী অংশ। বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পাহাড় এবং ত্রিপুরার সমতলে স্থিত লালমাই-ময়নামতি পাহাড় শ্রেণী পলি গঠিত মাটির চাইতেও প্রাচীনতর। চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চল,

www.pathagar.com

সিলেটের দক্ষিণাংশের কিছু উৎক্ষিপ্তাংশ ও সিলেট–ছাতক পাহাড় অঞ্চলও এই প্রাচীনতর পলি গঠিত মাটির অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষেপে বাঙলার মাটির জন্মকথার বিবরণ কিছুটা দেয়া হল। নব্যজীবক যুগের পঞ্চম উপযুগে এই মাটিতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল বলে পন্ডিতদের বিশ্বাস।

আমাদের এই উপমহাদেশটিতে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল কবে? উত্তরটা প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। বস্তুত ভূ–তত্ত্বের কারবার লাখো বছর নিয়ে হলেও প্রত্নতত্ত্বের মূলধন কোন দেশেই হাজার দশেক বছরের বেশি নয়। ডক্টর ভট্টশালীর মতে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় লুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে ভারতবর্ষে বহিরাগত আর্যদের আগমনকাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। সেইকাল ২০০০ খৃষ্ট–পূর্বাব্দের বেশি আগে নয়। তদনুসারে এই উপমহাদেশটিতে সভ্যতার বয়স সাত হাজার বছরের মত হবে।

আর বাঙলা নামের জনপদটিতে উন্মেষিত সভ্যতার বয়স? আদিম মানব সভ্যতার বিবর্তন ধারায় প্রথমে এল প্রত্নপ্রস্তর ও পরে নব্যপ্রস্তর যুগ। সভ্যতা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ অগ্নি উৎপাদনের কৌশল জানল, মাটি পুড়িয়ে পাত্র বানাতে শিখল এবং অভ্যস্ত হল রন্ধন প্রণালীতে। ’

অতঃপর এল তাম্রযুগ। ধাতুর আবিষ্কারে মানুষ তা দিয়ে বানাতে শিখল অস্ত্র। এগিয়ে চলল মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা। এই বাঙলার মানব সভ্যতার বিবর্তন ধারার প্রমাণও পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা মতে, বাঙলার দক্ষিণ–পূর্ব ভাগ ছাড়া বাদবাকী অংশে প্রস্তর ও তাম্র যুগে মানুষের বসতি ছিল। দক্ষিণ–পূর্ব ভাগ গঠিত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের পলি মাটিতে। সে মতে বাঙলায় সভ্যতার ইতিকথাও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমসাময়িক বলে ধরে নেয়া যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পরবর্তীতে বাঙলা নামে অভিহিত এই জনপদবাসীরা জ্ঞাতিসূত্রে আবদ্ধ ছিল দক্ষিণ ভারতের, বিশেষ করে সিন্ধুর, দ্রবিড়ভাষী তামিলদের সঙ্গে।

পলিমাটিতে গড়ে ওঠা এই যে আমাদের জনপদ, এই যে আমাদের মাটি, কারা ছিল এই মাটির আদি বাসিন্দা? সেই আদি বাসিন্দাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ‘ভেড্ডিড’ বলে এখন সর্বস্বীকৃত। সিংহলের ভেড্ডাদের মত দেখতে বলে এই নাম ‘ভেড্ডিড’। কিছুদিন আগেও বলা হত ‘আদি অস্ট্রেলীয়’। সে নাম এখন বাদ পড়েছে। শুধু এ জনপদেই নয়, এ জনপদের বাইরেও পূর্বে–পশ্চিমে ভেড্ডিডদের ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছিল। “আরব, আফগানিস্তান থেকে শুরু করে মালয়,

www.pathagar.com

সুমাত্রা, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়ায় পর্যন্ত এই রক্তধারার প্রচুর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ ভারতে যাদের দ্রবিড় বলা হয়, তারা ভেড্ডাপ্রতীম মানুষদেরই বংশধর। --- বাঙালী জনপ্রকৃতিতে এ পর্যন্ত যে সব উপাদান পাওয়া গেছে, তাতে বলা যায়- ভেড্ডিড উপাদানই বাংলার জনগঠনের মূল ও প্রধান উপাদান; পরে কালক্রমে নানা অবস্থায় তাতে কমবেশি মাত্রায় পশ্চিমে ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মোঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় উপাদান এসে মিশেছে। --- বাংলা দেশের বুকে বিভিন্ন জাতির রক্ত মিশ্রণের এই ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পেরিয়ে ঐতিহাসিককালের প্রাচীন বাংলায়ও সমানে বয়ে চলল। সে ধারা আজও থেমে যায়নি। আজও নানান জনের নানান রক্তধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠছে। --- এমনি অবিচ্ছিন্ন ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে বিভিন্ন জন মিলেমিশে একাকার হয়ে কালক্রমে বাঙালী জাতির সৃষ্টি করেছে।" [বাঙালীর ইতিহাস, সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃঃ ২-৭]।

এখন 'বাঙালী জাতির উৎপত্তি' শিরোনামে বাঙালী জাতির গঠন ও তাদের আদি সভ্যতা সম্বন্ধে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য তুলে ধরছি। "বাংলার আদিম অধিবাসিগণ আর্যজাতির বংশসম্ভূত নহেন। --- কিন্তু বাংলার অধিবাসী এই সমুদয় অনার্য জাতির শ্রেণীবিভাগ ও ইতিহাস সম্বন্ধে সুধীগণ একমত নহেন। --- এই মানবগোষ্ঠীকে 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' অথবা 'অস্ট্রিক'- এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে 'নিষাদ জাতি' এই আখ্যা দিয়াছেন। --- বাংলার নিষাদ জাতি প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারা জীবন ধারণ করিত এবং গ্রামে বাস করিত। তাহারা নব্যপ্রস্তর যুগের লোক হইলেও ক্রমে তাম্র ও লৌহের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ধান্য উৎপাদন প্রণালী তাহারাই উদ্ভাবন করে। কলা, নারিকেল, পান, সুপারি, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সবজি এবং সম্ভবত আদা ও হলুদের চাষও তাহারা করিত। তাহারা গরু চরাইত না এবং দুধ পান করিত না, কিন্তু মুরগী পালিত এবং হাতিকে পোষ মানাইত। কুড়ি হিসাবে গণনা করা এবং চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তিথি দ্বারা দিনরাত্রির মাপ তাহারাই এ দেশে প্রচলিত করে। --- মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী হইতে নৃতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমন কি, বাংলা দেশের ব্রাহ্মণের সহিত ভারতের অপর কোন প্রদেশের ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। --- সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও বর্ধমান জিলায় অজয়, কুনুর এবং কোপাই নদীর তীরে অনেক স্থানে ভূগর্ভ উৎখননের ফলে

www.pathagar.com

বাংলার খুব প্রাচীন এক সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ···· এই সমুদয় পরীক্ষা করিয়া কোন কোন পন্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায় এবং মধ্যভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল বাংলা দেশের এই (সম্ভবত অন্য) অঞ্চলেও সেইরূপ সভ্যতাসম্পন্ন মনুষ্য-গোষ্ঠী বাস করিত। ···· সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলা দেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ···· মোটের উপর আর্য জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।" (বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ১১-১৪)।

www.pathagar.com

। দুই ।

সহসা নতুন ভোর

সেদিনের বাঙ্গালা বা ঙলা বা বাংলা নামের জনপদে 'প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে.... সুসভ্য জাতি বাস করিত' এবং সে জাতি 'একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল' বলে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করেছেন, সে জাতিকে আমরা বর্তমান বাঙালী জাতির প্রাথমিক পুরুষ বলে চিহ্নিত করতে পারি। বাঙালী জাতির সেই প্রাথমিক পুরুষের জীবন-ধারায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রকাশরূপী আচার-আচরণের বেশ কিছু প্রমাণ প্রাচীন যুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা সে জাতির পরিবর্তনশীল জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করব।

প্রাচীন পর্বের ইতিহাসেই দেখা গেছে অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের বা ভেড্ডিডদের রক্তধারার পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে এবং শেষ পর্যন্ত তারা একটি মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়েছে। "বাংলা দেশের বুকে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের এই ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পেরিয়ে ঐতিহাসিক কালের প্রাচীন বাংলায়ও সমানে বয়ে চলল। সে ধারা আজও থেমে যায়নি। ···· এমনি অবিচ্ছিন্ন ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলা দেশে বিভিন্ন জন মিলেমিশে একাকার হয়ে কালক্রমে বাঙালী জাতির সৃষ্টি করেছে।" (বাঙালীর ইতিহাস, সংক্ষেপে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়-এর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)' সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃঃ ৬-৭)।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই জাতিটি যে সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তা ছিল একান্তভাবেই গ্রামকেন্দ্রিক। তারা করত চাষবাস, তাই খাদ্যের কোন অভাব হত না। ধান ছাড়া তারা উৎপাদন করত কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, নারকেল, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, পান, সুপারি, ডালিম ইত্যাদি। এসব নামও এসেছে মূলত অস্ট্রিক ভাষা থেকেই। তাছাড়া তুলা থেকে কাপড়ের ব্যবহারও তাদেরই অবদান। ডোঙা শব্দটিও অস্ট্রিক। গুড়িকাঠের তৈরী লম্বা ডোঙা ও ভেলায় চড়ে যাতায়াত করত তারা জলপথে। কার্যত, এক সামুদ্রিক বাণিজ্যও তারা গড়ে তুলেছিল।

এই জনপদে অবিচ্ছিন্ন ধারায় জনমিশ্রণের সূত্রে দাক্ষিণাত্যের দ্রবিড়ভাষী তামিলদের সঙ্গে বাঙালীদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের

www.pathagar.com

শেষ পর্যায়ের কথাঃ "বঙ্গদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা প্রধানত দ্রবিড়ভাষী ছিল। তাহারা সাধারণত কৃষিজীবী ছিল বটে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর বাঙালীদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের সিন্ধু প্রদেশস্থ জ্ঞাতিদের ন্যায় অসমসাহসিক বণিক ছিলেন এবং বাণিজ্য সূত্রে এক দিকে মহাসমুদ্র পথে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, অন্যদিকে হিমালয় ভেদ করিয়া তিব্বতাদি দেশে তাঁহারা যাতায়াত করিতেন।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৫৯, পৃঃ ২১)।

দ্রবিড়ভাষীদের সঙ্গে প্রাচীন বাঙালীদের সম্পর্কটা ছিল কোন গুঢ় উদ্দেশ্যবিহীন। এ সম্পর্কে উভয় পক্ষেরই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদান-প্রদান চলত সমতার ভিত্তিতে। তাতে কারও জীবনসত্তায় ক্ষতিকর প্রভাব পড়ত না। কিন্তু কালপ্রবাহে আর্যভাষীদের সঙ্গে বাঙালীদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাতে বাঙালীর জীবনসত্তা প্রভাবিত হল মারাত্মকভাবে। ভারতবর্ষে আর্যভাষীরা ছিল বহিরাগত। বহিরাগমন করে আর্যভাষীরা ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও তাদের আগমনটা ছিল বহিরাক্রমণকারীর আগমন। আর সে আক্রমণটা সংঘটিত হয়েছিল উন্নত সভ্যতার অধিকারী অথচ বিলাস-ব্যসনে দুর্বল দ্রবিড়ভাষীদের ওপর। ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডিসের মতে (A History of India. 1967. p. 22). 'প্রথম আর্যভাষী আক্রমণকারীরা যে যাযাবর হিসাবে নগর-প্রশাসনের বিপরীতে তাঁবু-প্রশাসনে অভ্যস্ত ছিল, তার ধারণা পাওয়া যায় ঋগ্বেদ থেকে। বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র তাতে অভিহিত হয়েছেন 'নগর ধ্বংসকারী' রূপে, 'নগর নির্মাতা' বা 'নগর অধিকারী' রূপে নয়।

আর্যভাষীদের দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ ১০০০ বছর আগে; তখন তারা পাঞ্জাব থেকে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়ে বাঙলার প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। ততদিনে তারা অনেক মার্জিত হয়ে গেছে, সিন্ধু সভ্যতা থেকে শিখে নিয়েছে লাঙলের ব্যবহার, আয়ত্ত করেছে মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প ও সূত্রধর-বৃত্তির বিভিন্ন পদ্ধতি।'

দ্বিতীয় অভিযানে এই একদা বর্বর আর্যভাষীরা যখন বাঙলার এ জনপদ অভিমুখে আক্রমণ পরিচালনা করে, তখন প্রথমবারের মত তারা সত্যিকার প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। "প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারত যখন বিজয়ী আর্যজাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর হইতে সদানীরা (করতোয়া) নদীর তীর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ সদানীরার অপর পারে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

www.pathagar.com

তখন তাহারা 'অপ্রাপ্য আঙ্গুরফল মাত্রেই টক' এই নীতি অনুসারে বঙ্গবাসীদের উপর গালিবর্ষণ করিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ — ইত্যাদি, পৃঃ ২২)।

অস্ত্রবলে আর্যদের বঙ্গাধিকার সম্ভব না হলেও এ জনপদের অধিকার তারা লাভ করেছিল; সেটা বুদ্ধিবলে। প্রথমে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এবং পরে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ক্রম-রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সুবাদে। অবিশ্যি, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের কালে তারা বাঙালীদের দ্বারা যথেষ্টই লাঞ্ছিত ও পরিহাসিত হয়েছিল। তবুও বাঙলার আবহাওয়া ও প্রকৃতির প্রভাবজাত বাঙালী স্বভাবের দুর্বলতার জন্য সে অনুপ্রবেশ বাঙলার মাটিতে তার বীজ বপনে সক্ষম হয়েছিল। আর রাজশক্তি হিসাবে আর্যদের বঙ্গাধিকারের কালে তো বাঙালীর স্বকীয় সত্তা রক্ষা করা সম্ভবই ছিল না!

ভারতবর্ষে আর্য আক্রমণের প্রথম শিকার ছিল যে দ্রবিড়ভাষীরা, তারাই ছিল নগর সভ্যতার দাবিদার। "বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের। --- যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করে এদেশে এসে স্থিতিলাভ করবার পর পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ও দ্রবিড় ভাষাভাষীদের সংস্পর্শে এসে তারা প্রথমে কৃষি বা গ্রাম্য সভ্যতা ও পরে নগর সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হল। ক্রমে এই দুই সভ্যতাকেই নিজের করে নিয়ে তারা এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলল। আর্যভাষা হল তার বাহন। --- আর্যভাষা আশ্রয় করে গাঙ্গেয় প্রদেশের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলাদেশে প্রথম বইতে শুরু করল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম দশক থেকে। আদিম বাঙালীর আদি অস্ট্রেলীয় ও দ্রবিড় মন ও প্রকৃতি ক্রমে এক নূতন রূপ পেল।" (বাঙালীর ইতিহাস — ইত্যাদি, পৃঃ ১২ এবং ১৬)।

আর্যদের ধর্ম সভ্যতা সংস্কৃতির যে ঢেউ বাংলা দেশে প্রথম বইতে শুরু করে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম অব্দ থেকে, তা এক দুর্যোগের আকার ধারণ করে ত্রয়োদশ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত। উত্তর ভারতীয় আর্যভাষীরা (ততদিনে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত) অস্ট্রিক ও দ্রবিড়ভাষী কৃষি ও শিকারজীবী গৃহ ও অরণ্যচারী আদিবাসী কোমদের বলত 'ম্লেচ্ছ', 'দস্যু', 'পাপ'; তাদের ভাষাকে বলত 'অসুর' ভাষা। "বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের দখলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজ উত্তর ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্য বর্ণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে। পঞ্চম শতকে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজো করা হচ্ছে, ব্রাহ্মণদের বসবাস ক্রমেই বাড়ছে, অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের জমি দিচ্ছে, অযোধ্যাবাসী ভিন্ প্রদেশী এসেও এদেশে মন্দির সংস্কারের জন্যে জমি কিনছে। উত্তর-পূর্ব বাংলায় ষষ্ঠ শতকের

www.pathagar.com

গোড়াতেই পুরোদস্তুর ব্রাহ্মণ সমাজ গড়ে ওঠে। — পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে ব্যক্তি ও জায়গার সংস্কৃত নাম যা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় আর্যীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। — সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দেখা যায়, ব্রাহ্মণদের আস্তানা সমুদ্রতীর পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। বৌদ্ধ মঠগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। লোকে তার ইটকাঠ খুলে নিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করছিল। ছোটবড় ভূস্বামীরাও তখন অনেকে ব্রাহ্মণ। — এইভাবে দেড়শো বছরে প্রায় হাজার বছরের বাংলা দেশকে ভেঙে নতুন করে ঢেলে সাজার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হল। পাল বংশের জায়গায় এল সেন বংশ, চন্দ্র বংশের জায়গায় বর্মণ বংশ। দুটি বাঙালী বৌদ্ধ রাজবংশের বদলে এল এমন দুটি ভিন্-প্রদেশী রাজবংশ, যারা অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। দেখতে দেখতে বাংলাদেশে যাগযজ্ঞের ধুম পড়ে গেল; নদনদীর ঘাটে ঘাটে শোনা গেল বিচিত্র পূণ্যস্নানার্থীদের মন্ত্রগুঞ্জরণ; ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান দ্রুত বেড়ে গেল। বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, পারস্পরিক আহার-বিহার, বিভিন্ন বর্ণের নানান স্তর উপস্তর বিভাগের সীমা উপসীমা—এক কথায় সমস্ত রকম সমাজকর্মের রীতিপদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য নিয়ম অনুয়ায়ী বেঁধে দেওয়া হল।”
(বাঙালীর ইতিহাস .... ইত্যাদি, পৃঃ ৫৩-৫৬)

স্বনামখ্যাত চিন্তাবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর মতে, “ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয়তাবাদিতার আদর্শই হল আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ।” তার ব্যতিক্রম ছিল না এই বাঙলায়ও। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ভারত বিদ্যা বিভাগ’-এর অধ্যাপক শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার তাঁর ‘চর্যাপদ’ গ্রন্থে ‘চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশ’ অধ্যায়ে বলেনঃ “ব্রাহ্মণরা ছিলেন সমাজের উচ্চ মঞ্চে, কিন্তু সাধারণ লোকের ভাবনা-ধারণা চিন্তাকর্মের সংস্পর্শের বাইরে। গোটা সমাজ তখন তিনটি বৃহৎ প্রাচীরের দ্বারা বিভক্ত। সবার উপরে ব্রাহ্মণ, মাঝে অগণিত শূদ্র পর্যায়ের সাধারণ লোক আর সবার পিছে, সবার নীচে সমস্ত রকম সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অস্পৃশ্য দীন ও নিরন্তর দুঃখের দাহনে দগ্ধ অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি বর্ণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দূরতিক্রম্য বাধার প্রাচীর। — এর পরিণতি তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের মধ্যে একটা গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস। এই বিরোধ, অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং অপমানের ধূমকলঙ্কে মলিন পরিবেশে সেদিন বাঙলার সমাজ জীবনকে ঘোলাটে করে তুলেছিল। — এই চিত্রের একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্যবিলাস এবং কাম-বাসনার সোৎসাহ আতিশয্য। কাব্য কবিতাগুলির অধিকাংশই যৌন-কামনার মদির ও

www.pathagar.com

মধুর; রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া চূড়ান্ত লাম্পট্য, চারিত্রিক অবনতি, তরল রুচি ও দেহগত বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির কলঙ্কে মলিন; ধর্ম আচরণে ভেদবুদ্ধি, নিন্দনীয় যৌন–কামনা, অমানুষিক ঘৃণা ও অবহেলা জীবনের সমস্ত দিকে কদর্যতার সমাবেশ। আর অন্যদিকে নিদারুণ দারিদ্র, ক্ষুধা, অভাব, পীড়ন, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। ···· এই নিশ্ছিদ্র সর্বব্যাপী সুগভীর অন্ধকারের বেড়াজালে চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশ অসহ্য আত্মসন্তুষ্টি, দুর্বল আত্মশক্তি এবং দুরপনেয় চারিত্রিক কলঙ্কের ক্রমবর্ধমান অভিশাপে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে– কোথাও তার আশা নেই, নিপীড়িতের যন্ত্রণা প্রকাশের নেই ভাষা, মানব ধর্মে নেই ক্ষীণতম বিশ্বাস। সমস্ত বাঙলাদেশই যেন এই অন্ধকারের সুকঠোর পেষণে মৃত্যুযন্ত্রণায় অভাবদৈন্য পীড়িত পার্বতীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করছে– গই ভবিত্তি কিল কা হমারী! (কি গতি হবে আমার!) ...”। (চর্যাপদ, অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার, ১৯৭২, পৃঃ ৩১–৩৯)।

দেশের এই চিত্র–লেখার কাল দশম থেকে দ্বাদশ শতক। এমনি একটি যুগের শেষ শাসক ছিলেন মহারাজা লক্ষ্মণ সেন। এবং তাঁর হাত থেকেই নদীয়া কেড়ে নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের সূচনা করেছিলেন ইখতিয়ার–উদ–দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী, ইতিহাসখ্যাত সেই দুর্দমনীয় তুর্কী বীর। সেনদের ব্রাহ্মণ্য শাসনের এসব অনাচার–অবিচারের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেনঃ “এর পর বখৎ ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশ’ বছরের মধ্যে সারা বাংলা দেশ জুড়ে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়– সেন আমলে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতিরই পরিণাম।” (বাঙালীর ইতিহাস.... ইত্যাদি, পৃঃ ৯৮)।

বাঙলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইখতিয়ার–উদ–দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই রাজটি প্রতিষ্ঠার পরই বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন উপায়ে মুসলমানরা স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে আসেন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, নব–প্রতিষ্ঠিত এ রাজ্যটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি মুসলমান সমাজের প্রয়োজন। এমনি একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ অবিশ্যি ত্রয়োদশ শতকের বহু আগেই আরম্ভ করেছিলেন এদেশে আগত সুফী–দরবেশগণ। তাঁদেরই মাধ্যমে ইসলামের বাণী বাঙলার সজল মাটি স্পর্শ করেছিল সপ্তম শতকেই। পরবর্তীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ত্বরান্বিত হয়ে ওঠেছিল মাত্র।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেনঃ “মালিক ইখতিয়ার–উদ–দীন মুহম্মদ বখতিয়ার প্রকৃতপক্ষে ছিলেন

www.pathagar.com

বাঙলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসের নির্মাতা। --- তাঁর (কীর্তিসমূহ) আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে --- কিন্তু টিকে আছে তাঁর খ্যাতি এবং থাকবেও ততদিন, যতদিন এই জনপদে টিকে থাকবে ইসলাম।" (History of Bengal, Vol. II, pp. 12, 14)।

বাঙলায় ১২০৩ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছরের যে শাসনামল, তার মধ্যে তুর্কী আমল বলে চিহ্নিত শাসনকালে (১২০৩-১৩৩৮) দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতি বাঙলার পূর্ণ আনুগত্য কাল ছিল মাত্র ৪৪ বছরের- ১২২৭ থেকে ১২৭২ সাল পর্যন্ত। তার আগে ও পরে বাদবাকি সময়টায় কখনও বাঙলা স্বাধীন হয়েছে, কখনও হয়েছে দিল্লীর অধীন। অতঃপর ১৩৩৮ সালে বাঙলায় লাখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁওকে তিনটি রাজধানী করে আলাদাভাবে যে স্বাধীনতা ঘোষিত হল এবং ১৩৫২ সালে এই তিনটি অঞ্চলের সমন্বয়ে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ যে একীভূত স্বাধীন বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা করলেন, তার স্বাধীনতা অটুট থাকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত। ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত বাঙলায় চালু হয় দিল্লীভিত্তিক আফগান শাসন এবং তাঁর পরেই ১৫৭৫ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত এ-অঞ্চলে দিল্লীকেন্দ্রিক মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। বাঙলা তখন মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা মাত্র। তারপর এখানে চালু হয় বিদেশী ইংরেজ শাসন।

বাঙলায় বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন ও বহিরাগত মুসলিম শাসনের মধ্যে তুলনায় যে সব প্রধান বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, তা হলঃ এক, ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকরা ছিল বাঙলার জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তাদের কঠোর শাসন-শোষণ ও ধর্মাচার; দুই, ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকরা জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষার প্রতি তোয়াক্কা না করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যেমন নিজেদের স্বার্থমুখী ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে, তেমনি জনসাধারণের মুখের ভাষার প্রতি দেখিয়েছে চরম অবহেলা ও ঘৃণা; এবং তিন, ডক্টর রায়-এর মতে, "ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষি-নির্ভরতার ফলে গ্রাম্যজীবন সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ল। --- মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হল না; নিচু স্তরেই থেকে গেল।" (পৃঃ ৪৭)।

এর বিপরীতে মুসলিম শাসকরা ছিলঃ এক, জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রত্যাশী এবং নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি সচেতন থেকেও ভিন্নধর্মানুসারী জনসাধারণের সঙ্গে অনেকটাই সম্পৃক্ত; দুই, জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাংক্ষা পূরণ করতে যেমন চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছে তারা, তেমনি জনসাধারণের মুখের ভাষার প্রতি দেখিয়েছে উৎসাহব্যঞ্জক উদারতা এবং দান করেছে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা; এবং তিন, কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভূত বৃদ্ধির ফলে সমগ্র বাঙলার এবং সকল বাঙালীর অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি ঘটেছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের বৈশিষ্টগুলির প্রমাণ রয়েছে উপরিউক্ত ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃত মন্তব্যসমূহে। আর মুসলিম শাসকদের বৈশিষ্টের প্রমাণস্বরূপ প্রথমে ঐতিহাসিক ডক্টর আবদুল করিমের কথায় বলা যায়, "নদীয়া বিজয়ের পরে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কোন পমাণ প্রাওয়া যায় না। বরঞ্চ মুসলমানেরা দেশে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্টিত করিয়া জনহিতকর কাজে মনোযোগ দেন। হিন্দুরাও এই সকল জনহিতকার কাজের সুফল ভোগ করে। লখনৌতির গভর্নরেরাও হিন্দুদের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য সক্রিয় চেষ্টা করেন। তাই এই আমলে সর্বপ্রথম আমরা মুসলমান শাসকদের প্রতি হিন্দুদের আস্থার প্রমাণ পাই।" (বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ১১০)।

অতঃপর ডক্টর করিমের কথায়ই বলা যায়, "বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি মুসলমান শাসনের অবদান। — বাংলদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলেও হয়ত বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিত, কিন্তু নিঃসন্দেহে ইহা আরও অনেকদিন বিলম্বিত হইত। মুসলমান শাসকদের নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্রে কোন পার্থক্য ছিল না .... অন্যদিকে নির্যাতিত বৌদ্ধ ও শূদ্ররা মুসলমান সুফী–সাধকদের চরিত্রে এবং মুসলমানদের বর্ণ–বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থায় মুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইসলামের প্রভাব রোধ করার জন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদের বিধি–নিষেধ শিথিল করিতে বাধ্য হয় এবং ফলে গোটা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূচনা হয়। সুতরাং অন্য কারণ বাদ দিলেও শুধু মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই বাংলা সাহিত্য বিকাশের পথ সুগম হয়।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৫–৫২৬)।

এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেনঃ "জানি না কতদিন বঙ্গবাণী জন্মিয়া ঘরের কোণে লাজুক বধূটির মত নিরিবিলি বাস করিয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালার অতি স্মরণীয় সুপ্রভাত যেদিন সে সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আসরে দেখা দিল। বাস্তবিক সেদিন বাঙ্গালীর এক নবযুগের পূণ্যাহ। — যাহারা বলিয়াছিলেনঃ অষ্টাদশা পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।। নিশ্চয় তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে আবাহন করিয়া আনেন নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপক্ষরাই সনাতনপন্থিগণকে বিমোহিত করিয়া বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই এই মোহিনী বঙ্গবাণীর সাধনা করিয়াছিল।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, প্রথম খন্ড, ১৯৫৩, পৃঃ ১–২)। এখানে উল্লেখ্য যে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতানী আমলে কৃত্তিবাস, মালাধর বসু প্রমুখ অন্তত ১৭ জন হিন্দু কবি বাংলা

www.pathagar.com

ভাষায় তাঁদের ধর্মীয় কাব্য রচনা করেন; এবং মুজাম্মিল, শাহ মুহম্মদ সগীর প্রমুখ অন্তত ৯ জন মুসলমান কবি রচনা করেন তাঁদের ধর্মীয় ও রম্যরস প্রধান কাব্য। মুঘল আমলে বাংলাভাষায় হিন্দু ধর্মীয় কাব্য রচনায় নিয়োজিত ছিলেন দ্বিজ মাধব, কাশীরাম দাস প্রমুখ অন্তত ১৩ জন হিন্দু কবি; এবং ধর্মীয় রসপ্রধান কাব্য রচনায় নিয়োজিত ছিলেন সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ কবীর, আলাওল প্রমুখ অন্তত ৩১ জন মুসলমান কবি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিন্দু কবিরা সেকালে প্রধানত রচনা করেছেন তাঁদের ধর্মভিত্তিক কাব্য। কিন্তু মুসলমান কবিরা বিষয় বৈচিত্র্য এনে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করেছেন। তাঁরা রচনা করেছেন প্রেমমূলক মুসলিম কাহিনী কাব্য ও ভারতীয় কাহিনী কাব্য, মুসলিম ধর্মীয় কাব্য, হিন্দু ধর্মীয় কাব্য, বীরগাঁথা, রম্যকাব্য ও মর্সিয়া কাব্য।

শুধুমাত্র কাব্য-কথা নয়, সব কথার সেরা কথা যে ধন-কথা, সেকথারও কথকতায় জমে উঠেছিল সেদিনকার বাঙালী-জীবনের কত কথার আসর! এভাবেই সেদিন বাঙ্গালী জীবনের দিকে দিকে সহসাই দেখা দিয়েছিল মুক্তির প্রথম ভোর!

www.pathagar.com

। তিন ।

রঙধনুকের দেশ

১২০৩ খৃষ্টাব্দে সেন রাজার হাত থেকে শাসনদন্ড কেড়ে নিয়ে এ দেশে যে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন মুহম্মদ বিন খবতিয়ার খিলজী এবং তারই পথ ধরে প্রায় শতবর্ষের মধ্যে সমগ্র বাঙলায় যে মুসলিম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে দেশের তথা দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে কোন শুভ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল কি? এ প্রশ্নের উত্তরঃ হয়েছিল।

কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বলতে সে দেশের ধন-সম্পদ এবং দেশবাসীর খাওয়া-পরা-থাকা এবং আরও বহুবিধ চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষের যা কিছু দরকার, তার সবকিছু নিয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিকেই বোঝায় এবং মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে জীবনের সকল চাহিদা মিটিয়ে বসবাস করার জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা-ই হচ্ছে মানুষের সমাজ। চাহিদা মেটানোর উপায়ের ওপর যেমন মানুষের সমাজ, তেমনি রাষ্ট্র-ধর্ম-শিক্ষা-দীক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সবকিছুই সেই চাহিদা মেটাবার উপায়ের ওপরই নির্ভরশীল। আর পরিবর্তনশীল রাষ্ট্র-ধর্ম-শিক্ষা-দীক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সব সময়ই সমাজকে পরিবর্তনের ধারায় পরিচালিত করে। এই পরিবর্তনের যে চালিকাশক্তি, তার প্রধানতম ও সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদানটি হচ্ছে অর্থনৈতিক তৎপরতা।

এটা সর্বসম্মত যে, প্রাচীন বাঙলার ধন উৎপাদনের উপায় ছিল তিনটিঃ কৃষিকর্ম, তদানীন্তন কালোপযোগী শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রাকৃতিক সম্পদের লভ্যতাও ছিল অন্য একটি উপায়। প্রাচীন বাঙলায় "গুপ্ত আমলে বাংলা দেশে যেমন সোনার, তেমনি রূপার মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত দিনার ছিল স্বর্ণমুদ্রা ও রুপক ছিল রৌপ্যমুদ্রা। তাছাড়া তামার মুদ্রাও ছিল। মুদ্রার নিম্নতম নাম ছিল কড়ি। — সপ্তম শতকের পর থেকেই স্বর্ণমুদ্রা একেবারে উধাও হয়ে যায়। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন করে রূপার মুদ্রার প্রচলন দেখা গেল; কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা আর ফিরে এল না। রূপার যে দ্রক্ষমুদ্রার প্রচলন হল, তা আসল দাম ও বাইরের চেহারা দু'দিক থেকেই খুব খেলো। তারপর সেন আমলে রূপার মুদ্রাও উধাও হয়ে গেল। এমনকি তামার মুদ্রাও আর দেখা গেল না। সেন আমলে মুদ্রা হিসেবে কড়িই হল সর্বেসর্বা।" (বাঙালীর ইতিহাস, সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃঃ ৪৫-৪৬)।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, গুপ্ত আমলে ভরতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। সে আমলে এই বাঙলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফলের অংশীদার হিসাবে সোনা-রূপার অংশও ভোগ করত। "কিন্তু অষ্টম শতকের গোড়া থেকেই পূর্ব-ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারসিক বণিকদের হাতে চলে যেতে আরম্ভ করে। পশ্চিম-ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম আশ্রয় সিন্ধুদেশ আরব বণিকের দখলে চলে গেল। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শিল্প ও গন্ধ দ্রব্যের চাহিদাও গেল কমে। পূর্ব-ভারতে তাম্রলিপ্তি বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর পাঁচ-ছ'শ' বছর ধরে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের তেমন কোন স্থান নেই। কাজেই বাইরে থেকে সোনা-রূপার আমদানীও কম। স্বর্ণমুদ্রার অবনতির ভেতর দিয়ে এই দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির ফলে শিল্প প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটল। পাল রাজাদের আমলে স্থলপথে কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ গড়ে তোলার চেষ্টা হল; এমনকি ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য করার চেষ্টা হল। কিন্তু তা যথেষ্ট সার্থক হতে পারেনি। ফলে কৃষির ওপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে পাল আমলের শেষের দিকে এবং সেন আমলে বাংলাদেশ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর ও ভূমিনির্ভর, অচল-অনড় গ্রাম্যসমাজে পরিণত হল।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭)।

অতঃপর সেন আমলের অবসানে বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম শাসনামল। এই আমলে বাঙলায় যে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঐতিহাসিকরা এতে কোন দ্বিমত পোষণ করেন না। ঐতিহাসিক ডক্টর এম· এ· রহিম বলেনঃ "চারটি জিনিসের মাধ্যমে একটা দেশের সমৃদ্ধি প্রকাশ পায়। প্রথম, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য; দ্বিতীয়, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা; তৃতীয়, ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য এবং চতুর্থ, দেশে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থের প্রাচুর্য। সমসাময়িক ফার্সি ঐতিহাসিক ও বিদেশী পরিব্রাজকদের বর্ণনায় প্রকাশ পায় যে, মুসলিম শাসনাধীনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সমৃদ্ধির এই চারটি প্রয়োজনীয় উপাদানের অধিকারী ছিল।" (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ডক্টর এম· এ· রহিম- অনুবাদ ঃ মুহম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃঃ ৪৩৮)।

ষোল শতকের প্রথমদিকে পর্তুগীজ বণিক বারবোসা বাঙলার কথা বলতে গিয়ে বলেনঃ — দেশটি অত্যন্ত উর্বর, এর জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, এরা সকলেই বড় ব্যবসায়ী, নিজেদের বড় জাহাজগুলোর নির্মাণ কৌশল মক্কার জাহাজের মত, অন্য জাহাজগুলো চীন দেশের প্রদ্ধতিতে তৈরী, তাদের এরা বলে 'জাঙ্গো'; এগুলো খুবই বৃহৎ এবং যথেষ্ট পরিমাণে মাল বহন করে। এসব জাহাজ নিয়ে

www.pathagar.com

এরা চোল-মান্দার, মালাবার, কাম্বে, পেগু, টার্নাসারি (টেনাসেরিম), সুমাত্রা, সিংহল ও মালাকায় যায়। এরা নানা জায়গায় বহু রকম জিনিসের ব্যবসা করে।" (উদ্ধৃত-প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫)।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের কতটুকু প্রসার ঘটলে এদেশেই জাহাজ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তা সহজেই অনুমেয়। অথচ গুপ্ত যুগের শাসন অবসানের পরপরই ভারতবর্ষের এবং সেই সুবাদে বাঙলারও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুফল নিঃশেষিত হয়ে যায়। অতঃপর "পাল-যুগ বৈশ্য প্রাধান্যের হলেও ব্রাহ্মণ প্রভাবের যুগ। বেদ-ব্রাহ্মণ রাজার যুগ। সওদাগরের ছেলেরা তাদের মানদন্ড আর বাণিজ্য তরীর কথা ভুলে টোলে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সংস্কৃত পড়তো। ---- ধ্যানগম্ভীর পবিত্র বেদমন্ত্রে মুখরিত সেই পরিবেশে আমদানী রপ্তানী, কেনাকাটার মত স্থূল বিষয় কল্পনা করাও ছিল পাপ। বাণিজ্যিক্ সমৃদ্ধি যার ওপরে একান্ত নির্ভরশীল সেই সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ---- নৌবিদ্যায় সমুদ্র যাত্রায় বাঙালীর যুগসঞ্চিত গৌরবময় ইতিহাসের ওপরে নেমে এসেছিল বিস্মৃতির যবনিকা।" (বাণিজ্যে বাঙালী, একাল ও সেকাল, সুভাষ সমাজদার, শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৮২ (বাংলা), পৃঃ ৬৩-৬৪। শ্রী সমজদার আরও বলেন, "সেন রাজাদের সময়ে বাংলায় বাণিজ্য প্রসারের কোন ইঙ্গিতই নেই। কেননা, সেন রাজারা জন-জীবনের সঙ্গে ছিলেন সম্পর্কহীন। তাঁরা বণিকদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় কোনরকম পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না। শুধু নিজেদের বিলাসব্যসন, যুদ্ধ, সাম্রাজ্য বিস্তার, জাতিভেদ প্রথা, কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫)।

প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙলায় মুসলিম শাসনামল ছিল ব্যাপকতম বাণিজ্যিক কার্যকলাপের আমল। মুসলিম আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল প্রসারের ফলে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির অধিক উৎপাদনের প্রয়োগ দেখা দিয়েছিল। সে আমলে "সূতী বস্ত্র, চাউল, চিনি, রেশমী বস্ত্রাদি, আদা, মরিচ, লাক্ষা, হরিতকী ইত্যাদি রপ্তানীর প্রধান দ্রব্য ছিল। এসবের মধ্যে সুতী বস্ত্র অধিক পরিমাণে রপ্তানী করা হতো। চাউল বাংলার রপ্তানী বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। ---- সেকালে বাংলার উৎপন্ন চিনি বহু দেশে রপ্তানী হতো এবং তার বিনিময়ে এদেশ প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থ অর্জন করতো। বাংলাদেশ সে সময় উত্তম মানের লাক্ষা উৎপন্ন করতো এবং বৈদেশিক বাজারে তার একচেটিয়া রপ্তানী বাণিজ্য ছিল। ---- বাংলার সঙ্গে চীনের স্বর্ণ, সাটিন, রেশম, নীল ও সাদা মাটির বাসন, তাম্র, লৌহ, কস্তুরী, সিন্দুর, পারদ ও মাদুর ইত্যাদি ব্যবসা ছিল।" (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস — ইত্যাদি, পৃঃ ৪৫০-৪৫১)।

এই বিপুল পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মুসলিম শাসনামলে বিদেশ থেকে অর্জিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের আভায় 'মূলক-এ-বাঙ্গালা' আবার ঝলমল করে

www.pathagar.com

উঠল। মানুষের ঘরে ঘরে, বাজারে বাজারে আবার দেখা দিল স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। "মুসলিম আমলে এত প্রচুরসংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল যে, প্রজারা এসব মুদ্রায় খাজনা দিত।"(প্রাগুক্ত,৪৩৮)।

দু'শ' বছরের স্বাধীন সালতানাত ও পরবর্তী মুঘল আমলে বাঙলায় ২৬টি টাকশালের নাম পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছেঃ লাখনৌতি (গৌড়ে), ফিরোজাবাদ (পান্ডুয়ায়), সাতগাঁও, সোনারগাঁও, মুয়াজ্জামাবাদ (সম্ভবত ময়মনসিংহে), শহর-ই-নও (গঙ্গার ধারে কোথাও), গিয়াসপুর (দৌড়ের কাছে), ফতেহাবাদ (ফরিদপুরে) হোসেনাবাদ (২৪-পরগণায়), খলিফতাবাদ (বাগেরহাটে), মুজাফ্ফরাবাদ (পান্ডুয়ার কাছে), চাটগাঁও (চট্টগ্রামে), মুহাম্মদাবাদ, মাহমুদাবাদ, জান্নাতাবাদ, নসরতাবাদ, বারবকাবাদ মুহাম্মদাবাদ থেকে বারবকাবাদ হয়তো একই টাকশালের ভিন্ন ভিন্ন নাম) কামরু (সিলেটে), আরাকান, রোহতাসপুর, শরিফাবাদ, পাটনা, রাজমহল, তান্ডা বা তাঁড়া, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদ। একই শাসক যে সবগুলো টাকশাল থেকেই মুদ্রা খোদাই করিয়েছেন তা নয়, তবে একাধিক স্থান থেকে অনেক শাসকই তা করিয়েছেন। এতসব টাকশালের অস্তিত্ব তদানীন্তন বাঙলার আর্থিক সচ্ছলতারই পরিচায়ক। মুসলিম শাসনামলে বাঙলার আর্থিক সমৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় তার সহজলভ্যতার চিত্র তুলে ধরতে যেয়ে ডঃ এম· এ· রহিম বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ঘেটে যা পেয়েছেন, তা থেকে বলা যায়– "মাটির উর্বরতা, শিল্পের উন্নতি এবং লোকদের পরিশ্রম ও কারিগরি নৈপূণ্য বাংলার কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের মূল কারণ। অত্যধিক প্রাচুর্য থাকায় জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অসাধারণভাবে সস্তা ছিল এবং অন্যান্য দেশের স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থ এই দেশকে সম্পদশালী করে তুলেছিল। হিন্দু আমলে ১২৮০ কড়ি ছিল এক টাকার সমান, কিন্তু মুসলিম শাসনামলে ৮,০০০ কড়িতে এক টাকা হতো। ব্যাপক রপ্তানী বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যাপক সমাগমের ফলে কড়ির মূল্যমান হ্রাস পায়।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৬-৪৫৭)। কড়ির পরিবর্তিত মূল্যমান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এক টাকার জন্য মুসলিম আমলে হিন্দু আমলের তুলনায় (৮০০০+১২৮০)= ৬·২৫ অর্থাৎ সোয়া ছয় গুণ কড়ি দিতে হত। এটাকে জনসাধারণের জীবনাযাত্রা নির্বাহের সূচক হিসাবে ধরলে বলা যায়, হিন্দু আমলের তুলনায় মুসলিম আমলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার খরচ সোয়া ছয় ভাগ নীচে নেমেগিয়েছিল।

শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকরা দেশে একটা 'ইসলামী পরিবেশ' গড়ে তোলায় সচেষ্ট থেকেও অমুসলিমদের প্রতিও ছিলেন পুরোপুরি সহানুভূতি সম্পন্ন। সুলতানী বাঙলায় মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মসজিদ-খানকাহ্-মক্তব-মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে, আর হিন্দুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা টোল ও

www.pathagar.com

হিন্দুধারায় ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত নানা জ্ঞানপীঠকে কেন্দ্র করে। এর ফলে, একক কোন শিক্ষা ধারার পরিবর্তে দেশে দু'টি ধারার সৃষ্টি হল। এবং তা প্রভাব বিস্তার করল সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও।

এখানে পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে দু'টি শব্দ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা তুলে ধরতে চাই। শব্দ দু'টি হচ্ছে- 'সমন্বয়' ও 'সমাহার'। 'সমন্বয়' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংগতি, অবিরোধ, মিলন; আর 'সমাহার' শব্দের অর্থ সংগ্রহ, সমষ্টি ইত্যাদি। যে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একাধিক ধর্মমত ও জীবন-বিশ্বাস বিদ্যমান, সেখানে সেসবের সমন্বয় সাধনের অর্থ হবেঃ সকল ধর্মমত ও জীবন-বিশ্বাস মিলিয়ে এমন একটা কিছু দাঁড় করানো, যা নিয়ে কারও বিরোধের কোন অবকাশ থাকবে না।

'সমষ্টি' অর্থে সমাহারের বেলাতেও তা-ই। সেই 'একটা কিছু'র সন্ধানে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হলে যা পাওয়া যাবে তা হবে প্রতি মত-বিশ্বাস থেকে আহরিত অভিন্ন উপাদানবিশিষ্ট 'একটা কিছু'। যা থেকে প্রতিটি মত-বিশ্বাসের স্বকীয় বৈশিষ্টগুলো বাদ পড়ে যাবে। আর সমাহারের পথে অগ্রসর হলে পাওয়া যাবে এমন একটা কিছু, যা থেকে প্রতিটি মত-বিশ্বাসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বাদ পড়ে যাবে। আর সমাহারের পথে অগ্রসর হলে পাওয়া যাবে এমন 'কেটা কিছু' যা থেকে প্রতিটি মত-বিশ্বাসকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসহ চিহ্নিত করা যাবে। কিন্তু দীর্ঘকালের কোন একটা বিশেষ মত-বিশ্বাস যদি কোন দেশের সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে থাকে, তাহলে তাতে অন্য মত-বিশ্বসের সমন্বয় ঘটাতে গেলে বাস্তবে সে মত-বিশ্বাস মার খেয়ে যেতে পারে। এমনকি সময়ে তা বিলীনও হয়ে যেতে পারে। বাস্তব সুযোগ তো স্বার্থবাদিতাকে প্ররোচিতই করে থাকে! কিন্তু সমাহারে সে সম্ভাবনা যথেষ্টই কম থাকার কথা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ থেকে আজ বৌদ্ধ সংস্কৃভিকে প্রায় চেনাই যায় না। এই দুই সংস্কৃতির সমাহারে এমনটি হত না। এক সংস্কৃতি দিয়ে অন্য সংস্কৃতিকে গ্রাস করার ইচ্ছা না থাকলে দুই সংস্কৃতিকেই পাশাপাশি লালিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে দু'য়ের সমাহার ঘটানো যেত। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনামলে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির দরুন সমন্বয়ের নামে অন্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে গ্রাস করাই হয়েছে।

বাংলার মুসলিম শাসকরা শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপারে ছিলেন উদার। হয়তো প্রয়োজনের চাপেই তাঁরা উদার হয়েছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক- তা তাঁরা হয়েছিলেন। দেশে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থাকে চেপে না দিয়ে মুসলমানদের জন্য ইসলামী মডেলের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন এবং দু'টি ব্যবস্থাকেই পাশাপাশি চলতে দিয়ে প্রয়োজনমত সেগুলোকে উৎসাহিত করেছেন। ভাষার বেলাতেও হয়েছে তা-ই। তাঁদের পারিবারিক ও দরবারী

www.pathagar.com

ভাষাকে (তুর্কী ও আরবী–ফারসী) জনসাধারণের উপর চাপিয়ে না দিয়ে তাদের মুখের ভাষা বাংলা যাতে যথাযথভাবে নির্মিত হয়ে উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, সেই লক্ষ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবি–সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষণা ও উৎসাহ দান করেছেন। তাতে উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধারায় কাব্য–কীর্তি নির্মাণ করেছেন। ফলে, হিন্দুদের কাব্য– কৃতি থেকে হিন্দুদের স্বকীয়তা যেমন স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তেমনি মুসলমানদের কাব্য–কৃতি থেকে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় মুসলমানদের স্বকীয়তাকে। সংস্কৃতির বেলাতেও ঠিক এমনটিই ঘটেছে। মিলনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই আমরা তথাকথিত সমন্বয় না বলে সমাহার বলে চিহ্নত করতে চাই। এই সমাহারকে 'উদার সমন্বয়' বলতেও আমাদের অমত নেই। আর রাষ্ট্রশাসনে হয়তো এই–ই হচ্ছে পজিটিভ ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ– 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি'। স্বাভাবিক অনৈক্যের মাঝে ঐক্য সাধনেই নিহিত আছে কৃতিত্ব। সেই কৃতিত্বেরই দাবীদার ছিলেন বাঙলার মুসলিম শাসকরা।

আলোচ্য সময়ে হিন্দু–মুসলিম কবিদের কাব্য–কৃতিতে লক্ষণীয় কিছু বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছেঃ হিন্দু কবিদের কেউই কোন মুসলিম কথা–কাহিনী নিয়ে কোন কাব্য রচনা করেননি। পক্ষান্তরে, মুসলিমদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কবি হিন্দু ধর্মীয় কথা–কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। অন্য বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে ঐতিহ্যের উৎস সম্পর্কিত। হিন্দু কবিরা ওই আমলে তাঁদের কাব্য–কৃতিতে যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা একেবারেই পৌরাণিক; ভৌগোলিক দিক থেকে তার উৎস–ভূমি ভারতবর্ষেই সীমিত। কিন্তু মুসলিম কবিদের ধ্যানকৃত ঐতিহ্য–উৎস ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে আরব–আযমে বিস্তৃত। ঐতিহ্য ছাড়াও মুসলিম কবিরা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মানবিক ও রম্য উপাদান সংযুক্ত করেন। তাঁদের কাব্যের প্রধান উপজীব্য হচ্ছে মানুষ, এই মর্তের মানুষ–হিন্দু কবিদের কাব্যে উপজীব্য স্বর্গলোকের দেবদেবী নয়। বাংলা সাহিত্যে বস্তুগত উপাদান ও রোমান্টিক প্রেমমূলক উপাখ্যানের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা মুসলিম কবিদের উল্লেখযোগ্য অবদান। মানবধর্মিতার ওপর উপস্থাপিত করে কাব্য রচনার পথিকৃৎ হওয়ার গৌরবতাঁদেরই।

ভাষা ও সাহিত্যের মত শিল্পকলায়ও পড়েছে মধ্য এশিয়া, বিশেষ করে উত্তর–ভারতের প্রভাব। এ প্রভাব স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে, সঙ্গীতে এবং শিল্পকলার অন্যান্য দিকেও। বলতে হয়, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ প্রভাব বাঙলার শিল্পকলাকে আরও ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছে। মুসলিম আমলেই হয়েছে এ ঐশ্বর্যের সঞ্চয়।

বাঙলার নিজস্ব–স্থাপত্যরীতি প্রথম ব্যক্ত হয়েছে মসজিদের নির্মাণ কৌশলে। তার মসজিদ ও মাজারের প্রধান ধারাটি মধ্যযুগীয় দিল্লীর অনুকরণ; কিন্তু তার

www.pathagar.com

খুটিনাটিগুলো স্থানীয় প্রেরণাজাত। "উত্তর-ভারতের জমকালো মসজিদগুলোর তুলনায় এসব মসজিদ অত্যন্ত অনাড়ম্বর, নিরলঙ্কার, সাদাসিধে, পরিমিত এবং আধিক্যহীন গ্রামবাঙলার লাজুক চালাঘরের মতোই। দীর্ঘস্থায়ী বর্ষার জন্যে এগুলো একটি ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ। পূর্বদিকে ঘেরা প্রাঙ্গণ নেই। দীঘির ধারে খোলা জায়গায় নির্মিত এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিচু ফাসাদ (সম্মুখভাগ), ঢালু ছাদ ও বাঁকানো কার্নিশ — তিনটি অথবা তারো বেশী খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ, চারকোণে স্থূলকায় চারটি অনুচ্চ মিনার এবং নিচু গম্বুজ।" (বাংলাদেশেরআঞ্চলিক স্থাপত্য, আসহাবুর রহমান, সাপ্তাহিক রোববার, ৮ এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃঃ ২৪)।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আযম শাহ্‌র মাযারে ধরা পড়ে বাঙলার স্থাপত্য শিল্পে মুসলিম ধারার প্রাচীনতম রূপ। সোনাওগাঁও-এ তাঁর মাযারটি কালো ব্যাসাল্‌ট্‌ পাথরের অনেকগুলো অর্ধ-গোলাকৃতি প্যানেল দ্বারা তা সুশোভিত। ১৫০০ সালে তৈরী গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের কথাও এখানে উল্লেখ করা চলে। স্থাপত্য শিল্পে বাঙলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করছে মসজিদটির ঢালু কার্নিশ, সমান মাপের ছোট ছোট দরজা এবং বহুসংখ্যক গম্বুজ। দেয়ালগুলোর ভেতর-বাহিরবাঙালীঢঙেসাজানো-গোছানো।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে এই উপ-মহাদেশের ভান্ডারে বাঙলার স্বকীয় কোন অবদান আছে কি-না তা আমাদের জানা নেই। তবে উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা এদশেও ছিল- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এই দেশের নিজস্ব সঙ্গীত ধারা, যাকে লোক-সঙ্গীতও বলা হয়, তাতে ইসলামী সূফী প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। বাঙলার মারফতী-মুর্শিদী-জারী ইত্যাদি পল্লীগীতি তো প্রধানত মুসলমানদেরই অবদান।

ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের শাসনামলে, প্রফেসর অতীন্দ্র মজুমদারের কথায়, যখন "নিশ্ছিদ্র সর্বব্যাপী সুগভীর অন্ধকারের বেড়াজালে চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশ অসহ্য আত্মসন্তুষ্টি, দুর্বল আত্মশক্তি এবং দুরপনেয় চারিত্রিক কলঙ্কের ক্রমবর্ধমান অভিশাপে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে", তখন সহসাই এ বাঙলার আকাশ-দিগন্তে ফুটে উঠল এক নতুন ভোরের আভা! মুক্তির সুব্‌হে সাদেক।

জাগরণ এল মানুষের। আরম্ভ হল পথ চলা। আলোকের পথে মানুষের এক সুদীর্ঘ অভিযাত্রা। পথ ছিল বন্ধুর, দুর্গম, বিভ্রান্তির-বিচ্যুতির মায়াজালে ঘেরা। তবুও মুক্তির প্রথম প্রহর পেরিয়ে, কত দুর্যোগের মোকাবিলা করে, অভিযাত্রীরা অগ্রসরমান! দুর্যোগ শেষে প্রতিবারই তাদের দৃষ্টিতে ভেসে উঠেছে বিশ্বাসের এক স্বপ্ন-বর্ণালী! প্রতিবারেই আজও! অনেক উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে সেই সংগ্রামী অভিযাত্রা আজও অদম্যগতি!

বর্ণালী। মেঘলা দিনে কখনও রৌদ্রাভ আকাশে ভেসে ওঠা সাতরঙের এক সমাহার। আমরা বলি 'রঙধনু' 'রঙধনুক'। জানি, সাতটি রঙ মিলেই সে প্রকৃত

www.pathagar.com

সমাহৃত রঙ! সেই রঙে আপাত অদৃশ্য সাতটি রঙ, কিন্তু সমাহৃত সেই রঙে কোন রঙই বিলুপ্ত নয়। কথাটা রঙের বেলায় যেমন সত্য, তেমনি সত্য বহু-রঙ মানুষের সমাহারে গড়া সমাজে ইসলাম-নির্দেশিত জীবন ও রাষ্ট্রের বেলাতেও। মহান মদিনা সনদে এ সত্যই প্রতিভাত।

সুদীর্ঘকালব্যাপী বাঙলায় যে মুসলিম শাসনকাল, তার মূল কথা ছিলঃ সমাহারের মধ্য দিয়ে যে মিলন, সেই মিলনের দেশ, সেই রঙধনুকের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

বীরাঙ্গনা সখিনা

চরিত্র–লিপি

উমর খাঁ	কেল্লা তাজপুরের মুঘল বংশীয় প্রৌঢ় দেওয়ান
সখিনা	উমর খাঁর ষোড়শী কন্যা
হরমুজ	উমর খাঁর প্রৌঢ় মোসাহেব
সরকার	উমর খাঁর বৃদ্ধ কর্মচারী
বেগম–আম্মা	দেওয়ান মুসা খাঁর বিধবা বেগম
ফিরোজ	দেওয়ান মুসা খাঁর তরুণ পুত্র
সায়ীদ	ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের বন্ধু
আদিল	ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের বন্ধু
তসবীরওয়ালী	তখনকার দিনের বিবাহের ঘটক
প্রত্রবাহী	পত্র বহনকারী
খবরিয়া	যুদ্ধের খবর দানকারী
সৈনিক	তখনকার দিনের সৈনিক
চারণ–কবি	বাঙলার ঐতিহ্যবাহী চারণ–কবি
ও	
সঙ্গীরা	চারণ–কবির সঙ্গী দোহারকিরা
এবং	
অন্যান্য	

www.pathagar.com

বীরাঙ্গনা সখিনা

(চারণ-কবির গানের আসর)

দিশা : আন্ধাইরে আশার প্রদীপ কে কখন জ্বালায়!
যুগে যুগে সেই না প্রদীপ জ্বইলা নিইভা যায় রে
জ্বইলা নিইভা যায়।

চারণ (সুরে) : সভা কইরা বইছেন সবে যত সমঝদার।
সকলের প্রতি জানাই সালাম আমার।।
জ্ঞানী-গুণীর মুখে শুনি — জাতির পরিচয়
কখনো বা ইতিহাসে মুখ লুকাইয়া রয়।।
প্রকাশ্যে তা আনব আমি এমন সাধ্য নাই।
তবু তার কিছু কথা প্রকাশ কইরা যাই।।
ভুলত্রুটি হইলে ক্ষমা করবেন নিজ গুণে।
মন যে আমার ভবিষ্যতের কতই স্বপ্ন বোনে!!

দিশা : আন্ধাইরে .... জ্বালায়!

চারণ : আল্লা-নবীজিরে সবে করিয়া স্মরণ।
জঙ্গলবাড়ির কথা কিছু শোনেন দিয়া মন।।
এই বাড়ির এক কুলবধূ সখিনা যার নাম।
তারে নিয়া আইজের পালা শুরু করিলাম।।
যেই কথা ইতিহাসে আছে সঙ্গোপনে।
তার কিছু জানাইব এই সভাজনে।।
আশা করি জানতে পারবেন- আমাদের এই দেশে
প্রয়োজনে মা-বইনেরাও সাজেন নববেশে।।

দিশা : আন্ধাইরে .... জ্বালায়!

চারণ : চাইর শ' বছরেরও আগে দুর্দিনে যখন
স্বাধীন সুলতানী বাঙলার হইল রে পতন!!
তখন যাঁরা দেশমুক্তির সাহসী সংগ্রামে
বীর যোদ্ধা, খ্যাত তাঁরা বারভূঞা নামে।।
তাঁদের নেতা ঈসা খান মসনদ-এ-আলা।
মহামুঘল আকবর শা'র দিন রাত্রির জ্বালা।।

www.pathagar.com

ত্রিপুরা ও ঢাকা–মৈমনসিং জুইড়া তাঁর
বাইশটি পরগণা নিয়া রাজ্যের বিস্তার।।

দিশা ঃ আন্ধাইরে .... জ্বালায়!

চারণ ঃ ঈসা খাঁ ভাটির নায়ক চাইলেন স্বাধীনতা।
দিকে দিকে খ্যাত তাঁর বীরত্বের কথা।।
ছুটিয়া আসিল দিল্লীর সৈন্য মহাবল।
বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায় বাঙলার বীর যুবাদল।।
স্বাধীনতার নিশান হাতে দাঁড়ায় সারি সারি।
বীর যুবাদল লইয়া নায়ক আইলেন জঙ্গলবাড়ি।।
চল্লিশ পুরা জমি রে ভাই জঙ্গল কাটিয়া।
শক্ত এক দুর্গ গড়েন যতন করিয়া।।

(সমবেত সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরম্ভ হয় তরুণদের নৃত্য)

সমবেত সঙ্গীত ঃ আসমানেতে মেঘ যেন সাজে ওই সাজে!
চারিদিকে ঢাক–ঢোল গুডু গুডু বাজে।।
হাওরেতে পাগলা ঢেউ তারই সাথে জাগে।
হাতের বৈঠাতে যেন যৌবনের টান লাগে রে
যৌবনের টান লাগে।।

শক্ত হাতে বৈঠা ধর্–
ওই আসমানে উঠছে ঝড়!
সামনে শত্রুর সৈন্যদল–
বুক ফুলাইয়া আগে চল্
গুড়াইয়া চল্ মাড়াইয়া চল্।
সামনে শত্রুর সৈন্যদল!!

(নৃত্যরত বাঙালী তরুণেরা এগিয়ে যাবে, তখনই আসে নৃত্যরত দিল্লী–সেনার দল। নেপথ্য কণ্ঠে ভেসে আসে আবৃত্তি। তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকলের বীর নৃত্য চলে)

নেপথ্যেআবৃত্তিঃ নানা স্থানে মুখোমুখি দিল্লী আর বাঙলার বাহিনী।
লেখা হয় বাঙালীর শৌর্যের কাহিনী।।
একের পর এক আসে দিল্লী সৈন্যদল।
রণক্ষেত্রে ঈসা খান দুর্জয় অটল।।
আইল কত মুঘলের নামী–দামী খান।
যুদ্ধে কেউ মরে, কেউ পলাইয়া যান।।

www.pathagar.com

অবশেষে মানসিংহ মৈত্রীর বন্ধনে।
আবদ্ধ হইলেন এসে ঈসা খাঁর সনে।।

(মঞ্চে মানসিংহ ও ঈসা খাঁ এসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। তাঁরা সবাই মঞ্চ ছেড়ে চলে গেলে আসে নৃত্যরতা তরুণীরা। নেপথ্যে গানের সঙ্গে চলে তাঁদের নৃত্য)

নেপথ্যে গান ঃ আমার ঘরে সাঁঝের বেলায়
প্রদীপ জ্বালতে দাও।
আমার দেশে বইতে দাও গো
শান্তি-সুখের বাও।।
ঘরে প্রদীপ জ্বালতে দাও।
তোমার যদি এতই শক্তি থাকে,
সন্তানহারা করবে কেন মা-কে?
দুঃখীজনকে অভয় দিয়ে
তার পাশে দাঁড়াও।
ঘরে প্রদীপ জ্বালতে দাও।
মৈত্রী আন মানব-মনের
দানব-মনের নয়।
মৈত্রী আন জন্-মানুষের
হৃদয় করে জয়।।
অন্যায়কে শক্ত আঘাত হানো,
ন্যায়ের বিজয় সত্য বলে মানো।
ভাইয়ের পানে অসঙ্কোচে
প্রীতির হাত বাড়াও।।
ঘরে প্রদীপ জ্বালতে দাও।

(নৃত্য-গানের শেষ দিকে দুর্যোগের শব্দ ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে আসে। তরুণীরা উৎকর্ণ-উদ্বিগ্ন হয়ে চলে যায়। মঞ্চে আসে চারণ-কবি ও সঙ্গীরা)

চারণ (সুরে) ঃ মৈত্রী-বন্ধন ক্রমে হয় গলার ফাঁস।
মিত্রের শোষণে সবার ওঠে নাভিশ্বাস।।
ঈসা খাঁর বীর পুত্র মুসা খাঁ দেওয়ান।
অন্যায়ের প্রতিরোধে হয় আগুয়ান।
কিন্তু ততদিনে দেশে মুঘল শাসন।
প্রতিষ্ঠিত কইরা নিছে নিজের আসন।।

www.pathagar.com

অবশেষে মুসা খাঁর জীবন হইল শেষ।

নিরাশায় ডুইব্যা রইল পরাধীন দেশ।।

দিশা : আন্ধাইরে .... জ্বালায়!

চারণ : ঈসা খাঁর নাতি এক বীর ফিরোজ খান।

দিনে দিনে বাড়ে যেন পুণ্ণমাসীর চান।।

সারাক্ষণ ভাবে ফিরোজ– স্বাধীন সুখী দেশ!

বৈদেশী শাসন–জ্বালা কখন হইব শেষ!!

(মঞ্চে দেখা দেয় ফিরোজ, সঙ্গে সাথীবৃন্দ)

ফিরোজ : যতেক খেরাজ পাই তার আধাআধি।

দিল্লীকে দিয়া আমি রাখিয়াছি গদী।।

আমার দেশের লোক দুঃখে কাটায় দিন।

নতশির হইয়া চলে সুখশান্তিহীন।।

সায়ীদ : কেল্লা তাজপুরে বসে মুঘল দেওয়ান

উমর খাঁ শোষিছেন এদেশের প্রাণ!!

ফিরোজ : মৈত্রীর ফাঁস আর গলায় পরিব না।

নতশির দেওয়ানগিরি আর করিব না।।

আদিল : কিন্তু তাতে বিপদকে যে ডেকে আনা হবে!

উমর খাঁ কি চুপচাপ দুর্গে বসে রবে!!

ফিরোজ : যা আছে নসীবে লেখা শোন বন্ধুগণ!

স্বাধীনতার জন্য করব এ জীবন পণ!!

ওইখানে চল যাই তরুণদের কাছে।

শুনি তাদের এ সম্বন্ধে কি বলার আছে।।

(ওরা দ্রুত পায় চলে যায়। চারণ–কবি উৎকর্ণ হয়ে শোনে–)

নেপথ্যে সকলে : স্বাধীনতার জন্য যদি আসেই মরণ–

পিছাব না, আমাদের এ–জীবন পণ!!

(উদ্বুদ্ধ চারণ–কবি ও অন্যরা দ্রুত চলে যায়। মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বললে দেখা যায়– বহমূল্য ছড়ি হাতে বেড়াতে বেরিয়েছেন প্রৌঢ় উমর খাঁ, সঙ্গে মোসাহেব হরমূজ মিয়া)

উমর খাঁ : এ জীবন পণ? তুমি ... হরমুজ মিয়া

এ কথার গূঢ় অর্থ দাও তো বুঝাইয়া।।

www.pathagar.com

হরমুজ : হুজুর, আমি ভাবিতেছি।
উমর খাঁ : ভাবিতেছ? কি?
হরমুজ : পান্তা ভাতে কেউ কেউ মাখাইতে চায় ঘি।।
উমর খাঁ : বুঝাইলে যা– কিছুই তার গেল না তো বোঝা!
হরমুজ : কারণ এই কথাটা যে অতিশয় সোজা।।
উমর খাঁ : মিয়া হরমুজ!
হরমুজ : এই যে আমি দেওয়ান হুজুর!
উমর খাঁ : মস্তিষ্কের অবস্থা কি খুবই কমজোর?
হরমুজ : হলেও তাতে কাম চলে। ভয়ের কিছু নাই।
উমর খাঁ : সহজ সরল উত্তর আমি শুনতে চাই।।
হরমুজ : হুজুর তো দেওয়ান এই কেল্লা তাজপুরে?
উমর খাঁ : হ্যাঁ।
হরমুজ : আরেক দেওয়ান মাথা তোলেন অল্প কিছু দূরে।।
উমর খাঁ : আমি উমর খাঁ দেওয়ান!
হরমুজ : দুইজনই খান,
দু'জনই দেওয়ান। তাজপুর আর জঙ্গলবাড়ি।
ভাবতাছি এ পোশাক ছাইড়া পইড়া ফালাই শাড়ী।।
উমর খাঁ : কেন কেন?
হরমুজ : কারণ আপনে খাস মুসলমান,
শরীফ খান্দান– নাম উমর খাঁ দেওয়ান।।
দিল্লী থনে মনোনীত, খোশ নামদার।
আর হুজুর, ওই ব্যাটা– পাখা গজায় যার
কালিদাস গজদানীর বংশধর, তিনিও দেওয়ান!
ভাটি মুল্লুক নিয়া এইবার স্বাধীন হইতে চান!!
ক'ন হুজুর– হাসি পায় না? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ–
তাই কই, পুরুষের পোশাক–আশাক আর পরব না।।
চেংড়ার দল নিয়া কয়ঃ এ জীবন পণ!
উমর খাঁ : হাঃ হাঃ হাঃ .... (হঠাৎ গম্ভীর কন্ঠে) তাকে ডাকছে মরণ।।
হরমুজ : অবশ্যই অবশ্যই। পতঙ্গের উঠছে যখন পাখ্।
সোজা পথ ছাইড়া ধরে অন্য পথের বাঁক।।
কিন্তু হুজুর, সহজে কি মরতে চাইব ব্যাটা?
ঈসা খাঁর নাতি কিনা, অতিশয় ঠ্যাটা।।

www.pathagar.com

উমর খাঁ : এত্তেলা দাও তাকে– খেরাজ আমি চাই!
আনুগত্য ছাড়া তার কোন পথ নাই।।

(হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করে কঁকিয়ে ওঠেন)

হরমুজ : হুজুর দেওয়ান! আপনের কি হইল আচানক?

উমর খাঁ : হাকিম বোলাও। বুকে ব্যথা ....

হরমুজ : বেশক, বেশক!!

(ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। উমর খাঁও কোন রকমে চলে যান)

(কথা বলতে বলতে ফিরোজের কক্ষে আসেন
বেগম–আম্মা ও ফিরোজ)

বেগম–আম্মা : পুত্রধন! কবরে শুইতে আর বেশি বাকী নাই।
পুত্রবধূর মুখ আমি দেইখ্যা যাইতে চাই।।

ফিরোজ : রাজ্যের যত চিন্তা আম্মা করি দিন রাইত।
শাদী না করব আমি, থাকব আবিয়াইত।।

বেগম–আম্মা : তা–ও কি কখনো হয়? বিয়া ছাড়া চলে?
দেওয়ানগিরি করবা ভাল বিয়াশাদী হলে।।

ফিরোজ : লোকজনের সুখ শান্তি? আমার ভাটি দেশ?
পরাধীন হইয়া আম্মা অশান্তি অশেষ!!

বেগম : ভাগ্যের লিখন বাবা মাইন্যা নিতে হয়।
স্বাধীনতা ফিইরা পাওয়া কাজ তো সহজ নয়!!
তোমার যিনি পিতামহ, সেই ঈসা খান ....

ফিরোজ : তাঁরই স্মৃতি ভরে আছে সারা মন–প্রাণ!!
তাঁরই রক্ত প্রবাহিত প্রতিটি শিরায়।
তাঁরই পথে চলতে আমায় ডাক দিয়ে যায়!!

(বাইরে থেকে তসবীরওয়ালী ডাকে–)

তসবীরওয়ালী : আমি তসবীরওয়ালী। আসতে পারি ঘরে?

বেগম–আম্মা : এস এস।

(তসবীর ওয়ালী এসে তসলিম জানায়)

কি ব্যাপার, এতদিন পরে??

তসবীরওয়ালী : দূর–দূরান্তরে যাই, তসবীর দেখাই।
কপাল যদি খুইল্যা যায়, বকশিশ পাই।।

(ফিরোজ বাইরে যেতে চায়, বেগম–আম্মা বাধা দেন)

www.pathagar.com

বেগম–আম্মা ঃ ফিরোজকে দেখাও না, তসবীর যত আছে।
যাওয়ার বেলা অন্দরেতে আইসো আমার কাছে।।

(চলে যান। তসবীরের ডালা খোলে তসবীরওয়ালী। ....

(তসবীরওয়ালী এক–এক করে তসবীর বের করে দেখায়, আর সুরেলা কণ্ঠে গানের মত করে গেয়ে যায়। দেহভঙ্গিতে তার নৃত্যছন্দ)

তসবীরওয়ালী ঃ শাখে শাখে নয়া পাতা কোকিল করে রাও।
রূপের দরিয়ায় ভাসে যৈবনেরি নাও–
দেওয়ান আঁখি মেইল্যা চাও।।
আল্লা'র নাম নিয়া খুলি তসবীরের ডালা।
যৈবন আর রূপের আলোয় আন্ধাইর হয় উজালা।।
এই না কন্যা রূপের রাণী পায়ে পড়ে চুল।
মুখের হাসিতে ফোটে কণক চাম্পা ফুল।।
আগল–ডাগল আঁখি আসমানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখলে যারে না যায় পাশুরা রে–
না যায় পাশুরা।।
আর কন্যা দেখ দেওয়ান কালো–কাজল আঁখি।
ভোমরা উড়িয়া আসে কন্যার রূপ দেখি।।
অগ্নিপাটের শাড়ী কন্যা সোনা অঙ্গে পরে।
চন্দ্রতারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে গো–
দেখিয়া কন্যারে।।
অপরূপা এই কন্যা গায়ে পদ্মের বাস।
চোখ ভরিয়া দেইখা চোখের না মিটে তিয়াস।।
চলিতে ফিরিতে কন্যার যৈবন পড়ে ঢলে।
কাকুনি সুপারী গাছ বাঁয়ে যেন হেলে রে–
বাঁয়েযেনহেলে।।
সব শেষে দেখ দেওয়ান কন্যা সখিনায়।
রূপের বর্ণনা দিতে ভাষা না জোয়ায়।।
বেলাইনে বেলানো যেন দুই বাহুলতা।
কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কোকিলে কয় কথা গো–
কোকিলে কয় কথা।।

www.pathagar.com

পদ্ম আঁখি সখিনার চাঁদ মুখখানি।
ভাগ্যবতী এই কন্যা হইব রাজরাণী।।

ফিরোজ : সখিনা?!

তসবীরওয়ালী : নাম সখিনা।

ফিরোজ : এই কন্যাটি কে?

তসবীরওয়ালী : উদাস উদাস মনে নাড়া দিল যে??

ফিরোজ : এঁ্যা!

তসবীরওয়ালী : হ্যাঁ, এই কন্যা উমর খাঁর ঝি।

(মিউজিক ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে)

ফিরোজ : উমর খাঁ!! কেল্লা তাজপুর ....

তসবীরওয়ালী : তাতে কি?

ফিরোজ : না, কিছু না। উমর খাঁ যে ....

তসবীরওয়ালী : আমরা জানি–
কোন জানাই শেষ জানা নয়।

ফিরোজ : মানি।।

(ফিরোজ দ্বিধাগ্রস্ত, চিন্তামগ্ন। তা লক্ষ্য করে তসবীরওয়ালী বলে–)

তসবীরওয়ালী : তাহলে কি তসবীরটা রেখে যাওয়া যায়?
অথবা তা ডালায় ভরে ....

(ফিরোজ যেন জেগে ওঠে)

ফিরোজ : না না। কোই হ্যায়??

(তসবীর হাতে নেয় ফিরোজ। পরিচারিকা আসে ফুল ও মুদ্রায় সাজানো পাত্র নিয়ে। ফিরোজ তা ছুঁয়ে দিয়ে তসবীরওয়ালীকে দিতে ইঙ্গিত করে। তসবীরওয়ালী হাসিমুখে তসলিম জানিয়ে পরিচারিকার হাত থেকে তা নিয়ে চলে যায়। পরিচারিকাও চলে যায়। তসবীর হাতে দাঁড়িয়ে তা নির্বিষ্টভাবে দেখে ফিরোজ)

তসবীরে বসিয়া যেন পুণ্ণমাসীর চান!
একবার দেখিলে নাই সে জুড়ায় নয়ান!!

(বন্ধু সায়ীদ আসে)

বন্ধু সায়ীদ! অসময়ে এইখানে কেন?

সায়ীদ : ফিরোজ, ও পক্ষের খবর আছে শোন।।

www.pathagar.com

আমাদের স্বাধীনতায় বাধাদানকারী
উমর খাঁ শয্যাশায়ী, রোগ হয়েছে ভারী।।

ফিরোজ : তাই না কি!

সায়ীদ : আমরা বলি– এটা সুসময়।
আক্রমণ করি যদি, খুবই ভাল হয়।।

ফিরোজ : কিন্তু এটা বীরধর্ম নয়!
(হাতের তসবীরটা দেখে নিয়ে) তার চেয়ে চল
শিকারেতে যাই আমরা। সবাইকে বল।।

সায়ীদ : আমরা কি শিগগীরই ফিরে আসব ঘরে?

ফিরোজ : হয়তো দেরী হবে, হয়তো .... স্থির হবে পরে।।

সায়ীদ : দেওয়ানগিরি? কে করবে?

ফিরোজ : কোন চিন্তা নাই।
আম্মা আছেন, উযীর আছেন– তাইতে ভরসা পাই।।
শোন, আমি ফকীর সেজে এক্ষুণি আসছি।

সায়ীদ : হঠাৎ ফকীর সাজার কারণটা কি ভাবছি!!

ফিরোজ : আদেশ পালন কর, কোন ভাবনা নাই।
সঙ্গে নিতে হবে শুধু হাকিমী দাওয়াই।।

সায়ীদ : ফকীর .... দাওয়াই .... তবু ভাবতে কর মানা।
তোমার মনে রঙটি যে কি হল না ভাই জানা।।

ফিরোজ : রঙধনুকের রঙ জান সাতটি রঙে গড়া!
কে জানে ভাই মনের রঙটি কোন্ রঙে যে ভরা!!

(দু'জন দু'দিকে চলে যায়। মঞ্চ অন্ধকার। অন্ধকারেই শোনা যায়– কয়েকটা ঘোড়া ছুটে চলেছে, কাছে থেকে দূরে। কথা বলতে বলতে মঞ্চে আসেন বেগম–আম্মা ও তসবীরওয়ালী)

বেগম–আম্মা : দেশ আর দেশ কইরা কাটে সারাক্ষণ।
রঙ মাখা তসবীরে বান্ধা পড়ব মন??

তসবীরওয়ালী : পানির গতি দেখামাত্র চউক্ষে ধরা যায়।
মনের গতি কোন্ দিকে যে বোঝা বড় দায়।।

বেগম–আম্মা : সখিনা যে শত্রু কন্যা, এই তো মুস্কিল!
উমর খাঁ তো এতটুকু নয় দরাজদিল!!

তসবীরওয়ালী : কোয়েলার স্বরে যখন হৃদয় ব্যাকুল।
অনায়াসে তোলা যায় কাঁটা ঘেরা ফুল।।

www.pathagar.com

(দু'জনই চলে যায়। .... পথে কথা বলতে বলতে আসে সায়ীদ ও আদিল)

আদিল : হয় হয়, আচানক কত কিছু হয়।
বিনা মেঘে বিষ্টি নামে, মরায় কথা কয়।।

(দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়)

(সদ্য রোগমুক্ত উমর খাঁ আবার বাইরে এসেছেন, সঙ্গী হরমুজ মিয়া)

হরমুজ : হুজুর দেওয়ান, শোকর আল্লা'র কাছে।
আমাগোর সুখশান্তি ফিইরা আসিয়াছে।।
আপনে ভাল হইছেন, আনন্দের ঢল্
তাজপুরের মাঠে-ঘাটে।

উমর খাঁ : শরীর দুর্বল!!

হরমুজ : অল্পস্বল্প দুর্বলতা সাইরা যাইব গা।
আবার হইবেন সেই দেওয়ান উমর খাঁ।।
কিন্তু আচানকের কথা, বুঝতে পারি না-
হাতী ঘোড়া গেল তল, অবশেষে কিনা
নাম ধাম জানা নাই- তরুণ ফকীর
রোগ সারাইল, নাম কিনিল, চক্ষু হইল থির!!

উমর খাঁ : কোথায় তিনি? ফকীর সাহেব বড়ই কামেল।
আল্লা' যেন করেন তার মকসুদ হাসেল!!

হরমুজ : তরুণ ফকীর-, কোথাও বেড়াইতে গেছেন।
হয়তো কোন মকসুদেরই খোঁজ করতাছেন!!

(দু'জনই মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আবার আলোকিত হলে দেখা যায়- বাগানে একটা গাছের এপাশে দাঁড়িয়ে আছে ফকীরবেশী ফিরোজ, আর গাছের ওপাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সখিনা। দু'জনের স্বগতোক্তির সময় দু'জনকে ভিন্ন ভিন্ন আলোর প্রক্ষেপণে ভিন্ন করে দেখাতে হবে)

ফিরোজ : এ কি সেই কন্যা, সেই কুমারী সখিনা?
ধ্যানে যার বেজেছিল সপ্তসুর বীণা!!

www.pathagar.com

সখিনা : তরুণ ফকীর নির্জনে আনমনা।
সুন্দর সুঠাম দেহ, কবি–কল্পনা!!

ফিরোজ : তসবীরে এত রূপ আঁকা নাহি যায়!
শুধু যেন সম্ভব তা মন–তুলিকায়!!

সখিনা : স্বপ্ন–ঘোরে কখনো কি এ–মুখ দেখেছি?
এরই ধ্যানে কখনো কি শয়নে জেগেছি!!

(সখিনা আরও এগিয়ে আসে। গাছের এপাশে–ওপাশে দু'জন। এবার খুবই সংক্ষিপ্তভাবে দু'জনে কথা বলে)

ফিরোজ : ইয়ে .... আপনাকে চিরদিন মনে রাখা যায়।
সখিনা : আপনারও উপস্থিতি ভুলে যাওয়া দায়!!
ফিরোজ : আসি তবে।

(ধীর পায় ফিরোজ চলে যায়)

সখিনা : এ তরুণ কে? সত্যিই ফকীর!
সংসারত্যাগী.... কিংবা .... ছদ্মবেশী বীর!!

(তসবীরওয়ালী আসে)

তসবীরওয়ালী : আমি জানি কিছু খবর, কিছু জানি না।
মনের রঙ ধরতে পারি, কিছু পারি না।।
সখিনা : তসবীরওয়ালী! তুমি কি জান খবর?
তসবীরওয়ালী : জেগে জেগে কাটে কার রাইতের পহর!!
সখিনা : জান যদি, বল তবে ....
তসবীরওয়ালী : (ফিরোজের গমন–পথে ইঙ্গিত করে) ওঁর পরিচয়?
সত্যিকার ফকীর ইঁনি কোনদিন নয়।।
সখিনা : তাহলে?!
তসবীরওয়ালী : ইঁনিই তো ফিরোজ খাঁ দেওয়ান!
একটি তসবীর দেখে হইল পেরেশান।।
সখিনা : তারপর?
তসবীরওয়ালী : নিলেন এই ফকীরের বেশ।
একটি নামের ধ্বনি কানে তোলে রেশ!!
সখিনা : কার নাম?

www.pathagar.com

তসবীরওয়ালী ঃ সখিনার, সখিনারই ছবি-
ফিরোজ খাঁ দেওয়ানে শেষে করিয়াছে কবি!!

(সখিনার হাতে দেয় ফিরোজের তসবীর। সখিনা লজ্জায় মুখ ফিরায়। বিদায় নেয় তসবীরওয়ালী— নীরবে, হাসিমুখে তসলিম জানিয়ে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আবার আলো জ্বললে দেখা যায়- নিজ ঘরে একা সখিনা ফিরোজের তসবীর নিয়ে তন্ময়। ভেসে আসছে গান-)

নেপথ্যে
নারীকণ্ঠে গান ঃ কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে
গো নিরলে।
কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে।।
জ্বালাইয়া স্মরণের বাতি
জাগে আমার অঘুম রাতি গো
আশার তরী ডোবে কখন নিরাশার অতলে।।
কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে।

(মঞ্চের এদিকের আলো নিবে গেলে ওদিকের আলো জ্বলে। সেখানে ফিরোজও তন্ময়। ভেসে আসে গান-)

নেপথ্যে
পুরুষকণ্ঠে গানঃ স্বপ্নে যেন স্বপ্ন-লেখা
দেখা দিয়া হয় অদেখা গো
মেঘের আড়ে চান্দের বাতি রিমিঝিমি জ্বলে।।
কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে।

(বন্ধু সায়ীদ এসে লক্ষ্য করে দেওয়ান ফিরোজকে)

সায়ীদ ঃ যত আশা পূরবে বন্ধু, মন কর স্থির।
শাদীর পয়গাম নিয়া গিয়াছে উযীর।।

(দু'জন দু'জনের হাত ধরে বেরিয়ে যায়)

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আলোকিত হলে দেখা যায়- বেড়াতে বেরুনো উমর খাঁ আর হরমুজ মিয়াকে)

হরমুজ ঃ উযীর? হুজুর, কানা ছেলের পদ্মলোচন নাম।
উযীর বুঝি? আইল নিয়া শাদীর পয়গাম!!

www.pathagar.com

		· সত্য সত্য ঢুইক্যাছিল হুজুরের ঘরে?
		শুনতে বড়ই সাধ হয়- কি হইল তার পরে!!
উমর খাঁ	ঃ	আকাশচুম্বী স্পর্ধা ওদের, কোথাকার কে?
হরমুজ	ঃ	হুজুরের খাঁন্‌দানে পয়গাম এনেছে!!
		দিনে দিনে দুনিয়াটা গেল রসাতলে।
		নইলে কি জঙ্গলবাড়ির কোন্ ব্যাটা বলে-
		বিবি সখিনারে আমরা বউ করতে চাই!
		ছোটা-বড়া উঁচা-নীচা ভেদাভেদ নাই!!
উমর খাঁ	ঃ	এই দেশ- ভাটি দেশ, উল্টা-পাল্টা সব।
		চারদিকে ঘিরে শুধু যত বেয়াদব!!
হরমুজ	ঃ	মান্যগণ্য আদব-কায়দা লেশমাত্র নাই।
		ইচ্ছা করে হুজুর, আমরা দিল্লী চইল্যা যাই!!
উমর খাঁ	ঃ	উমর খাঁর মেয়ে চায় ঈসা খাঁর ঘরে?
হরমুজ	ঃ	এই অপমান মাইন্‌ষে কেমনে সহ্য করে!!
		আশা করি উপযুক্ত অপমানসহ
		বিতাড়িত হইয়াছেন শাদীর বার্তাবহ??
		দেয়াদব, বেআক্কল ....
উমর খাঁ	ঃ	(রেগে গিয়ে বলেন-) হ্যাঁ হ্যাঁ, তা-ই!
হরমুজ	ঃ	চলেন হুজুর, আমরা ঘরে চইল্যা যাই।।

(দু'জনই চলে যায়। মঞ্চ অন্ধকার। আলো জ্বললে দেখা যায়- ফিরোজ ও বন্ধুরা বেশ উত্তেজিত)

সায়ীদ	ঃ	পরের ধনে পোদ্দারি যেই উমর খাঁর।
		খান্দান নিয়া তার এত অহঙ্কার??
আদিল	ঃ	মোঙ্গলদের রক্তবাহী ওই মুঘলেরা
		যাকে-তাকে মনে করে শুধু গরু-ভেড়া।।
ফিরোজ	ঃ	খান্দান বিচারে আর কোন লাভ নাই।
		উমর খাঁর বক্তব্যের প্রতিশোধ চাই!!

(মঞ্চ অন্ধকার। অন্ধকারেই ভেসে আসে অনেকের সমবেত কণ্ঠঃ **"চাই চাই, প্রতিশোধ চাই!!"** সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে অনেক অশ্বের হ্রেস্বাধ্বনি। পরক্ষণেই ছুটে যায় অনেকগুলি অশ্ব। স্বল্পালোকিত মঞ্চে এবার আলো-আঁধারের রহস্যে দেখা যায়- তসবীরওয়ালী ক্ষিপ্র তৎপরতায় সখিনার

www.pathagar.com

হাত ধরে দ্রুত বেরিয়ে যায়। আবার অনেক অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। সেই ধ্বনি কাছে থেকে দূরে মিলিয়ে যায়। মঞ্চে এসে বসে পড়ে পরিশ্রান্ত হরমুজ। সঙ্গে সঙ্গে আসে উমর খাঁর বৃদ্ধ সরকার)

সরকার ঃ মাটিতেই বইসা গেলা হরমুজ মেয়া?

হরমুজ ঃ চউক্ষের পলকে ক্যামনে লইয়া গেল গ্যেয়া!!

সরকার ঃ চাইর দিকে তো রটাইছ মিথ্যা পরিচয়।
ঈসা খাঁর ওয়ালেদান আফগান নয়।।
কালিদাস গজদানীর বংশধর তারা।
এখন তো কর্মখান হইয়া গেল সারা!!

হরমুজ ঃ হুজুরের সরকার, রাখেন সরকারি।
পারেন যদি বাৎলান সমাধান তারি।।

সরকার ঃ হুজুর তো মহাক্রুদ্ধ, তাঁর কাছে যাও।
সমাধানের যত পথ তাঁরে বাৎলাও।।

হরমুজ ঃ মোসাহেব হইছি যখন না গিয়া কি করি।
কওনের যা কইয়া দিমু, বাঁচি আর মরি।।

(হাতে ভর দিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় হরমুজ)

সরকার ঃ সর্বনাশের শেষ রক্ষা পার যদি কর।
শয়তানি রাইখা হরমুজ সোজা পথ ধর।।

হরমুজ ঃ দোয়া চাই– গরীবের পূরে যেন আশা।
কত কথা এই বুকে .... পায় যেন ভাষা!!

(শেষ কথাগুলোতে এক ভয়ঙ্কর রহস্যময় চরিত্রের লোক বলে মনে হয় হরমুজকে। চলে যায় হরমুজ। তার গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাবতে ভাবতে চলে যায় সরকারও)

(এদিকে ফিরোজ–সখিনার মিলন দৃশ্য। উদ্যানে বেড়াচ্ছে দু'জন। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে গান– যেন তাদেরই মনের কথা)

নেপথ্যে গান ঃ যতবার দেখি ভাবি ততবার– দুই যেন দুই নয়!
হাজার বছর প্রাণে বাঁধা প্রাণ,
দু'য়ে একই পরিচয়!!

www.pathagar.com

কত জনমের সাথী,

তুমি কত জনমের সাথী!

তোমারি ধেয়ানে কেটেছে বন্ধু

কত না দিবস–রাতি।

ব্যাকুল বাঁশরী কত না ডেকেছে

সুরে সুরে তন্ময়।।

তোমারি আশায় জ্বলিয়া নিভেছে

কত না সাঁঝের বাতি।

কত যুগ পরে তুমি আর আমি

আবার হয়েছি সাথী।।

মত্ত দাদুরী ডেকেছে,

কত মত্ত দাদুরী ডেকেছে!

ডাহুকীর ডাকে অবুঝ পরাণ

কত না উতল হয়েছে।

ভাদর–আকাশ আজিকে বন্ধু

হয়েছে বাদলময়।।

(প্রকৃতিতে ঝড়, মেঘগর্জন, দুর্যোগ। ফিরোজ ও সখিনা নির্বাক, মলিন মুখ। হাত ধরাধরি করে ত্রস্তে চলে যায়। অন্ধকার। আলো জ্বললে দেখা যায় ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ পরায়ণ উমর খাঁ–কে। পাশে নতমুখে হরমুজ)

উমর খাঁ : এতদিন হয়ে গেল, এল না তো ফিরে!
পত্রবাহী হাওয়া খায় যমুনার তীরে??

(সরকার এসে দূরে নীরবে দাঁড়ায়)

হরমুজ : দিল্লী তো অনেকটা দূর, যাতায়াতে তাই
দেরী কিছু হইয়া যায়, ভয় চিন্তা নাই।।

(তখনই আসে পত্রবাহী দূত)

পত্রবাহী : হুজুর দেওয়ান!

হরমুজ : আইসা গেছে পত্রবাহী!

উমর খাঁ : (পত্রবাহীকে বলেন–) কামিয়াব দূত?

পত্রবাহী : (বাদশাহী ফরমান দিয়ে) ফরমান শাহানশাহী।।

উমর খাঁ : আমি আজ খুশী!

(ভেতরে যান)

www.pathagar.com

হরমুজ : (পত্রবাহীর কাছে গিয়ে) আসে দিল্লী–সেনাদল?
ধ্বংস হবে ফিরোজের অহঙ্কার বল??

(পত্রবাহী নীরবে সায় দিয়ে চলে যায়)

(হরমুজের চোখে মুখে পৈশাচিক আনন্দ)

হরমুজ : তাইলে তারা আইতাছেন!

সরকার : (পরিহাস তরল কণ্ঠে) আইতাছেন।
বহু কায়দা কইরা যখন পত্র লেইখাছেন,
না আইসা কি পারে? মুঘলের সেনা–
শয়তান পিশাচের উপদেশে কেনা
কত শত সৈন্য আসে?

হরমুজ : (পরিহাসটা গায় না মেখে) সংখ্যাটা জানা নাই।
যা–ই আসে, কাম ফতে হইব তা দিয়াই।।

(উমর খাঁ ফিরে আসেন। করজোরে সরকার বলে–)

সরকার : হুজুর এই সমস্যাটা ....

উমর খাঁ : (পৈশাচিক ক্রূরতায়) না। ধ্বংস হোক ওরা!
শান্তি নাই ফিরোজের পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া!!

সরকার : সখিনার অপরাধ ....

উমর খাঁ : হ্যাঁ হ্যাঁ– অপরাধী শতবার।
পুত্রকন্যা যেই হোক ক্ষমা নাই তার।।

হরমুজ : বিচারক। হুজুর অতি ন্যায় বিচারক।
আমি শুধু মাঝে মধ্যে হই আচানক
যখনই ভাবিতে চাই–

উমর খাঁ : (রাগে ধমক দিয়ে) হরমুজ!

হরমুজ : (ঘাবড়ে গিয়ে) নাই ....
মানে কোন কথা ....

উমর খাঁ : সরকার!

সরকার : (তসলিম জানিয়ে) আমি যাই।।

(সরকার চলে যায়)

উমর খাঁ : ওই জঙ্গলবাড়ি আর কেল্লা তাজপুর
দূর বটে, তবু একটা বেশি নয় দূর।।
ওইটা পানির দেশ, খালে–বিলে ভরা।
মুঘল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করা ....

www.pathagar.com

শেষে যদি .... হরমুজ, মুঘল দুর্জয়
যুদ্ধটা যদি ওই স্থলযুদ্ধ হয়।।

হরমুজ : কিন্তু হুজুর, যুদ্ধটা এমন জিনিষ–
লেগে যখন যায় এটা, কারও কোন দিশ
থাকে না তখন। সামনে পাইলেই কাটো।
আর যদি বেগতিক দেখ– পিছে হাঁটো।।

উমর খাঁ : আবার বলছি– ভাটি খালে–বিলে ভরা।
ভাল হবে সেইখানে গিয়ে যুদ্ধ করা??

হরমুজ : ওইটা যে নৌযুদ্ধ! মুঘলদের মতই
নৌযুদ্ধে আমি আবার পারদর্শী নই।।

(উমর খাঁ আরও বিরক্ত হন)

ইদানীং শরীরটা .... ওই তো ওই দিকে
আসতে দেখি হুজুরের সেনাপতিকে।।
ডাকি তাঁরে? কিন্তু .... মানে হুজুর দেওয়ান!
নিবেদন করতে চাই কথা একখান।।
অন্দরেতে মা জননী .... তাঁর উপদেশ ....

উমর খাঁ : না না, চুপ। আমি চাই ফিরোজের শেষ!!

(রাগে চলে যান উমর খাঁ। হরমুজও পিছু নেয়)

– অন্ধকার –

(ওদিকে ফিরোজ ও সখিনা হাত ধরাধরি করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কথা বলে–)

ফিরোজ : কথা কও। এ সময় বন্ধু কথা কও!
আজ তো আমার থেকে তুমি দূরে নও!!

সখিনা : কত কথা বলা বাকী, কত আশা মনে!
এ–জীবন, এই দেশ– গড়ব দুইজনে!!

ফিরোজ : এখনো মেহেদী রঙে দুই হাত আঁকা!
তোমার আমার চোখে কত স্বপ্ন মাখা!!

সখিনা : ঈসা খাঁর নাতি তুমি, ভাব তাঁর কথা।
বীর কণ্ঠে ধ্বনি ছিল– চাই স্বাধীনতা।

ফিরোজ : চাই স্বাধীনতা!

সখিনা : চাই মুক্ত জীবন!
বিদেশী শাসন–মুক্তি .... এই ছিল পণ।।

www.pathagar.com

ফিরোজ : এই-ই ছিল পণ! পাশে ছিল স্বর্ণময়ী-
যাঁর প্রেরণায় তিনি জীবন-বিজয়ী!!

সখিনা : তাঁরই স্মৃতি বুকে নিয়ে তুমিও দাঁড়াও।
পিতাজীর শত্রুতার যোগ্য জবাব দাও।।

ফিরোজ : সখিনা, সখিনা!

সখিনা : ফিরোজ!

ফিরোজ : তুমি বীরাঙ্গনা!

সখিনা : কোন দ্বিধা, কোন বাধা আমরা মানব না।।

(অন্ধকার। অন্ধকারেই ওরা দৃপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়।
অন্ধকারেই শোনা যায় সমবেত কণ্ঠের উদ্দীপ্ত
ঘোষণাঃ **"মানব না, কোন বাধা মানব না!!"**
আলো-আঁধারিতে মঞ্চে দেখা যায় হরমুজ মিয়াকে)

হরমুজ : তাইলে গোলমালখান লাইগ্যাই গেল!
সেনা-সৈন্য যথেষ্টই দিল্লী থনে এল।।
জোর কইরা ধইরা নিয়া বিয়াশাদী শেষ।
এইবার দুইজনে স্বাধীন করব দেশ!!
করবা, স্বাধীন করবা। সুখে থাকবা।
নিশিরাইতে স্বপ্নঘোরে কত ছবি আঁকবা!!
সে-সুযোগ কইরা দিতে আমিই তো আছি!
মোসাহেব হরমুজ একটা কানা মাছি।।

(হঠাৎই হরমুজের ভাবান্তর হয়। হয়ে ওঠে অন্য মানুষ)-
মাছিখানে কত কথাই মনে জমা রাখে!
ভবিষ্যৎ ধ্বংসের কত স্বপ্ন আঁকে!!

(চলে যায় হরমুজ। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আবার আলোকিত হলে
দেখা যায়— বেগম-আম্মার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফিরোজ,
সায়ীদ, আদিল। ওরা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে
সখিনা)

সায়ীদ : বিদায় চাই বেগম-আম্মা; তৈরী সেনাদল।
ভয় নাই, আমরা নই ভীরু হতবল।।

বেগম-আম্মা : ফিরোজের বন্ধু তোমরা, তার কাছে থেকো।
পথ পানে রইবো চেয়ে- এটা মনে রেখো।।

www.pathagar.com

আদিল ঃ আমাদের মধ্যমণি ফিরোজ দেওয়ান।
তার হুকুমে সকলেই বাজি রাখছি প্রাণ।।

ফিরোজ ঃ চলি আম্মা, বন্ধু চল, তোমরা যাও ঘরে।

(ফিরোজ অদূরে দাঁড়ানো সখিনার দিকে তাকায়)

ভয় নাই, ফিরে আসব যুদ্ধ জয় করে।।

(ফিরোজের সঙ্গে সায়ীদ-আদিল চলে যায়। তাদের প্রতি তাকিয়ে বলেন বেগম-আম্মা-)

বেগম-আম্মা ঃ দেশের সম্মান রেখো- আল্লা' হাফেয!

সখিনা ঃ আল্লা' হাফেয!

বেগম-আম্মা ঃ (অস্ফুট কণ্ঠে) আল্লা' হাফেয!

সখিনা ঃ (অস্ফুটতর কণ্ঠে সখিনা বলে-) আল্লা' হাফেয!!

(ধীরে ধীরে মঞ্চে অন্ধকার নামে। বাইরে অনেক অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। পরক্ষণেই শোনা যায় সমবেত কণ্ঠের উদ্দীপ্ত ঘোষণা- **"ভাটির দেশ, জিন্দাবাদ!!"** অনেক অশ্ব দ্রুত ছুটে চলে। সখিনাকে নিয়ে বেগম-আম্মা চলে যান। .... ক্ষীয়মান অশ্ব-পদধ্বনি আবার স্পষ্টতর হয়। যুদ্ধের কোলাহল। যুদ্ধ-বাদ্য। ভেসে-আসা এসব শব্দের মধ্যেই আসেন চিন্তিত-উত্তেজিত উমর খাঁ, সঙ্গে ঘাবড়ে যাওয়া হরমুজ মিয়া)

হরমুজ ঃ জোর পাই না, শইল্লে নাই জোর, উত্তেজনা!
কার সৈন্য কে যে মারে- কিছু নাই জানা!!
আশা ছিল জঙ্গলবাড়ি করব আক্রমণ।
শেষ কালে তাজপুরেই আসিল মরণ!!

উমর খাঁ ঃ (রাগে) খামোশ!

হরমুজ ঃ (ততোধিক ঘাবড়ে) খামোশ। আমি হই যে খামোশ।
যুদ্ধ চলে, বাজনা বাজে, নাই হুঁশ-গোঁশ!!

(পত্রবাহী আসে)

পত্রবাহী ঃ হুজুর দেওয়ান! যুদ্ধের শুভ সংবাদ।

উমর খাঁ ঃ এ্যাঁ? মরেছে ফিরোজ, তার মিটে গেছে সাধ??

হরমুজ ঃ জানতাম, ওরা পারে আমাদের সাথে?

পত্রবাহী ঃ ফিরোজ খাঁ বন্দী আজ আমাদের হাতে।।

(উল্লাস ভরে চলে যান উমর খাঁ, সঙ্গে সঙ্গে হরমুজও। অন্য দিকে যায় পত্রবাহী। মঞ্চ অন্ধকার. ....

www.pathagar.com

(নেপথ্যে করুণ সুরের আলাপ। ধীরে ধীরে মঞ্চ
আলোকিত হলে সেখানে আসেন বেগম-আম্মা,
পিছনে সখিনা)

বেগম-আম্মা ঃ এবার সখিনা? সব যে মা শেষ হয়ে গেল!
ফিরোজ ভাগ্যের হাতে এই ফল পেল??

(এক খবরিয়া আসে, তসলিম জানায়)

খবরিয়া ঃ আম্মা, আমি খবরিয়া। এই অবস্থায়
জঙ্গলবাড়ির পক্ষ হইতে মুক্তি ভিক্ষায়-

বেগম-আম্মা ঃ নাই যাঁর আত্মীয়ের প্রতি বিবেচনা,
তাঁর কাছে মুক্তির আশা? শুধু কল্পনা!!
আমি জানি, এ-প্রস্তাব কোন্ লক্ষ্যে দেওয়া!

(সখিনার হাত বুকে চেপে ধরে বলেন-)

আমার এ কুলবধূ বহু ভাগ্যে পাওয়া!!

সখিনা ঃ ভিক্ষা চেয়ে মুক্তি নেওয়া- কল্পনা বিলাস।
তাতে শুধু হতে পারে মর্যাদার নাশ।।

বেগম ঃ খবরিয়া, এ-প্রস্তাব করছি প্রত্যাখ্যান।
জঙ্গলবাড়ি প্রাণ দেয়, বিকায় না মান!!

(আবার তসলিম জানিয়ে খবরিয়া চলে যায়)

কিন্তু মা গো, ফিরোজ যে এক পুত্রধন!
তারে ছাড়া জঙ্গলাবাড়ি বাঁচে কতক্ষণ!!

(নেপথ্য থেকে ভেসে আসে গানের কলি-)

নেপথ্যে গান ঃ নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে।
শূন্য ঘরের হাহাকার
আন্ধাইরেতে ঝরে রে!!
নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে।

(চিন্তারতা সখিনা মনস্থির করে বেগম-আম্মার
মুখোমুখি দাঁড়ায়)

সখিনা ঃ আম্মা, আমি সঙ্কল্পে বাঁধিয়াছি মন।।
আর নয় হাহাকার জীয়ন্তে মরণ।।

(বেগম-আম্মা সখিনার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান)

রণক্ষেত্রে যাব আমি, যাব তাজপুর।
দেখি পিতা চোরাপথে যান কতদূর!!

www.pathagar.com

বেগম-আম্মা	ঃ	ঘরের বউ হয়ে তুমি অস্ত্র নেবে হাতে?
		আমাকে তা সইতে হবে এই নিরালাতে??
সখিনা	ঃ	সমুজ্জ্বল ইতিহাসে সুলতানা রিজিয়া।
		চাঁদ সুলতানা মা গো জুড়ে আছে হিয়া!!
		বীরাঙ্গনা খাওয়ালাকে মনে পড়ে না কি?
		বিপর্যয়ে কি করে মা ঘরে বসে থাকি??
		খান্দানের মোহে পিতা বন্দী হয়েছেন।
		আর তা গোপন করে ডেকে এনেছেন
		বিদেশী মুঘল সেনা। হয়তো এই বলে-
		ফিরোজের হাতে ভাটি গেল রসাতলে।।
		স্বামী আজ বন্দী যদি, আমি যুদ্ধে যাব।
		রণক্ষেত্রে কন্যা-পিতা মুখোমুখি হব।।
বেগম-আম্মা	ঃ	জানি না মা সামনে কোন্ আছে কারবালা!
		জানি না মা এই ভাগ্যে আছে কত জ্বালা!!
সখিনা	ঃ	আমাকে সাজাও মা গো পুরুষের বেশে!
		রণক্ষেত্রে যাই আমি স্বামীর উদ্দেশে!!

(সখিনার হাত ধরে নির্বাক বেগম-আম্মা। হাসিমুখে বেগম-আম্মাকে ধরে নিয়ে ধীর পায় বেরিয়ে যায় সখিনা। মঞ্চের আলো-আঁধারিতে গান ধরে আসে চারণ-কবি ও সঙ্গীরা)

চারণ (গান)	ঃ	সাজে সখিনা কন্যা বীরাঙ্গনা সাজে।
সঙ্গীরা	ঃ	কিছুতেই অঙ্গরূপ ঢাকা পড়ে না যে!!
চারণ	ঃ	খোঁপা কইরা বান্ধে কন্যা কালো দীঘল কেশ।
		অঙ্গেতে পরিয়া নেয় গো পুরুষের বেশ।।
সঙ্গীরা	ঃ	সাজে সখিনা কন্যা বীরাঙ্গনা সাজে।
		কিছুতেই অঙ্গরূপ ঢাকা পড়ে না যে!!
চারণ	ঃ	চাঁদ মুখ ঢাকে কন্যা বর্ম-শিরস্ত্রাণে।।
		তীরভরা তূণ বাইন্ধ্যা রাখে যথাস্থানে।।
সঙ্গীরা	ঃ	সাজে সখিনা কন্যা বীরাঙ্গনা সাজে।
		কিছুতেই অঙ্গরূপ ঢাকা পড়ে না যে!!
চারণ	ঃ	কোমরবন্ধে শোভে কন্যার কোষবদ্ধ অসি।
		বিদায় নেয় 'নওজোয়ান' অশ্বপৃষ্ঠে বসি।।

www.pathagar.com

সকলে : যায় রে সখিনা যায় স্বামীর উদ্দেশে।

কুলবধূ যায় রণে বীরাঙ্গনা বেশে!!

মাঠ-ঘাট পার হয় রণের তেজী ঘোড়া।

সখিনারে লইয়া যেন শূন্যে দেয় উড়া রে-

শূন্যে দেয় উড়া।।

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। একটি অশ্বের ছুটে চলার শব্দ ভেসে আসে। চারণ-কবি ও সঙ্গীরা দ্রুত পায় চলে যায়। পর্দায় ভাসেঃ বেগম-আম্মা দুই হাত তুলে মোনাজাত করছেন)

(মঞ্চে উত্তেজিত হরমুজ কথা বলছে, উমর খাঁ চিন্তিত)

হরমুজ : শেষ যেন শেষ নয়- এই এক জ্বালা।

শুনি- নয়া সেনাপতি পন্থে দিছে মেলা।।

উমর খাঁ : নয়া সেনাপতি? সে আবার কে?

হরমুজ : কেউ কেটা -

হইবে কোন মহাবীর ফজর আলীর বেটা।।

(ভেসে আসে অশ্বের হ্রেস্বাধ্বনি ও যুদ্ধের কোলাহল। কানে হাত দেয় মিয়া হরমুজ। এক সৈনিক আসে ব্যস্ত হয়ে)

সৈনিক : অশুভ সংবাদ হুজুর, নয়া সেনাপতি।

পাল্‌টাইয়া দিল যেন যুদ্ধের গতি।।

তরুণ বয়স তার, অপূর্ব কৌশল।

অসীম প্রেরণা নিয়া তার সেনাদল

কোণঠাসা কইরা দিল মুঘল-সেনায়।

আমাদের বীরগণ হতবাক প্রায়!!

হরমুজ : এই সেরেছে!

উমর খাঁ : (রাগের সঙ্গে) হরমুজ!

হরমুজ : (শুকনো কণ্ঠে বলে-) মুখে কথা নাই।

এ সময় কি যে করি, কোন্ দিকে যাই!!

উমর খাঁ : বাচালতা রাখ, ভাবো যোগ্য সমাধান।

(মুহূর্তে চিন্তা করে নিয়ে হরমুজ বলে-)

হরমুজ : পাইয়াছি, পাইয়াছি হুজুর দেওয়ান!!

www.pathagar.com

উমর খাঁ : কি পেয়েছ?

হরমুজ : সমাধান। ....দুশমণের জয়?
এই মিয়া হরমুজ বাঁইচ্যা থাকতে নয়।।
আসেন পাশের ঘরে।

উমর খাঁ : (সৈনিককে বলে–) কিছুক্ষণ থাকো।

হরমুজ : কলম কাগজ কালি ঠিকঠাক রাখো।।

(দু'জনই চলে যায়। আসে সরকার)

সরকার : শয়তান সঙ্গে লাগা। কি জানি কি হয়!
এর কাছে কিছুই তো অসম্ভব নয়!!
কিন্তু এই সেনাপতি কে?

সৈনিক : বয়সে তরুণ।
মনে হয় পূর্বাকাশে নবীন অরুণ!!

(উমর খাঁ ও হরমুজ আসে। বাইরে যায় সৈনিক ও সরকার)

উমর খাঁ : উপযুক্ত উপদেশ। আমার কন্যায়
ফিরে পেতে চাই শুধু। তাতে যদি যায়
সব কিছু ধ্বংস হয়ে, যাক। শুধু থাক
খান্দান উচ্চশির– নীরব নির্বাক।।
কিন্তু হরমুজ, ভাবি .... দস্তখতের কাজ ....

হরমুজ : চিন্তা কেন? আমি হুজুর খাসা কলমবাজ।।
ফিরোজের দস্তখত নিজেই আমি দিমু।
তার লাইগ্যা যথাকালে পুরস্কারও পামু।।

উমর খাঁ : আচ্ছা, তুমি তালাকনামা প্রস্তুত কর।

(কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবেই চলে যান। আসে সরকার)

সরকার : কি ব্যাপার? হঠাৎ যে পুলকিত বড়??
নিজেরই কন্যার মত যে কন্যা সখিনা–
কি করতে চাও তা কি শুনতে পারি না??

হরমুজ : যুদ্ধটুদ্ধ সবকিছু তো সখিনারে নিয়া?
ফিরোজ তাই সখিনারে যদি তালাক দিয়া
যুদ্ধটা শেষ কইরা দেয় .... এই আর কি!
সেইজন্য তালাকনামা তৈয়ার করতাছি।।

সরকার : একটা কথা ভাবি শুধু– তুমি কি মানুষ?
যা–ই চাও তা–ই কর, নাই কোন হুঁশ??

www.pathagar.com

হরমুজ : থাকব না ক্যান? হুঁশ আছে, খুবই আছে।
অতীতের কোন কথা ভুইল্যা যাই পাছে,
তাই আজো তোমাগোর পিছে পিছে ঘুরি।
বাঁচালের মত সাজাই কথার ফুলঝুরি।।

সরকার : হরমুজ, তুমি আইজ কি কইতে চাও?
কোন্ অতীতের পথে দুই পা' বাড়াও??

হরমুজ : আমি মোসাহেব, নাই জাত-কুল-লাজ।
প্রয়োজনে করি কর্তার ইচ্ছামত কাজ।।
নিজ স্বার্থে করি তা যা করার হুকুম পাই।
(হঠাৎ পৈশাচিক ক্রূরতায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে)
ধর্ম-নীতি-মনুষ্যত্ব? নাই, কিছু নাই!!

সরকার : থাকব না ক্যান্ বন্ধু, ক্যান্ থাকব না?
আমরা যে বাপ .... এটা মনে রাখব না??

হরমুজ : আমারও এক কন্যা ছিল তা কি মনে পড়ে?
বিবাহযোগ্যা কন্যা..... কার কুনজরে
হারাইল কুল-মান, হারাইল ঘর?
অবশেষে পাইলাম লাশের খবর
হুজুরের গুম্ ঘরে। হুজুর মহান!
সাজলাম মোসাহেব, পাইলাম মান!!

সরকার : সেই কথা আজো তুমি ভুলতে পার নাই?

হরমুজ : আজ যদি আমি তার প্রতিশোধ চাই-
নিষেধ করবা তুমি? আহা মরি মরি!
যাই, তালাকনামাটা গিয়া প্রস্তুত করি!!
(উদ্‌ভ্রান্তের মত চলে যায়। তার গমন পথের
দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে সরকারও চলে যাবে-
তখনই বাইরে থেকে ভেসে আসে যুদ্ধের
প্রচন্ড কোলাহল। থমকে দাঁড়ায় সরকার)

সরকার : না না, তা হয় না, হরমুজ- কিছুতেই না!
উমর খাঁ দোষী, কিন্তু নির্দোষ সখিনা!!
(ত্রস্তপায় বেরিয়ে যেতে চায়। তখনই কোলাহলের
মধ্যেই শোনা যায়-)

ঘোষণা : "ফিরোজ-সখিনার তালাক"

www.pathagar.com

"সখিনারে তালাক দিয়া মুক্ত ফিরোজ"
"যুদ্ধ শেষ, সখিনার তালাক, সখিনার তালাক"
"দেওয়ান ফিরোজ মুক্ত, যুদ্ধ শেষ"

(ক্লান্ত পায় চলে যায় সরকার। চিৎকার করে বলতে বলতে উদ্‌ভ্রান্তের মত আসে ফিরোজ–)

ফিরোজ ঃ না না, এই কথা সত্য নয়, মিথ্যা জালিয়াতি!
সখিনা আমার সারা জনমের সাথী!!
যুদ্ধ শেষ নয়, এই যুদ্ধ চলবেই।
শির উঁচু করে ভাটি এ কথা বলবেই–

(এরই মধ্যে সামনে এসে দাঁড়ান উমর খাঁ)

উমর খাঁ ঃ খামোশ, নয়া সেনাপতি নিজে বারবার
দেখেছে তালাকনামা, স্বাক্ষর তোমার।।
রণক্ষেত্র তাই হল সহসা নীরব।
কারও মুখে কথা নাই, নাই কলরব।।

(হরমুজ আসে)

হরমুজ ঃ হুজুর দেওয়ান, দেইখ্যা লড়াইয়ের গতি
প্রাণত্যাগ করেছেন নয়া সেনাপতি।।

(ব্যগ্র হয়ে এক সৈনিক আসে)

সৈনিক ঃ ঘইটা গেছে সর্বনাশ!
উমর খাঁ ঃ সর্বনাশ? কার?

(সরকার এসে উত্তর দেয়–)

সরকার ঃ মহা অহঙ্কারী দেওয়ান, আপনার।।
ওই নয়া সেনাপতি আর কেউ নয়।
আপনারই রক্তকণা যার দেহে বয়–
ফিরোজ ঃ সে কি সখিনা আমার?
উমর খাঁ ঃ (হঠাৎ শোকবিহ্বল কণ্ঠে) সখিনা আমার!!

(চারদিক থেকে বারবার ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত হয় একই কথা–
"সখিনা আমার, সখিনা আমার"!!)

সরকার ঃ অপূর্ব কৌশলে যখন নয়া সেনাপতি।
বদলাইয়া দিল সেই লড়াইয়ের গতি।।

www.pathagar.com

বাঙালীর ভাগ্যে যখন সুনিশ্চিত জয়,
তখনই তো চাইর দিকে বিঘোষিত হয়–
সখিনাও ফিরোজের তালাক–সংবাদ।
বাঙালীর ভাগ্যে নামে হরিষে বিষাদ।।
অশ্বপৃষ্ঠে সেনাপতি, তালাকনামা হাতে–
ফিরোজের দস্তখত রহিয়াছে যাতে।।
সহসা সকল সেনা বিস্ময়ে দেখে–
পড়ে গেল সেনাপতি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে।।
খুলে গেছে শিরস্ত্রাণ, স্পষ্ট পরিচয়।
বীর কন্যা বীর জায়া আর কেউ নয়–

(শোকবিহবল উদ্‌ভ্রান্ত উমর খাঁ বলে ওঠে–)

উমর খাঁ : একমাত্র কন্যা সে যে সখিনা আমার!

সরকার : বীরাঙ্গনা সখিনা যে আজকে সবার!!
অস্ত্রাঘাতে নয়, মিথ্যা তালাকনামায়
নিজে হত্যা করেছেন নিজের কন্যায়!!

ফিরোজ : (দৃঢ় উচ্চকণ্ঠে) উমরখাঁ দেওয়ান!!

উমর খাঁ : (হরমুজের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে) হরমুজ তুমি!

হরমুজ : আমি নই আমি নই, তুমি প্রভু– তুমি!!

(হাতে একটা বিষের কৌটা নিয়ে দেখায়–)

আমার জন্যে তো এই কালকূট বিষ!
নির্বংশ হইলা তুমি পাইছ না দিশ??

(পাগলের মত হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়। নীরবে ফিরোজের কাছে এসে দাঁড়ায় সায়ীদ ও আদিল)

সায়ীদ : বন্ধু ফিরোজ!

আদিল : দেওয়ান, কথা বল!

(সবাইকে নীরবে দেখে নিয়ে কথা বলে ফিরোজ–)

ফিরোজ : সখিনারে সঙ্গে নিয়া জঙ্গলবাড়ি চল!!

(উমর খাঁ নির্বাক। ফিরোজকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পা বাড়ায় সায়ীদ ও আদিল। ...... ভেসে আসে অনেক মানুষের হামিং .....

www.pathagar.com

স্বপ্নালোকিত অন্ধকার মঞ্চে
দাঁড়িয়ে উমর খাঁ দেখে–
আঁধার–আঁধার পর্দায় ভাসেঃ
ফিরোজ ও তার সঙ্গী–সাথী এবং
অন্যান্য লোকজন সখিনার কফিন
নিয়ে ধীর গতিতে পথ চলছে,
আর দূর থেকে ভেসে আসছে গান ....

নেপথ্যে গান ঃ

নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে!
শূন্য ঘরের হাহাকার আন্ধাইরেতে ঝরে রে!!
নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে!
দিনের পরে আসবে রাতি
ঘরে ঘরে জ্বলবে বাতি —
কার দোষেতে আমার বাতি নিভল চিরতরে রে!!
নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে!

www.pathagar.com

। পঁয়ষট্টি।

আমার ঘরে সাঁঝের বেলায়
প্রদীপ জ্বালতে দাও।
আমার দেশে বইতে দাও গো
শান্তি–সুখের বাও।।
ঘরে প্রদীপ জ্বালতে দাও।
তোমার যদি এতই শক্তি থাকে,
সন্তানহারা করবে কেন মা–কে?
দুঃখীজনকে অভয় দিয়ে
তার পাশে দাঁড়াও
ঘরে প্রদীপ জ্বালতে দাও।
মৈত্রী আনো মানব–মনের
দানব–মনের নয়।
মৈত্রী আনো জন্–মানুষের
হৃদয় করে জয়।।
অন্যায়কে শক্ত আঘাত হানো,
ন্যায়ের বিজয় সত্য বলে মানো।
ভাইয়ের পানে অসঙ্কোচে
প্রীতির হাত বাড়াও।।
ঘরে প্রদীপ জ্বালতে দাও।

। ছয়ষট্টি।

কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে
গো নিরলে।
কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে।।

জ্বালাইয়া স্মরণের বাতি
জাগে আমার অঘুম রাতি গো
আশার তরী ডোবে কখন নিরাশার অতলে।।
কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে।

www.pathagar.com

স্বপ্নে যেন স্বপ্ন-লেখা

দেখা দিয়া হয় অদেখা গো
মেঘের আড়ে চান্দের বাতি রিমিঝিমি জ্বলে।।
কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে।

ভুলতে গিয়েও ভোলা না যায়
স্মৃতির শিকল মনে জড়ায় গো
দিনে রাইতে পোড়ে এ মন বিরহের
অনলে গো -
কইও খবর বন্ধুর দেখা পাইলে।।

।সাতষট্টি।

যতবার দেখি ভাবি ততবার- দুই যেন দুই নয়!
হাজার বছর প্রাণে বাঁধা প্রাণ,
দু'য়ে একই পরিচয়!!
কত জনমের সাথী,
তুমি কত জনমের সাথী!
তোমারি ধেয়ানে কেটেছে বন্ধু
কত না দিবস-রাতি।
ব্যাকুল বাঁশরী কত না ডেকেছে
সুরে সুরে তন্ময়।।
তোমারি আশায় জ্বলিয়া নিভেছে
কত না সাঁঝের বাতি।
কত যুগ পরে তুমি আর আমি
আবার হয়েছি সাথী।।
মত্ত দাদুরী ডেকেছে,
কত মত্ত দাদুরী ডেকেছে!
ডাহুকীর ডাকে অবুঝ পরাণ
কত না উতল হয়েছে।
ভাদর-আকাশ আজিকে বন্ধু
হয়েছে বাদলময়।।

www.pathagar.com

। আটষট্টি।

আসমানেতে মেঘ যেন সাজে ওই সাজে!
চারিদিকে ঢাক-ঢোল গুড়ু গুড়ু বাজে।।
হাওরেতে পাগলা ঢেউ তারই সাথে জাগে।
হাতের বৈঠাতে যেন যৌবনের টান লাগে রে
যৌবনের টান লাগে।।
শক্ত হাতে বৈঠা ধর্-
ওই আসমানে উঠছে ঝড়।
সামনে শত্রুর সৈন্যদল-
বুক ফুলাইয়া আগে চল্
গুঁড়াইয়া চল্ মাড়াইয়া চল্।
সামনে শত্রুর সৈন্যদল!!

।উনসত্তর।

নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে!
শূন্য ঘরের হাহাকার আন্ধাইরেতে ঝরে রে!!
নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে!

দিনের পরে আসবে রাতি
ঘরে ঘরে জ্বলবে বাতি –
কার দোষেতে আমার বাতি নিভল চিরতরে রে!!
নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে!

www.pathagar.com

।সত্তর।

স্বপ্নই শুধু নও তুমি স্মৃতি-জলে ভেসে আসা-
ঝিনুকের বুকে মুক্তার মত ভালোবাসা।।
বনপথে যেতে বাঁশরীর সুর
বেজেছিল কবে উদাস বিধুর-
কতদিন পর সেই সুর শেষে
পেয়েছেনীরবভাষা।।

সেদিনের এক কিশোরী-স্মৃতির সঞ্চয়,
জীবনের শত মুহূর্ত ঘিরে আজো কেন জেগে রয়।।
যুগ যুগ যেন রেখেছি হিয়ায়,
যুগ যুগ তবু হিয়া না জুড়ায়-
সহসাই সে যে শুকতারা হয়ে
জ্বলছেআঁধার-নাশা।।

www.pathagar.com

আমার 'জীবন—কথা'র কিছু কথা

আসকার ইবনে শাইখ

।চৌদ্দ।

জীবনাদর্শের বিষয়ে আমার সচেতনতা জাগে, বলতে গেলে, তমদ্দুন মজলিসের দ্বারা সূচনাকৃত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। এর আগে আমার এলোমেলো জীবন-ধারার বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'আসকার রচনাবলী'র প্রথম খন্ডে এবং বিচ্ছিন্নভাবে পরবর্তী খন্ডসমূহেও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এসসি. ক্লাসে ভর্তি হয়েই তমদ্দুন মজলিসের কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ি। ১৯, আজিমপুর রোড-এ মজলিসের নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন হত। বেশির ভাগ আলোচনার বিষয়বস্তু থাকত ইসলাম সম্পর্কিত। জ্ঞানগর্ভ সিরিয়াস আলোচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক হাসান জামান সাহেব গভীর ভাবধারাসম্পন্ন প্রবন্ধ পড়তেন। শ্রোতা হিসাবে তাতে আমি খুব একটা মনোনিবেশ করতে পারতাম না। কিন্তু অন্যরা সিরিয়াসলি সেসব আলোচনায় যোগ দিতেন। তবে আমাকে আকর্ষণ করত ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের কার্যাবলীর বিবরণ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলাম সম্পর্কে একটা মোটামুটি অগভীর ধারণা আমার আগে থেকেই ছিল। সেটা এদেশে ইসলামের প্রচলিত রূপ ভিত্তিক। এবং সেই সঙ্গে নবীজী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার ধারণায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব রূপে। তাঁর জীবন-কাহিনী সম্পর্কে যতটুকু জানতাম তা-ই আমাকে আবেগাপ্লুত করে তুলত। কিন্তু সমাজে প্রচলিত ইসলামের যে রূপ দেখতাম তাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সেই ইসলামের অনুসৃতির কথা মনেই আসত না। মনে আসত এদেশের পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশার কথাই।

এমনি পরিস্থিতিতে এদেশ এবং এদেশবাসীর ধর্মীয় বিশ্বাসের চলমান অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হতে আরম্ভ করলাম ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই। আমাদের মধ্যে ক্রম-আলোচনায় প্রকৃত ইসলামের বিপ্লবী রূপ এবং সেই রূপে পতিত মানবতার মুক্তি-বিধানের কথা আমাকে অনুপ্রাণিত করতে লাগল। এর আগে মানুষের মুক্তি-বিধানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রতি আমার কিছুটা দুর্বলতা ছিল। কিন্তু এদেশে

www.pathagar.com

ইসলামের প্রচলিত রূপের প্রতিও জনসাধারণের গভীর বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে ধর্মবিরোধী, বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী, মার্কসীয় আদর্শ এখানে কতটুকু গ্রহণীয় হবে, এই-ই ছিল আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবনা।

অতঃপর কিছুটা অবহিত হলাম যখন ইসলামের নবীজী (সাঃ) প্রদর্শিত বিপ্লবমুখী জীবন-বিধানের বিষয়ে, তখন সকল দ্বিধা দূর হয়ে গেল। বিশ্বাস জন্মাল, সর্বরকম দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মুক্তি-সনদ রূপে ইসলাম আমাদের জীবনাদর্শ হতে পারে। কিন্তু এই মুক্তি-সনদের রূপায়ণ যে কঠিনতম কাজ! এত অশিক্ষা-অজ্ঞানতা, এত ব্যাপক দারিদ্র্য ও অন্ধ বিশ্বাস, এত বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে ইসলামকে মুক্ত করে সমাজে-দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ....

তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (১৯, আজিমপুর রোড) বসে আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। আলোচনা হত — আমাদের এ অঞ্চলের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিল কেন? কি ছিল এর পেছনকার মূল লক্ষ্য? ইসলামের বিপ্লবী রূপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অথবা তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি? সার্বিক বিবেচনায় আমাদের অনেকেরই সিদ্ধান্ত ছিলঃ অর্থনৈতিক ও সেই সাথে সাংস্কৃতিক মুক্তি, অন্য কথায়, এদেশীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষাই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। হ্যাঁ, ইসলাম ও মুসলিম শব্দ দু'টি এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে একটার কথা বললে অন্যটাও এসে যায়। কিন্তু এখানকার মানুষের, বিশেষ করে মুসলমানদের পতিত অবস্থার উন্নীতকরণের আশা তখন প্রধান বিবেচ্য বিষয়, ঠিক ইসলামের প্রচলিত রূপের স্থলে তার বৈপ্লবিক রূপ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাকে উন্নীতকরণের বাসনা নয়। এই বাসনাভিত্তিক সংগ্রাম তো মুসলিম জাহানের দেশে দেশে আরম্ভ হয়েছে বা হতে যাচ্ছে একেবারেই নিকট বর্তমানে।

কিন্তু আমাদের দৃষ্টি-দিগন্তে তখন দুস্থ মানুষের মুক্তি বিধানে বিপ্লবী ইসলামের হাতছানি! আমরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম— রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপ্লবী ইসলামের প্রতিষ্ঠা এখানকার সুস্থ বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। আদর্শবাদী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিসের সাহিত্য ও লোককলা বিভাগের সম্পাদক হিসাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে আমাদের উপরিউক্ত আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্যে যথাকর্তব্য পালনই ছিল আমার দায়িত্ব। এবং এই লক্ষ্যেই নবপর্যায়ে প্রকাশিত মজলিসের মাসিক সাহিত্য-পত্র 'দ্যুতি' সম্পাদনার দায়িত্বও ন্যস্ত হয় আমার ওপর। সহকারী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সর্বজনাব চৌধুরী লুৎফুর রহমান, আবুল খায়ের মুসলেহ্উদ্দিন (কয়েক মাসের জন্য), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে সেদিন সেই পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিককার স্মৃতিচারণ করছিলাম তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক ও অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক সৈনিক–এর সম্পাদক জনাব আবদুল গফুরের সঙ্গে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং ভাষা আন্দোলনসহ তমদ্দুন মজলিসের আদর্শ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং সে সময়ে অন্যান্য প্রগতিপন্থী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা নিয়ে তাঁর বক্তব্য লিখে দিতে বললে তিনি তা লিখে দেন। তাঁর স্বাক্ষরকৃত বক্তব্য এখানে সন্নিবেশিত করা হলঃ

"ভাষা আন্দোলন এক হিসাবে ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের পরিণত ফসল। সাতচল্লিশে যদি লাহোর প্রস্তাব অনুসারে উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হত, অথবা যদি সোহ্‌রাওয়ার্দী–শরৎ বসু–আবুল হাশিম ফর্মূলা অনুসারে সাতচল্লিশে বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র কায়েম হত, তা হলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রয়োজনই পড়ত না। উপমহাদেশ যদি বিভক্ত না হত, তাহলেও দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠির মাতৃভাষার যুক্তিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেঁয়া সম্ভব হত না। পাকিস্তান কায়েম হওয়াতেই বাংলাভাষী জনগোষ্ঠি সংখ্যাগরিষ্ঠ– এই যুক্তিতে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপিত হতে পেরেছিল। যাঁরা ভাষা আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন, যেমন অধ্যাপক আবুল কাসেম, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, হাবিবুল্লাহ বাহার, কবি জসীম উদ্দীন, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আতাউর রহমান খান, মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, খয়রাত হোসেন, শাহেদ আলী, মওলানা তর্কবাগীশ, আবদুল মতিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবর রহমান, নঈমুদ্দিন আহমদ– এঁরা সকলেই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বা ছাত্র ফ্রন্টের নেতা, কর্মী, বা একনিষ্ঠ সমর্থক।

যদিও পাকিস্তান আন্দোলনের এক পর্যায়ে ইসলামের আদর্শে রাষ্ট্র গঠনের কথা উঠেছিল, তবুও তা ছিল খুবই ভাসা–ভাসা। আসলে এ আন্দোলন মূলতঃ ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এমন অনেকে, যাঁরা সেকুলারিস্ট বা সোস্যালিস্ট চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হয়েও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সরব বা নীরব সমর্থন জানিয়েছিলেন। কারণ মুসলিম সমাজের অংশ হিসাবে তাঁরাও বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। সাতচল্লিশের পার্টিশনের পর স্বাভাবিকভাবেই

www.pathagar.com

পশ্চিম বংগের মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও শিক্ষিতজনদের অনেকেই ঢাকায় পাড়ি জমান নতুন রাষ্ট্রে তাঁদের ভাগ্যান্বেষণে।

আমরা আগেই দেখেছি, পাকিস্তান আন্দোলনে সেকুলারিস্ট-ইসলামী নির্বিশেষে প্রায় সকল মুসলমানই সমর্থন জানান। ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এর সাথে ক্রমে ক্রমে যুক্ত হন সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি, শিল্পী-সাহিত্যিক, রাজনীতিক, শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী। বিশেষতঃ তমদ্দুন মজলিস ছিল দেশের প্রায় একমাত্র আদর্শবাদী ও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, আর সাপ্তাহিক সৈনিক ও মাসিক দ্যুতি ছিল তার মুখপত্র। স্বাভাবিকভাবেই তখন মজলিস ও তার মুখপত্রসমূহ নতুন সমাজের স্বপ্নে উজ্জীবিত সকল শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি সমাজসেবীর মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। মজলিস সূচিত ভাষা আন্দোলনে যেমন অংশ নেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ফররুখ আহমদ, শাহেদ আলী, আসকার ইবনে শাইখ, হাসান জামান, সানাউল্লাহ্ নূরী প্রমুখ ইসলামপন্থী কবি-সাহিত্যিকগণ, যেমন এতে অংশ নেন মওলানা ভাসানীর মত অনন্য ব্যক্তিত্ব বা আবুল হাশিম, শামসুল হক প্রমুখ ইসলামপন্থী রাজনীতিকগণ, তেমনি এতে অংশ নেন মধ্যপন্থী চিন্তাধারার আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আতাউর রহমান খান, কবি জসীমউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, শেখ মুজিবর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিকগণ, আরও অংশ নেন তদানীন্তন বামপন্থী শিবিরের প্রতিনিধিত্বকারী অলি আহাদ, মাহমুদ আলী, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন প্রমুখ। এমন কি নাস্তিক বলে পরিচিত আবুল হাসানাতও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মজলিসের কর্মকান্ডে এবং মজলিসের মুখপত্রসমূহেও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ, ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, আবুল হাশিম, মঈনুদ্দিন, বেনজীর আহমদ, শাহেদ আলী, আজিজুর রহমান, সানাউল্লাহ্ নূরী, হাসান জামান, আসকার ইবনে শাইখ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, চৌধুরী ওসমান, মওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, মওলানা আবদুল আলী, মীর শামসুল হুদা, মাহ্মুদা খাতুন সিদ্দিকা, জাহানারা আরজু প্রমুখের পাশাপাশি দেখা গেছে এম. এন. রায়, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, সুফিয়া কামাল, মওলানা ভাসানী, সরদার জয়েনউদ্দীন, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, প্রজেশ কুমার রায়, কবি জসীমউদ্দীন, চৌধুরী লুৎফুর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দীন আল-আজাদ, মোতাহার হোসেন চৌধুরী,

মাহবুব উল আলম, অন্নদাশঙ্কর রায়, মনমোহন বর্মন, গাজীউল হক প্রমুখের সক্রিয় উপস্থিতি। মজলিসের ভাষা আন্দোলনে শিল্পী জয়নুল আবেদীনের ছিল সক্রিয় সমর্থন। মজলিসের মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক-এর প্রথম মাষ্ট এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। আর বিখ্যাত কার্টুনিস্ট দো-পৌঁয়াজা (কাজী আবুল কাসেম) সৈনিক-এ নিয়মিত কার্টুন আঁকতেন।"

আবদুল গফুর সাহেব তাঁর বক্তব্যে তমদ্দুন মজলিস সূচিত ও গৃহীত নানা কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যেসব গুণীজনের নামোল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শিল্পী-সাহিত্যিক সবারই অবদানে আমাদের 'সাপ্তাহিক সৈনিক' ও 'মাসিক দ্যুতি' তখন সমৃদ্ধ হয়েছে। তাছাড়াও, প্রায় তিন বছর ধরে প্রকাশিত 'মাসিক দ্যুতি'তে আরও যাঁরা নিয়মিত লিখতেন, লেখার ক্রম-অনুসারে তাঁরা হলেনঃ

সর্বজনাব সৈয়দ মোকসুদ আলী, আবদুর রশীদ খান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, তরীকুল আলম, কবীরউদ্দিন আহমদ, কাজী ফজলুর রহমান, আবদুল হাই মাশরেকী, আজীজুল হক, বদরুদ্দীন উমর, আনোয়ারা বেগম, মোস্তফা কামাল, আতোয়ার রহমান, মাহ্‌ফুজুল হক, মোহাম্মদ আজিজুল হক, গোলাম আহমদ, মীর আবুল হোসেন, আশরাফ সিদ্দিকী, আহমদ ফরিদউদ্দিন, সৈয়দ আতাউর রহিম, সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন, ভবেশ মুখোপাধ্যায়, মুযহারুল ইসলাম, এ. এস. এম. আবদুল জলিল, মোজাম্মেল সিদ্দিক, মফিজউদ্দিন আহমদ, রাবেয়া খাতুন, মির্জা আ. মু. আবদুল হাই, মোহাম্মদ মামুন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আতাউল হক, মুহম্মদ আবু তালিব, নূরুন নাহার বেগম, হাবীবুর রহমান, শেখ লুৎফুর রহমান, খোন্দকার আবদুর রহীম, জহুরুল আলম, সৈয়দ আলী আশরাফ, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর খালেদ, মিন্নাত আলী, মোজাফ্‌ফর আমহদ, কবি শাহাদাৎ হোসেন, আল-মাহমুদ, লুতফুল হায়দার চৌধুরী, আহমাদুর রহমান এবং আরও কেউ কেউ।

এতসব গুণীজন ও শিল্পী-সাহিত্যিকের নামোল্লেখের উদ্দেশ্য একথা বোঝাবার জন্য যে পঞ্চাশের দশকের প্রায় পুরোটাই আমি ছিলাম তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এক সাহিত্যসেবী। এবং পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আমাদের অনেকেই তখন পরিচিত ছিলাম কমবেশি বিরোধী অঙ্গনের প্রতিবাদী রূপে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দিক থেকে তখন ইসলামের কথা বহুল উচ্চারিত। কিন্তু তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম- কর্তৃপক্ষের ইসলামী আদর্শ শুধু কথার কথা, রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকান্ডে তার অনুসৃতি নেই বললেই চলে। অনুসৃতি নেই যেখানে, সেখানে একটি অনন্য আদর্শের এত নিরর্থক উচ্চারণ

www.pathagar.com

কেন? এজন্যেই আমরা ছিলাম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের অনুসৃত নীতিসমূহের সমালোচনাকারী ও বিরোধী। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতিলাভের আন্দোলনই তার প্রথম দৃষ্টান্ত। তাই বলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ছিল অযৌক্তিক – এমন ধারণার বশবর্তী ছিলাম না কেউই। তবুও, আমরা চিহ্নিত হতাম অনেকটাই রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে, যেমন চিহ্নিত হতেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার ধারক শিল্পী-সাহিত্যিকরাও।

এদিকে, প্রগতিপন্থী বলে দাবীদারদের মধ্যে দিনের দিন একটা বিভক্তিরেখা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠল, এবং তা পরস্পর বিরোধিতার পথে এগিয়ে গেল। সে সময়ে সমাজতন্ত্রবাদী বন্ধুরা বৈপ্লবিক ইসলামপন্থীদেরকে 'মোল্লা' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে অভিহিত করতেন, আর আমরা তাঁদেরকে অভিহিত করতাম 'কমিউনিস্ট' বলে। ক্রমে লক্ষ্য করা গেল- প্রগতিপন্থীদের মধ্যেকার 'বন্ধুত্ব' বা 'সৌহার্দ'-এর পরিবেশটা নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল একটা বিদ্বেষের পরিবেশ। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দরিদ্র দেশে লেখক সমাজে এমনি পরিবেশ সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে; কল্যাণধর্মী সৃষ্টিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্তত আমার নাট্যপ্রয়াস এমনি বিদ্বেষে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

জীবনের এতগুলো বছর নাটকের পেছনে লেগে থেকে সামান্য হলেও আমাদের নাটকের জন্য যতটুকু করতে সমর্থ হয়েছি, তার থেকে এ দাবিটা বোধ হয় করতে পারি যে আমার সকল প্রয়াসের পেছনে কার্যকর ছিল সকল বৈশিষ্ট্যসহ এদেশীয় নাটক ও নাট্যক্রিয়ার উন্নয়ন সাধনের আকাঙ্খা। আর সে-লক্ষ্যেই নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়েছিলাম। আমাদের নাট্য একাডেমীর জেনেসিস বা সূচনা-বৃত্তান্ত পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, একাজে আমরা এদেশের সকল নাট্য-ব্যক্তিত্ব ও শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য গুণীজনের সহযোগিতা কামনা করেছিলাম, তাতে কোন একদেশদর্শিতার ছোঁয়া ছিল না। সে-সহযোগিতা পেয়েওছিলাম। কিন্তু .... কিছুদিনের মধ্যেই তাতে একটা 'কিন্তু' দেখা দিল।

যে সময়ের কথা বলছি তখন পূর্ব-পাকিস্তানে নাট্যকার হিসাবে তিনজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখিত ও আলোচিত হত— নূরুল মোমেন ও মুনীর চৌধুরী এবং আমার নাম। এখানে কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গেই আমার সম্পর্কে পন্ডিতজনের দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি ঃ

"আসকার ইবনে শাইখ সম্ভবত একমাত্র নাট্যকার যিনি কেবলমাত্র নাটক রচনা করেন; এবং নাটকের সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়েও তিনি প্রথম।– আসকার

www.pathagar.com

ইবনে শাইখের প্রবলতম আগ্রহ হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ, ইতিহাস, আকাঙ্খা ও আনন্দকে নাট্যরূপে পরিদৃশ্যমান করা। এ সত্য তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় ধারার নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৬৯, পৃঃ ৪৭৪)

"Askar Ibne Shaikh is the most prolific of the younger generation of dramatists ... He is by far the most popular of our play-wrights," (Bengali Literature in East Pakistan, written by Mr. Enamul Karim and revised by Dr. Syed Sajjad Husain and Mr. Serajul Islam Choudhury, The Information Department, Government of East Pakistan, EPGP 62/63, p. 14).

পন্ডিতজনদের এসব মন্তব্যের সঙ্গে এ-ও যুক্ত করা যায় যে, ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় কার্যকরী কমিটিতে সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সম্মানও আমি পেয়েছিলাম। তাছাড়া, ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রবর্তিত সাহিত্য পুরস্কার হিসাবে নাট্য সাহিত্যে অবদান রাখার জন্যও আমি ১৯৬০ সালে পুরস্কৃত হয়েছিলাম।

এসব স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে এদেশে একটি নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমার এগিয়ে যাওয়ায় কোন অন্যায্য কাজ করছি বলে মনে হয় নি। তবুও সে কাজে প্রতিবন্ধকতা এল বেশ একটা ঘুর পথেই। এর আগে বলছিলাম আমাদের তিন নাট্যকারের কথা। আমাদের মধ্যে সৌহার্দের কমতি তো ছিলই না, আতিশয্যই ছিল বলা যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল— আমাদের নিয়ে বিভক্তির ধারণাটা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ নূরুল মোমেন সাহেব ছিলেন অনেকটাই স্বতন্ত্র প্রকৃতির এবং উদার মনোভাবসম্পন্ন। নিজের ধ্যানধারণার পরিমন্ডলে তিনি নিজেকে নিয়েই নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু সেই একটি বিশেষ মহল মুনীর চৌধুরী ও আমাকে আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট করার চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠল। আমরা দু'জনে কিন্তু প্রথম দিকে ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কৌতুক বোধ করতাম। তবে এই কৌতুক বোধটা কিছুদিন পর উবে যেতে আরম্ভ করে। ভাগাভাগিতেই পড়ে গেলাম আমরা। কিন্তু মুনীর চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনে কোনও দিন নিজেদেরকে বিভক্ত বলে মনে হয় নি। বরং স্পষ্টভাবে একথাই মনে হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলামমনস্ক বা সমাজতন্ত্রমনস্ক হয়েও মানুষের কল্যাণকামী হওয়া যায়। নাট্যরচনা বিষয়ে আমাদের মধ্যে নিয়মিতই আলাপ আলোচনা হত। আমাদের প্রসঙ্গটা একথা বলেই শেষ করতে

www.pathagar.com

চাই যে, আমাদের দেখা সাক্ষাতের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমরা ছিলাম পরস্পর প্রীতিবদ্ধ।

আমার বিশ্বাস, প্রফেস্যর মুনীর চৌধুরী ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ওই বিশেষ মহলটির চাপে পড়েই আমাদের নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু একাজে তাঁদের পক্ষ থেকে কোন বিরোধিতার কথা আমার জানা নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিরোধিতার মূলে ব্যক্তির বদলে ছিল স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে এখন-তখন যেসব মন্তব্য শুনেছি তাতে আমার মনে এ-বিশ্বাসই জন্মেছে যে বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তার ধ্যানধারণা নিয়েই আমাদের নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলেই এই বিরোধিতা।

তবুও অন্যান্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা-সমর্থনে নাট্য একাডেমীর কাজ এগিয়ে চলল। সাময়িকভাবে বন্ধ থাকল শুধুমাত্র একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়টাতে। ১৯৭২ সাল থেকে নাট্য একাডেমীর কাজ আবার আরম্ভ হল। কিন্তু আগের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নয়। আমার অঙ্গে তখন সেই বিদ্বেষজাত এক নতুন ভূষণ। বিভিন্ন কমিটির কোন কোন সদস্য একাজে তাঁদের উৎসাহ ক্রমেই হারিয়ে ফেললেন। তবুও আমার সঙ্গে নানাকাজে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ও নাট্যপিপাসুরা আমাকে সাহায্য সহায়তা দিতে থাকলেন। একাডেমীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রকাশ্য প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলল ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হাইকোর্টে মোকদ্দমা করে ওই নতুন ভূষণ থেকে নিজ অঙ্গকে কি ভাবে মুক্ত করলাম, তা রচনাবলীর পূর্ববর্তী খন্ডে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে? ততদিনে দেশে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে এক নব নাট্যধারার ঘূর্ণাবর্তে একা আর কত 'ফাইট' করতে পারি? 'একা' এজন্য যে বহু বছরের নাট্যানুশীলনে আমার ঘনিষ্ঠ এবং নাট্যাঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই তখন আমার কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করছেন। তদুপরি লক্ষ্য করলাম- একাডেমীর শিক্ষার্থীরা আমার সাহায্যে নাট্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যতটা ব্যাকুল, নাট্য বিষয়ে জ্ঞান ও পারঙ্গমতা লাভে ঠিক ততটাই উদাসীন। অবশেষে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে একাডেমীর কাজ আপাতত বন্ধই করে দিলাম।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র কথায় মনে পড়ল বাংলা ভাষায় একদা-ব্যবহৃত 'সন্ধ্যা ভাষা'র কথা। আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান 'চলন্তিকা'র ভাষ্য মতে 'সন্ধ্যা

www.pathagar.com

ভাষা' হচ্ছে সেই ভাষা– 'যে ভাষা কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না। প্রহেলিকাময়ী ভাষা, যেমন– চর্যাপদের ভাষা।'

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের 'বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খন্ড' থেকে ডোম্বী পা রচিত একটি চর্যাপদ বের করলাম ঃ

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তহিঁ চড়িলী– মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।।"

প্রচলিত বাংলায় এর অর্থ হচ্ছে–

"গঙ্গা যমুনা মধ্যে রে বহে নৌকা।
তাহাতে চড়িয়া চন্ডালী ডোবা লোককে
অবলীলাক্রমে পার করে।।"

সাদামাটা পরিষ্কার অর্থঃ গঙ্গা যমুনার মধ্যে যে নৌকা তাতে চড়ে চন্ডালী ডোবা লোককে অবলীলায় পার করে দেয়। অর্থটা বুঝতে কারও কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু না— এর গূঢ় অর্থও আছে। গঙ্গা যমুনা তো আর একই নদী নয় যে চন্ডালী নৌকাতে করে ডোবা লোককে অবলীলায় পার করে দেবে! এই গঙ্গা আর যমুনার গূঢ় অর্থ ভিন্ন; চন্ডালী যে নৌকাতে করে ডোবা লোককে অবলীলায় 'গঙ্গা জউনা' পার করে দেয়, তার গূঢ় অর্থও সাধারণ বোধের অতীত। এসব গূঢ় অর্থ বুঝতে হলে উপযুক্ত 'গুরু'র শরণাপন্ন হতে হবে। শরণাপন্ন হয়ে দীক্ষা গ্রহণের পর অনেক শিক্ষালাভ করেই তবে খুলতে হবে গূঢ় অর্থের জট। কারণ—

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট। কর্ম্মকূ রঙ্গ সমাধিক পাট।।"

বাংলায় অর্থ– "কহেন গুরু পরমার্থের বাট। কর্মের রঙ্গ সমাধির পাট।"

এই বাংলা অর্থেরও অর্থ ঠিকমত বুঝতে না পারলে আমাদের আর কিছু করবার নেই। সন্ধ্যা ভাষার এমনই হেঁয়ালী মাহাত্ম্য!

সন্ধ্যা ভাষার দৃষ্টান্ত টেনেছিলাম 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' প্রসঙ্গে। অন্যান্যদের মত আমরাও যা জানি, তাতে সাদামাটা কথায় বলা যায়ঃ তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন যখন অযৌক্তিকভাবে 'বাধা'র সম্মুখীন হল, তখনই আরম্ভ হল 'মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যে চূড়ান্ত সংগ্রাম, তা-ই 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে অভিহিত। এবং এই মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্যে ঘোষিত চেতনা ছিল একটাই– স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এই প্রকাশ্য ঘোষণার অন্তরালে কারও গোপন কোন উদ্দেশ্যমূলক চেতনা থাকলেও তার কথা জনসাধারণ বা সম্ভাব্য জনকয়েক মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা জানতেন না; আমরাও জানতাম না। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্য চেতনাই আমাদের কাছে একমাত্র চেতনা হয়ে রইল।

www.pathagar.com

জীবন বৃত্তান্ত

নাম	ঃ	এম. ওবায়দুল্লাহ	সাহিত্যিক নাম	ঃ	আসকার ইবনে শাইখ
জন্ম	ঃ	৩০ মার্চ, ১৯২৫ সাল	জন্ম–জেলা	ঃ	ময়মনসিংহ

শিক্ষা

১৯৮৩ ঃ পিএইচ. ডি.(সমাজ–পরিসংখ্যান... ডেমোগ্রাফি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫১ ঃ এম. এসসি. (পরিসংখ্যান), পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ম-পরিচিতি

১৯৮৪–'৯০ ঃ প্রফেস্যর, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আই. এস. আর. টি.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৮–'৮৩ ঃ পরিচালক, ঐ

১৯৬৭–'৮৪ ঃ সহযোগী অধ্যাপক, ঐ

১৯৫১–'৬৭ ঃ প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা

পি-এইচ. ডি. থিসিসঃ

বিষয় - Incidence of Induced Abortion in Rural Bangladesh

প্রকাশিত নিবন্ধ ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক জার্নালে	৫	৪৯
(খ) দেশীয় প্রথম শ্রেণীর জার্নালে	৪৪	
(গ) বিদেশী অর্থ সাহায্যে রিসার্চ রিপোর্ট		১১

থিসিস–তত্ত্বাবধানঃ

(ক) মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য	২১
(খ) পি-এইচ. ডি. ডগ্রীর জন্য	১

www.pathagar.com

সাহিত্য–কর্ম (আসকার ইবনে শাইখ নামে)

প্রকাশিতঃ

(ক) সামাজিক নাটক–নাটিকা ১৮

[বিরোধ (১৯৪৭); পদক্ষেপ (১৯৪৮); বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৪৯); দুরন্ত ঢেউ (নাটিকা সংকলন, ১৯৫১); শেষ অধ্যায় (১৯৫২); অনুবর্তন (১৯৫৩); বিল-বাওড়ের ঢেউ (১৯৫৫); এপার–ওপার (১৯৫৬); প্রতীক্ষা (১৯৫৭); প্রচ্ছদপট (১৯৫৮); লালন ফকীর (১৯৫৯) ইত্যাদি।

(খ) ঐতিহাসিক নাটক–নাটিকা ৫৬

[অগ্নিগিরি (১৯৫৭); তিতুমীর (১৯৫৭); রক্তপদ্ম (১৯৫৭); অনেক তারার হাতছানি (১৯৫৭); কর্ডোভার আগে (১৯৮০); রাজপুত্র (১৯৮০) ইত্যাদি; এবং **"রাজ্য-রাজা-রাজধানী"** শিরোনামে ১৪টি নাটিকার সংকলন (১৯৮১) ঃ একটি বিশ্বাস; গোরক্ষ–বিজয়; রাজা হরিশ্চন্দ্র; গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস; নির্বাচিত সম্রাট; সিংহাসন; বিদ্রোহী কৈবর্ত; সাগরের ঢেউ; রক্ত গোলাপ; অশ্বারোহী; বিদ্রোহী তুগরল; সুলতান ও সূফী; আযান; ও জাম–জামরুলের স্বপ্ন;

এবং

"মেঘলা রাতের তারা" শিরোনামে ১১টি নাটিকার সংকলন (১৯৮১)ঃ পলাশীর

পথে; পলাশী; পলাশীর কান্না; অন্ধ রাতের ডাক; মন্বন্তর; বিদ্রোহ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; রেনেসাঁ; বাঁশের কেল্লা; ঝড়ের ডাক; ও ঝড়ের রাতে।

তাছাড়া

"কন্যা-জায়া-জননী" শিরোনামে দুই খণ্ডে ৩১টি নারীচরিত্রভিত্তিক নাটিকার সংকলন (১৯৮৭) ঃ নাম–না–জানা মা; কবি রহিমুন্নিসা; নবাব-নন্দিনী যীনাতুন্নিসা; গদীনশীন বেগম; সিরাজ–বেগম লুৎফুন্নিসা; সিরাজ–দুহিতা; ফরহাদ বানু; মন্নুজান; সুলতানা রাজিয়া; চাঁদ সুলতানা; মহিলা–নবাব; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত; নূরজাহান; শাহ্যাদী জাহানারা; বেগম উদয়পুরী; বিজাপুরের বড়ে সাহেবা; শাহ্যাদী জেবুন্নিসা; ক্রন্দসী কবি গন্না; বেগম হাসরত মহল ইত্যাদি]

(গ) কিশোর কাব্য–নাট্য ও রূপকথা ৬

[দৃষ্টিফুল (১৯৬২); কন্যা ডালিমফুলী (১৯৬২); বাদুড় (১৯৬৩); মুক্তি অভিনব (১৯৮২); ইত্যাদি]

(ঘ) নবজীবনের গান

(একাত্তর–পূর্ব দেশাত্মবোধক গানের সংকলন সম্পাদনা, ১৯৫৯) ১

www.pathagar.com

(ঙ) অন্যান্য গ্রন্থ

কালো রাত তারার ফুল (ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন, ১৯৮২)	১
বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি (প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৯৮৬)	১
মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা (ইতিহাস গ্রন্থ, ১৯৮৭)	১
বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৯৯১)	১
প্রফেস্যর গলব্রেথ, প্রফেস্যর হেইলব্রোনার ও প্রফেস্যর বার্লির ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ, এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের লেখা ও বক্তৃতা সংকলনের অনুবাদ (১৯৬১-৬৫)	৫
মোট সংখ্যা ঃ	৯০

অপ্রকাশিত ঃ

সামাজিক ও ঐতিহ্য-ভিত্তিক লোকনাট্য	২৬
প্রাচীন বাংলার উদ্ভব-কথা (সেন আমল পর্যন্ত)	১
বাংলায় ইসলাম (বাংলায় ইসলামের রূপ ও প্রকৃতি)	১
ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস গ্রন্থ)	১
স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার কথকতা	১
অন্যান্য	২

টেলিভিশনে ৩০টির মত নাটক ও ৮টি নাট্য-সিরিজ এবং রেডিও-তে ৫০টিরও বেশি নাটক প্রচারিত। ১৯৪৭ সালে 'বিরোধ' নাটক প্রকাশের মাধ্যমে নাট্যকার হিসাবে আসকার ইবনে শাইখের আত্মপ্রকাশ। তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত নাটক-নাটিকা, দেশাত্মবোধক গানের সঙ্কলন-সম্পাদনা, ইতিহাসের গল্প, ইতিহাস, অনুবাদ ও অন্যান্য প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা ৯০। সামাজিক, ঐতিহ্য-

www.pathagar.com

ভিত্তিক লোকনাট্য, গীতিনাট্য ও অন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থ–সংখ্যা ৩২।'বাংলা মঞ্চ–নাট্যের পশ্চাৎভূমি' নামক প্রবন্ধ–গ্রন্থে লেখক পরিচিতি প্রসঙ্গে জনাব তোফা হোসেন বলেন ঃ "– জনাব শাইখ মঞ্চ– রেডিও– টেলিভিশনের জন্য নিয়মিত নাটক লিখে আসছেন এবং নির্দেশনা করছেন। এদেশের মানুষের মন ও মানস, তাদের ধর্মীয়–সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনা, তাদের জীবন সংগ্রাম ও আশা–বাসনার প্রতিফলন তাঁর নাট্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনলস নাট্যকর্মী। বাংলা নাটকের উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। চারদিকে আজ নাট্য–প্রয়াসের যে শুভ কর্মচাঞ্চল্য বিদ্যমান, তার সূচনাকারীদের প্রধান পুরুষ জনাব শাইখ। পঞ্চাশ দশকের আরম্ভ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাইরে এবং ৭০ সাল থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত স্বগৃহে 'নাট্য একাডেমী' স্থাপন করে তিনি বহু উৎসাহীকে হাতে–কলমে নাট্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একজন সফল অভিনেতাও।"

সাহিত্য পুরস্কার ঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৮৬), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার (১৯৮৭), টেনাশিনাস (টেলিভিশন নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার সংসদ) পুরস্কার, (১৯৮৯)
এবং বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৯১)।

ঠিকানা ঃ আসকার ইবনে শাইখ
২৫ গ্রীন কর্ণার, গ্রীন রোড
ঢাকা – ১২০৫
ফোন (বাসা) ঃ ৮৬১৩২০

www.pathagar.com

১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান সম্মেলনের কালে প্রফেস্যর আর. এ. ফিশার, প্রফেস্যর কাজী মোতাহার হোসেন এবং অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের মাঝে আসকার ইবনে শাইখ (শিক্ষক)।

১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন দিবসে বিদ্বজ্জনের সমাবেশে আসকার ইবনে শাইখ (শিক্ষক)।

www.pathagar.com

কবি ফররুখ আহমদের এক স্মরণ সভায় কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ ও প্রবন্ধকার শাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে আসকার ইবনে শাইখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রফেস্যর মীর মাসুদ আলী (সতীর্থ), প্রফেস্যর হুমায়ুন কবীর (একাকালীন ছাত্র ও পরে সহকর্মী) এবং অন্যান্যদের মাঝে প্রফেস্যর আসকার ইবনে শাইখ।

www.pathagar.com

১৯৭৭

ক্রমিক নং	নাম	শ্রেণী		বেতন ও টিফিন ফি বুক + এপ্রিল মে			জুন	জুলাই
১	~~[illegible]~~							
2	~~[illegible]~~							
৩	~~[illegible]~~							
১।	ফিরোজা খাতুন [illegible]		১	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
২।	[illegible] আহমেদ	"	২	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৩।	[illegible]	"	৩	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	
৪।	এ,এম, আব্দুল [illegible]	"	৪	১১.০০	১০.০০	১০.০০		
৫।	এ,এম আলমগীর	"	৫	১১.০০	১০.০০			
৬।	[illegible]	"	৬	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৭।	[illegible] চৌধুরী	"	৭	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৮।	[illegible] চৌধুরী	"	৮	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৯।	চৌধুরী [illegible]	"	৯	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	
১০।	[illegible] আহমেদ	"	১০	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
১১।	মো. [illegible]	"	১১	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
১২।	[illegible]	"	১২	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
১৩।	মো: আব্দুল [illegible]	"	১৩	১১.০০	১০.০০			
১৪।	[illegible]	সঙ্গীত	১	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
১৫।	[illegible]	[illegible]	১৪	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
১৬।	[illegible]	"	১৫	১১.০০	১০.০০			
১৭।	[illegible]	"	১৬	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	
১৮।	[illegible]	"	১৭	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১
১৯।	[illegible]	নৃত্য	৬	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
২০।	[illegible] ইসলাম	সঙ্গীত	২	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	
২১।	[illegible]	"	৬	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
২২।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
২৩।	[illegible]	নৃত্য	৭	১১.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	
২৪।	মো: [illegible]	[illegible]	২১	১১.০০	—	১০.০০		
২৫।	[illegible]	সঙ্গীত		১১.০০	—	~~[illegible]~~	১০.০০	১০.০০
২৬।	[illegible]	[illegible]		১১.০০	—	—	১০.০০	১০.০০
২৭।	[illegible]	[illegible]		১১.০০	—	—	১০.০০	১০.০০
২৮।	[illegible]	সঙ্গীত		১১.০০	—	—	—	১০.০০
২৯।	[illegible]	নৃত্য		১১.০০	—	—	—	১০.০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com